মুফতী তাকী উসমানী
কিছু গল্প
কিছু শিক্ষা

কিছু গল্প
কিছু শিক্ষা

মূল

মুফতী তাকী উসমানী

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল আলীম

উসতায. আল জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া
ইদারাতুল উলূম, আফতাবনগর, ঢাকা
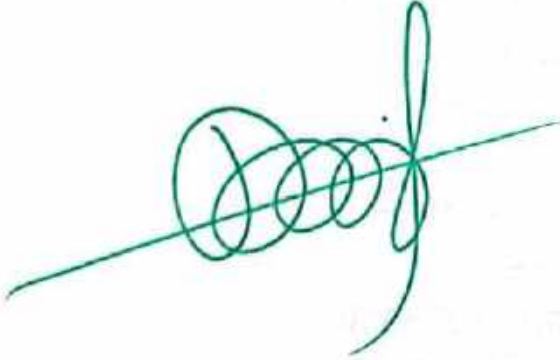
মাকতাবাতুল আযহার

কিছু গল্প কিছু শিক্ষা

মূল
মুফতী তাকী উসমানী

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল আলীম

শীলন ও পরিমার্জন
মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারূক

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 988 15 32 📱 : 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা 📱 017 15 02 31 18

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ২০১৫ ঈ.

প্রচ্ছদ
হাশেম আহমদ. কালার ক্রিয়েশন

বর্ণবিন্যাস
মদীনা বর্ণশীলন : 019 11 52 50 70
E-mail :: mdfaruque81@gmail.com

মূল্য :: ৩২০ টাকা মাত্র

KICHU GOLPO KICHU SIKKHA
Mufti Taqi Usmani

Published by : Maktabatul Azhar. Dhaka, Bangladesh
E-mail : maktabatulazhar@yahoo.com

অর্পণ

- **আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মা,**
  আল্লাহ তাদেরকে নেক ও সুস্থ
  হায়াত দান করুন ও
- আমার আলোর আধার,
  আমার পথের দিশা
  হযরত মাও. মুফতী মুহাম্মাদ আলী সাহেব দা.বা.
  আল্লাহ তাঁর দ্বীনি খেদমত ব্যাপকতর করুন।

প্রকাশকের কথা

"মাকতাবাতুল আযহার" প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণে বদ্ধপরিকর। মুসলমানদের ধর্মীয় চাহিদাকে মাকতাবাতুল আযহার কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে, তা আমাদের জানা নেই। যদি সামান্যতম চাহিদাও পূরণ করে থাকে, তাহলে সেটা হবে এ প্রতিষ্ঠানের পরম সার্থকতা। তবে এতটুকু জানি যে, আজকের এই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়েছিল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণের স্বপ্ন থেকেই। "মাকতাবাতুল আযহার" ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তক ও প্রয়োজনীয় গ্রান্থাবলির অপ্রতুল্য ও দূর্লভত্বকে দূর করার পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান ও অনুভূতিকে সজাগ করে তোলার নিমিত্তে সাধারণ ধর্মপ্রাণ পাঠকদের নির্ভুল ও তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থ উপহার দিতে সবসময়ই সচেষ্ট। এক্ষেত্রে কোনো চেষ্টা ও আন্তরিকতার অভাবকে আমরা প্রশ্রয় দেইনি। যখনই কোনো কিতাব, রেসালা, প্রবন্ধ ও অভিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি, আমরা তা সাধ্যমতো পাঠকদের সামনে তুলো ধরার চেষ্টা করেছি। তেমনি একটি রেসালা হলো واقعات جن سے میں متأثر ہوا; যা একবিংশ শতাব্দির মুসলিম উম্মাহর মুখপাত্র আল্লামা তকী উসমানী (দা.বা.) -এর বিভিন্ন গ্রন্থ, রচনা, প্রবন্ধ, ওয়াজ, বক্তৃতা ইত্যাদি থেকে নির্বাচিত এক অনবদ্য সংকলন গ্রন্থ। বইটি হাতে পাওয়া মাত্রই অনুবাদ করানোর ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমার দরখাস্ত মুঞ্জুর করেছেন। মাওলানা আব্দুল আলীম এই অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মাদরাসার অধ্যাপনার পাশাপাশি ইতিমধ্যেই লেখালেখির সাথেও অনেকটা ধাতস্থ হয়ে ওঠেছেন। ইতোমধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের সফল অনুবাদও করেছেন। খুব আন্তরিকতার সাথে তিনি এই অনুবাদকর্মটি সমাপ্ত করেছেন। আর "মাকতাবাতুল আযহার" তার এ শ্রমকে কৃতজ্ঞতা চিত্তেই আপনাদের সামনে তুলে ধরেছে। আশা করি বরাবরের মতো এ গ্রন্থটিও পাঠকদের ধর্মীয় জীবনের উন্নয়নের পথে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

ওবায়দুল্লাহ

অনুবাদকের কথা

শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী দা.বা.- এর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বহু গ্রন্থপ্রণেতা এই মহাপুরুষ ইতোমধ্যেই "শায়খুল ইসলাম" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর রচিত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, সফরনামা, খুতুবাত, প্রবন্ধমালা ইত্যাদি বিষয়ে নানা রচনাবলি মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় চাহিদা পূরণে অনস্বীকার্য অবদান রেখে আসছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলত واقعات جن سے میں متاثر ہوا-এর অনুবাদ। গ্রন্থটি মূলত তারাশে, জাহানে দিদাহ, দুনিয়া মেরে আগে, খুতুবাত ইত্যাদি গ্রন্থাবলি হতে সংকলিত। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হযরত মাওলানা নোমান আব্দুল আহাদ কাসেমী দা.বা. আঞ্জাম দিয়েছেন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি মূলানুগ থেকেছি এবং মুল বর্ণনাভঙ্গি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। অনূদিত গ্রন্থটিকে আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক সমাদৃতি দান করুন। পাশাপাশি লেখক, সংকলক, প্রকাশক, অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সবার শ্রম কবুল করুন। আমীন।

দু'আর মুহতাজ
আব্দুল আলীম
১৬.১২.২০১৪ ইং

13.07.21
3:05pm.

সূচীপত্র

একটি বিস্ময়কর অসিয়তনামা

ওয়ালংয়ে একটি নয়নাভিরাম মসজিদ রয়েছে। মসজিদটিতে আমরা এশার নামায আদায় করি। মসজিদটির নাম মসজিদুল কাহহার।

ইন্দোনেশিয়ার একজন মুসলমান এই মসজিদটি নির্মাণ করেছেন। এখানকার সাধারণ মানুষের মাঝে তিনি রিদওয়ান সাহেব নামে পরিচিত। বর্তমানে তিনি অনেকগুলো কারখানার মালিক ও বিশিষ্ট শিল্পপতি। এশার নামাযের পর আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি আমার কামরায় চলে আসেন। কথায় কথায় একজন ভদ্রলোক বললেন, জনাব রিদওয়ান সাহেব একজন নতুন মুসলমান। তাঁর মূল নাম রবার্ট ওয়াজু। রিদওয়াত সাহেব তখন বললেন, প্রায় দশ বছর আগে তিনি মুসলমান হয়েছেন। এরপর তাঁর মুসলমান হওয়ার কাহিনী শোনালেন। তাঁর কাহিনীটি ছিল ঈমানদীপ্ত। এটি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না।

রিদওয়ান সাহেব বললেন, আমার দাদা ছিলেন মুসলমান। কিন্তু তিনি একজন খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করেছিলেন। সেই খ্রিস্টান নারী (যিনি রিদওয়ান সাহেবের দাদী ছিলেন) তার সব সন্তানকে খ্রিস্টান হিসেবে গড়ে তোলেন। তাদের মধ্যে আমার বাবাও ছিলেন। তাদের লালন-পালনে আমিও ছিলাম খ্রিস্টান। যৌবন কালে আমি ছিলাম মারাত্মক পর্যায়ের উচ্ছৃঙ্খল ও ভবঘুরে। নেশা ও মাদকদ্রব্য থেকে শুরু করে খুন ও ছিনতাইসহ সবধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলাম। আমার সমমনা উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের সঙ্গে থেকে এসব অন্যায় কর্ম আমার দৈনন্দিন

অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কখনো কখনো আমার ভেতরের মানুষটি জেগে উঠতো। বুঝতে পারতাম, আমি ভয়াবহ পাপকর্মে লিপ্ত আছি। এ সময় আমি কখনো কখনো চার্চে যেতাম এবং পাদ্রি সাহেবকে আমার পাপের কথা বলতাম। পাদ্রি সাহেব আমার ক্ষমার জন্য দু'আ করে আমাকে নিশ্চিত করতেন। অপরদিকে আমি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছিলাম, ওখানে আমার একজন মহিলা শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলমান। তাঁর কথাগুলো আমার ভালো লাগতো। তাই কখনো কখনো আমি তাঁর কাছে যেতাম এবং আমার অবস্থার কথা তাঁকে বর্ণনা করতাম। তিনি আমাকে এসব অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন এবং বলতেন যে, এ সব পাপকর্ম ইহকালে ও পরকালে আমার মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনবে। আমার বাবা সেনাবাহিনীতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি আমাকে একটি বিএমডব্লিউ গাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভারও ছিলো। তিনিও ছিলেন মুসলমান। এই মুসলমান ড্রাইভার কখনো কখনো আমার সামনে ইসলামের সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করতেন।

ইতিমধ্যে আমার মুসলমান দাদা অসুস্থ হন এবং আমি জানতে পারি যে, তিনি আমার জন্য একটি সিলমোহরাঙ্কিত অসিয়ত নামা রেখে যাচ্ছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অসিয়ত নামাটি যেন আমাকে দেওয়া হয়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো, আমার দাদা ঐ অসিয়ত নামায় তাঁর জায়গা সম্পত্তি আমাকে দিয়ে গেছেন। কিছুদিন পর দাদার মৃত্যু হলে তাঁর কথা মতো সিল মোহরত অসিয়তনামাটি আমাকে দেওয়া হয়। আমি খুব আনন্দিত ছিলাম যে, এই অসিয়তনামাটি আমাকে আরো শক্তিশালী করবে। কিন্তু খামটি খোলার পর আমার বিস্ময় আর আক্ষেপের অন্ত ছিলো না। কারণ, ওটা ছিল একটা সাদা কাগজ। সাদা কাগজটি-তে কোনো অসিয়তের পরিবর্তে শুধু এই কালিমাটি লেখা ছিলো,

"اشهد ان لا إله إلّا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله"

এই কাজগটি দেখে আমি এতটাই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হলাম যে, তা ছিড়ে দুই টুকরো করে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিলাম। তারপর সোজা আমার মহিলা শিক্ষিকার কাছে চলে গেলাম। ঘটনাটি আমি তাঁকে শোনাই। তিনি আমার

সঙ্গে আমার বাড়িতে আসেন। তিনি কাগজটা দেখেন এবং আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, "তোমার দাদা তোমাকে পার্থিব জায়গা-সম্পত্তির চেয়ে অনেক বড় নেয়ামত দানের অসিয়ত করে গেছেন। তোমার মুসলমান হওয়ার কথা তিনি বলে গেছেন।" কিন্তু আমি আমার শিক্ষিকার কথা শুনলাম না। আগের মতো অন্যায় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকলাম।

রিদওয়ান সাহেব বলেন, কিছুদিন পর আবার আমার মর্ম যাতনা আমাকে চার্চে নিয়ে যায়। আমি পাদ্রি সাহেবকে বললাম, বার বার আমি আপনার কাছে আসি আর আপনি আমাকে ক্ষমার সুসংবাদ জানিয়ে ফেরত পাঠান। কিন্তু আমার জীবনে তো পরিবর্তন আসছে না। আমি নির্দ্বিধায় আগের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছি। পাদ্রি সাহেব সেই আগের কথাই বললেন, "তোমার জন্য আমি ক্ষমার দু'আ করছি, তোমার আর চিন্তা কিসের? পাদ্রির কথায় আমি রেগে যাই। পকেট থেকে পিস্তল বের করে এমনভাবে গুলি করি যে, তিনি আহত হলেও বেঁচে যান।

রিদওয়ান সাহেব বলেন, এই ঘটনা ঘটিয়ে বাইরে আসার পর আমার অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনা ঘটিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আমার পালিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমি মুসলমান গাড়ি চালককে আমার অস্থিরতার কথা বলি। গাড়ি চালক এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, আমি আপনাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবো, ওখানে গেলে হয়ত আপনার মনের অস্থিরতা কমবে। আমি সম্মতি প্রকাশ করলে চালক আমাকে একটি আসরে নিয়ে গেলেন। আসরে অনেকগুলো মানুষ একত্রে বসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির করছিলো। আমি এই আসরে পৌছা মাত্রই আমার দেহের প্রতিটি পশম দাঁড়িয়ে গেল। আমার ভেতরে এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি হলো। যিকির কারীদের 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আওয়াজ আমার শিরায়-উপশিরায় ঢুকে গেলো। তাদের যিকির আমার ভেতর এমন যাদুময় প্রভাব সৃষ্টি করলো যে, আমার গোটা অস্তিত্ব কেঁপে উঠলো। উপলব্ধি করতে পারলাম, আমি আপদমস্তক বদলে গেছি।

আমি তাড়াতাড়ি আসর থেকে বাইরে চলে এসে আমার মুসলমান শিক্ষিকার কাছে যাই। তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনা শোনাই। তিনি উঠে গিয়ে

কিছুক্ষণের মধ্যেই টকুরো কাগজটি নিয়ে আসেন। এটিই আমার দাদা আমার জন্য রেখে গিয়েছিলেন এবং আমি তা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। আমি শিক্ষিকার কাগজের টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে দেখলাম। তাকে লেখা ছিলো,

"اشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"

আমার শিক্ষিকা বললেন, 'তোমার দাদার অসিয়তের উপর আমল করার সময় চলে এসেছে। এখন তুমি এই কালিমার প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যাও।'

আমার জীবনে আগেই পরিবর্তন এসেছিলো। এই কালিমার সত্যতা আমার মর্মস্থলে প্রবেশ করেছিলো। আমি বিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করি।

ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার খ্রিস্টান বাবার কাছে যাই। তাঁকে বলি, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার বাবা রেগে আগুন হয়ে যান। তিনি আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। আমার বিএমডাব্লিউ গাড়িটি নিয়ে নেন। তার সমস্ত সম্পদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু ইসলাম আমার হৃদয়ে ভালবাসার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। আমি কিছুদিন কয়েকজন মুসলমান বুযুর্গের কাছে অবস্থান করি। আমার অন্তরে এ কথা বসে যায় যে, যিকিরই সবকিছু। কিছুদিন পর আমি শহরের বাইরে একটি ঝুপড়ি বানাই। ঝুপড়িতে রাত-দিন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকির মগ্ন থাকি। আমি উপলব্ধি করতাম যে, এই যিকির আমার জীবনের পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে আমাকে পবিত্র করে তুলছে। এই যিকিরের বদৌলতে আমার সবকিছু হয়ে যাবে। সে সময় আমি নামায, রোযা, এবং ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। কেবল যিকির করেই তুষ্ট ছিলাম। ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণের জন্য টুকটাক কাজ করতাম। তার ঝুপড়িতে এসে যিকিরে মগ্ন থাকতাম। এ অবস্থায় কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর আমি স্বপ্নে একদিন এক বুযুর্গকে দেখলাম। তিনি বললেন, 'আমার শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ.। তুমি যে পথ অবলম্বন করছো, তা ঠিক নয়। ইসলামের বিধান এটা নয় যে, মানুষ

দুনিয়া ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পড়ে থাকবে এবং শুধু যিকির করবে। ইসলামে যিকির ছাড়াও অন্যান্য ইবাদতও আছে। এর শীর্ষস্থনে আছে নামায। ইসলাম এই বিধান দিয়েছে যে, মানুষ অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সুন্নত মোকাবেক জীবন-যাপন করবে। তাই তুমি জঙ্গল ছেড়ে চলে যাও। ইসলামের যথার্থ শিক্ষা লাভ করে সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করো।

এই স্বপ্ন দেখার পর আমি আবার শহরে চলে আসি। আমার মুসলমান শিক্ষিকার কাছে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করি। ইতিমধ্যে আমার বাবার রাগও কমে যায়। আমি হলাম তাঁর সন্তান। আমাকে হারিয়ে তিনি অস্থির ছিলেন। আমি শহরে চলে এলে তিনি আমার সাথে সন্তানের মতই আচরণ করতে শুরু করেন। যে সব সুযোগ সুবিধা থেকে তিনি আমাকে বঞ্চিত করেছিলেন, সে সব সুযোগ-সুবিধা আমাকে ফিরিয়ে দেন। আমার মা অস্ট্রেলিয়ায় থাকতেন। তিনিও ইন্দোনেশিয়ায় এসে আমার হারিয়ে যাওয়ার সংবাদে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। আমি ফিরে আসার পর তিনিও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি আমাকে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি মাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেই যে, ইসলাম ত্যাগ করার কল্পনা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এ সময় আরেকটি ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি আমার জীবনে আরো গভীর প্রভাব ফেলে। আমার বাবার একজন মুসলমান বন্ধু সেনাবাহিনীর জেনারেল ছিলেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি দেখছিলাম, তিনি মসজিদ নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজে বেশি বেশি অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হলে আমি তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করি। তাঁর সঙ্গে আমার আন্তরিকতার কারণে তাঁকে কবরে নামানোর সময় আমি তাঁর কবরে নামি। তাঁর দাফন সম্পন্ন হয় এবং কবরের উপর মাটি দেওয়া হয়। ফেরার পথে সময় দেখার জন্য দেখি, আমার হাতে ঘড়িটি নেই। ঘড়িটি ছিলো খুবই দামি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, ঘড়িটি কবরে পড়ে গেছে। তখন আমি কারো সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করি না। রাতের বেলা মরহুমের আত্মীয়দের সাথে বিষয়টি আলোচনা করি। ঘড়িটি খুব দামি বিধায় তারা আমাকে প্রস্তাব দেয় যে, আগামী কাল সকালে কবর খুঁড়ে ঘড়িটি বের করা হবে। কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর আমি রাজি হয়ে যাই। সকালে

কবর খোঁড়া হলে এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পাই। ঐ দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসছে। দেখি, মরহুম জেনারেল সাহেব কবরে উপুড় হয়ে বসে আছেন। তাঁর মুখ কুৎসিতভাবে বিকট হা করা। তাঁর কনুই থেকে রক্ত ঝরছিলো। মুখ ও হাত পায়ে নীল দাগ। আমরা আগের দিন বিকাল চারটায় তাঁকে দাফন করেছিলাম, আর তখন ছিলো পরের দিন সকাল আটটা-নয়টা। দাফন করার ষোল-সতের ঘণ্টাও অতিবাহিত হয় নি। এত অল্প সময়ে তার মৃতদেহের এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। আজো সেই ভয়ংকর দৃশ্য আমাদের চোখে ভাসে।

আমি ঘটনাটি আমার মহিলা শিক্ষিকার কাছে আলোচনা করি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'জেনারেল সাহেব তো অনেক সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর সাথে এমন আচরণ করা হলো কেন?' শিক্ষিকা বললেন, কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ভেতরে অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। তাছাড়া সেবামূলক কাজে যদি এখলাস না থাকে; বরং সুনাম ও যশ-খ্যাতি কুড়ানোর জন্য তা করা হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে তার কোনো মূল্য নেই।

এই ঘটনার পর সব সময় আমার নিজের কবরের কথা মনে হতে থাকে। আমি অধিকতর গুরুত্বের সাথে আমার কবরের কথা চিন্তা করতে শুরু করি। অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আমার বিধর্মী পিতার সাথে না থেকে আমি নিজে অন্য কোনো ভাবে আমার জীবিকা উপার্জন করবো। তাই আমি অস্ট্রেলিয়ায় চলে আসি। শুরুর দিকে আমি দুর্দশার মাঝে জীবন কাটাই। রাস্তার ছোট ছোট কাজ করে পেট চালাই। ... (যে সময় রিদওয়ান সাহেব তাঁর কাহিনি শুনাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে অপর এক ইন্দোনেশিয়ান মুসলমান বসে ছিলেন। তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে রিদওয়ান সাহেব বলেন, তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করুন। ইনি আমার সেই সময়ের বন্ধু।' তাঁর বন্ধু ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বললেন, বাস্তবেই তিনি অস্ট্রেলিয়ায় এসে শুরুর দিকে চরম দূর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করেছিলেন।)

তবে আমি আমার অতীত জীবন থেকে দুটি শিক্ষা লাভ করেছি।

১. আল্লাহ পাকের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় রাখতে হবে এবং তার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে।

২. যে কাজই করা হোক, এখলাছ ও আন্তরিকতার সঙ্গে করতে হবে। এই দুটি শিক্ষার উপর অটল থেকে আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে থাকি। বেশি বেশি নামায আদায় করি। আমার সামনে আমার কবর দেখতে পাই। অবশেষে আমার জন্যে রিযিকের দরজা উন্মোচিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ! এখন আমি অনেক গুলো কারখানার মালিক।

রিদওয়ান সাহেব তাঁর এই কাহিনী বর্ণনা শেষ করলে উপস্থিত লোকদের মাঝে যারা তাঁকে অনেকদিন ধরে চিনেন, তারা বলেন, ইতিপূর্বে তাদেরও এই কাহিনি জানা ছিল না। আজ প্রথমবার তিনি এই ঘটনা বিস্তারিত শোনালেন।

উল্লেখ্য, রিদওয়ান সাহেব ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্টের শ্বশুর কুলের আত্মীয়। (তিনি তাঁর আত্মীয়তার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু এখন তা আমার মনে নেই। এই আত্মীয়তার ভিত্তিতে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে তার গাঢ় সম্পর্ক রয়েছ।)

রিদওয়ান সাহেবের এই কাহিনীর কিছু বিস্ময়কর দিকে অবশ্যই আছে। কিন্তুতাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিথ্যা বলার বা অতিরঞ্জনের কোনো আশংকা আমার চোখে পড়েনি।

মুক্তচিন্তার পতাকাবাহী একটি সংস্থা

কিছুদিন পূর্বের কথা। মাগরিবের নামাযের পর আমি (মুফতি তাকী উসমানী দা.বা.) আমর বাসায় অবস্থান করছিলাম। জনৈক আগন্তুক সাক্ষাতের জন্য আমার নিকট কার্ড পাঠালেন। কার্ড দেখে বুঝলাম, বিশ্বের প্রসিদ্ধ মানবধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা "অ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল"-এর জনৈক পরিচালক প্যারিস থেকে পাকিস্তানে এসেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, "অ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল" তো সেই সংস্থা, যা সারা বিশ্বে মানবধিকার সংরক্ষণ, স্বাধীন মতামত প্রকাশ, লেখনীর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে ব্যাপক পরিচিত। আমি তাকে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করলাম। ভদ্রলোক পূর্বে সময় নিতে না পারা ও সময়ে সংকীর্ণতার কারণে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আমার সংস্থা আমাকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' ও 'মানবধিকার'

বিষয়ে জরিপ চালানোর দায়িত্বভার দিয়েছে এবং পাকিস্তানে শরিয়া অধ্যাদেশ ও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আরোপিত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে এই সংস্থাটি ধারাবাহিক প্রতিবাদ, মিছিল-মিটিং করছিল। এ সুবাদে এ অঞ্চলের মুসলমানদের মতামত জরিপ পূর্বক একটি প্রতিবেদন তৈরি করা আমার কাজ। এটাই প্যারিস থেকে আমার আসার উদ্দেশ্য। সুতরাং আপনি আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলে রিপোর্ট তৈরির কাজটি আমার জন্য সহজ হবে।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করে ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলাম, আপনি কবে এসেছেন? বললেন, গতকাল। বললাম, আপনার পরবর্তী প্রোগ্রাম কি? তিনি বললেন, আগামীকাল ইসলামাবাদ ফিরে যাব। প্রশ্ন করলাম, সেখানে কয়দিন থাকবেন? বললেন, দুই দিন। তারপর? উত্তর দিলেন, তারপর মালেয়শিয়ার উদ্দেশ্যে চলে যাবো। এবার আমি বললাম, আপনি গতকাল করাচিতে আসলেন, আজ সন্ধ্যায় আমার কাছে, আগামী কাল সকালে ইসলামাবাদ চলে যাবেন। তো আজ একদিনে কি করাচির মত এতবড় শহরের জরিপ সম্পন্ন হয়ে গেছে? আমার কথায় ভদ্রলোক অনেকটা হতচকিত হয়ে পড়লেন। পরক্ষণই নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলন, হ্যাঁ, আসলে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে যথাযথ জরিপ তো সম্ভব নয়, তবে আমি যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদের মতামতের ভিত্তিতে আমার অনেকটা ধারণা হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, আপনি এ পর্যন্ত কতজানের সাথে সাক্ষাত করেছেন? বললেন, পাঁচজনের। আপনি হলেন ছয় নম্বর ব্যক্তি।

আমি বললাম, মাত্র ছয়জনের সাথে সাক্ষাত করে পুরো করাচি বাসীর মতামত যাচাই করতে আপনি কি সক্ষম হয়েছেন? আগামী কাল ইসলামাবাদ গিয়ে আরো ছয় জনের সাথে সাক্ষাত করবেন। তেমনি দিল্লীতে গিয়েও দু'দিনে আরো কিছু লোকের উপর জরিপ চালাবেন। এতএব, বলুন তো জনাব! এটা কোন ধরনের জরিপ পদ্ধতি? এবার তিনি বললেন, আপনার কথা সত্য। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে বিকল্প কোনো পথ আমার কাছে নেই। বললাম, মাফ করবেন জনাব! এত সংক্ষিপ্ত সময়ে জরিপের কাজ করার পরামর্শ কোন জ্ঞানী বাহাদূর দিয়েছেন? সময়-সুযোগ করেই জরিপের কাজ করতে হয়। যাতে মানুষের সাথে সন্তোষজনক সময়

দিয়ে সঠিক জনমত যাচই করা যায়। এত সংক্ষিপ্ত সময় নিয়ে জরিপের মত এত বিরাট কাজে আপনি হাত দিতে গেলেন কেন? তিনি বললেন, আপনার কথাই সঠিক। তবে আমাকে এতটুকু সময় দিয়েছে বিধায় আমিও অপারগ। বললাম, জনাব আমাকে মাফ করবেন, আপনার এই জরিপের স্বচ্ছতার প্রতি আমি প্রবল সন্দিহান। তাই আমি এই জরিপের অংশীদার হতে প্রস্তুত নই। আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর তা এই কারণে যে, আপনি মাত্র পাঁচ-ছয় জনের মতামত নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে ফেলবেন যে, এটাই সর্ব সাধারণের অভিমত। এই ধরনের ভিত্তিহীন প্রতিবেদনের কি-ইবা মূল্য হতে পারে?

ভদ্রলোক অনেক চেষ্টার পরেও আমার কাছ থেকে উত্তর আদায় করতে সক্ষম হন নি। তার সীমাতিরিক্ত পীড়াপীড়ির এক পর্যায়ে বলেছিলাম, আপনি আমার অতিথি। আপনাকে আমার সাধ্যমত আপ্যায়ন করার চেষ্টা করব। তবুও কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অতঃপর আমি বললাম, 'আমার কথায় কোনো অযৌক্তিকতা থাকলে আপনি তা ব্যাখ্যা করে বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে দিন। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার কথা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। আমি বন্ধুসুলভ দাবি নিয়ে আপনার কাছে উত্তর পাওয়ার আশা করছি।' কিন্তু তার কোনো উত্তর না দেওয়ার সিদ্ধান্তে আমি অটল থাকি। পরক্ষণে আমি ভদ্রলোককে বললাম, আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করবো। তিনি বললেন, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, আবার পাল্টা প্রশ্ন করবেন?

বললাম, সে জন্যই তো প্রথমে অনুমতি চাইছি। অনুমতি না দিলে প্রশ্ন করবো না। এ কথা বলার পর তিনি অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে বললাম, আপনি মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবধিকারের পতাকা হাতে নিয়ে চলেছেন। আমার প্রশ্ন হলো, মত প্রকাশের এই স্বাধীনতা কি সম্পূর্ণ Absalute বা নিরঙ্কুশ? না কোনো শর্তাধীন? তিনি বললেন, আমি আপনার কথা সঠিক বুঝি নি। বললাম, আমার কথা তো স্পষ্ট। প্রশ্ন হলো, চিন্তার স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতার যে প্রচার আপনারা করছেন, তার অর্থ কি এই যে, যার যা ইচ্ছা তাই বলবে, প্রচার করবে, অন্যকে তার প্রতি আহ্বান জানাবে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না- এটাই কি

আপনার উদ্দেশ্য? সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে বলুন, কেউ যদি ধনীদের ঘরে ডাকাতি করে গরীবের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার মত প্রকাশ করে, সে মতও আপনি সমর্থন করবেন কি? বললেন, না, ডাকাতি-লুটতরাজের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

আমি বললাম, এটাই আমার জিজ্ঞাসা। অতএব, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিঃশর্তভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। তাতে কিছু শর্তারোপ করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। ভদ্রলোক এবার আমার কথা সমর্থন করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আরোপিত বা আরোপযোগ্য শর্তের রূপরেখা বা নীতিমালা কি হবে? মত প্রকাশের বৈধতা ও অবৈধতার ভিত্তি ও সীমা নির্ধারণী মাপকাঠি কী হবে? আপনার সংস্থা কি এ বিষয়ে যুক্তিসংগত কোনো জরিপ পরিচালনা করেছে? বললেন, আপনার পেশকৃত আলোচনার এই দিকটা ইতোপূর্বে আমরা ভেবে দেখিনি। আমি বললাম, দেখুন জনাব! আপনি এতবড় মিশন কাধে নিয়ে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সমগ্র মানবতার চিন্তার স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অধিকার প্রদানের জন্য কাজ করছেন; অথচ আপনি এ মৌলিক বিষয়টি নিয়ে এতটুও ভেবে দেখলেন না!

এবার তিনি বললেন, যাক তাহলে আপনিই বলেদিন। বললাম, আমি তো আগেই বলেছি, কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না। আপনার কাছে উত্তর পাওয়ার জন্যই তো আমার প্রশ্ন। ... তো আপনার সংস্থার সংবিধান ও কর্মপদ্ধতির নিরিখে আপনি উত্তর দিবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা।

এবার তিনি বললেন, আমি যতটুকু জানি, এ ধরনের কোনো কিছু আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে আসেনি। তবে আমার মতে যে ধরনের মত প্রকাশের মাধ্যমে ভাইল্যানস তথা অন্য কারো প্রতি কঠোরতা আরোপ করা হয়, এমন মুক্ত চিন্তা কখনোই প্রকাশ করা যাবে না।

তার উত্তর শুনে আমি বললাম, এটা আপনার ধারণার ভিত্তিতে আপনি একটি কথা বললেন, অন্য কারো মাথায় ভিন্ন চিন্তা ধারণাও আসতে পারে। আপনি আপনার মতের বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করবেন, তারা তাদের মতের বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করবে। এবার বলুন, কোন ধরনের

নীতিমালার আলোকে সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে? কোন ধরনের স্বাধীনতার নিষেধাজ্ঞা বা শর্তারোপ করা হবে? আর কোন ধরনের স্বাধীনতা চলতে থাকবে লাগামহীনভাবে? এজন্য তো নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি থাকতে হবে। এবার ভদ্রলোক বললেন, আপনার সাথে আলাপের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমার বিবেকে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। আমার সংস্থার স্কলারদের আমি এই প্রশ্ন পেশ করবো এবং উত্তরে এ বিষয়ে কোনো লেটারেচর হাতে আসলে আপনার নিকট পাঠিয়ে দিবো।

বললাম, সুন্দর কথা। আমিও আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকবো। এ বিষয়ে কোনো মাপকাঠি, যুক্তিদর্শন উত্থাপন করতে পারলে আমি একজন ছাত্র হিসেবে তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো। ভদ্র লোকের বিদায় বেলা আবারো বললাম, আপনি বিষয়াটি উপহাস মনে করে উড়িয়ে দিবেন না। অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলছি, এ বিষয়ে আপনারা গবেষণা করুন। অবশ্য আপনাকে বলে রাখতে পারি– আপনাদের সব তন্ত্র-মন্ত্র, যুক্তি-দর্শন কাজে লাগিয়েও এমন সর্বজনসমাদৃত কোনো ফর্মুলা আপনারা প্রস্তুত করতে পারবেন না। তারপর আজ দেড় বছর হয়ে গেল, এ পর্যন্ত কোনো উত্তর তারা দিতে পারে নি।

বাগদাদে দ্বীনি মাদরাসার খোঁজে

আমি বাগদাদে গিয়েছি। বাগদাদ হলো সেই শহর, যেখানে কয়েক শতাব্দীব্যাপী মুসলিম বিশ্বের রাজত্ব ছিলো। আব্বাসী খেলাফতের শৌর্য-বীর্য দুনিয়ার মানুষ সেখান থেকেই দেখেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বকে উষ্ণ করেছিলো এই বাগদাদ। সেখানে যাওয়ার পর আমি একজনকে জিজ্ঞেস করি, এখানে এমন কোনো মাদরাসা আছে কি না, যেখানে দীনি ইলম শিক্ষা দেয়া হয়? থাকলে আমি একটু দেখতে চাই।

তখন আমাকে জানানো হল, এখানে এ জাতীয় কোনো মাদরাসা বা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই নেই। মাদরাসাগুলো স্কুল কিংবা কলেজে পরিণত হয়েছে। দীনি শিক্ষার জন্য এখানে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি। সে সব ফ্যাকাল্টিতে দীনিয়াতও শেখানো হয়। তাদের শিক্ষকদের দেখে আলেম তো দূরের কথা, মুসলমান কি না- এ সন্দেহ

হয়। এ সব প্রতিষ্ঠানে এখন সহশিক্ষার প্রচলন আছে। নারী-পুরুষ একই সঙ্গে পড়ালেখা করে। ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, তবে তা শুধু একটি মতবাদ হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক দর্শন হিসেবে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হয়। বাস্তবজীবনে যার কোনো কার্যকারীতা নেই। ওরিয়েন্টালিস্টরা যেমনিভাবে ইসলাম শিক্ষার উপরে ডিগ্রী অর্জন করে, তেমনিভাবে এখানকার ছাত্ররাও ইসলাম শিক্ষা গ্রহণ করে।

বলাবাহুল্য বর্তমানে আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতেও ইসলাম শিক্ষা রয়েছে। হাদীস, ফিকাহ ও তাফসীর শাস্ত্রও তাদের সিলেবাসভুক্ত। তাদের প্রবন্ধ-রচনাবলি পড়লে আপনি এমন সব কিতাবের নামও পাবেন, যেগুলোর নাম আমদের বহু আলেম মোটেও শুনেন নি। এসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ দৃশ্যত খুবই গবেষণা-সমৃদ্ধ। কিন্তু যে ইসলামী শিক্ষা তাদেরকে ঈমানের দৌলত দিতে পারে না, সেই শিক্ষা অন্তসারশূন্য নয় কি? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষার সমুদ্রে ডুবে থাকার পরও যারা ব্যর্থতার গ্লানি দূর করতে পারে না এবং সেই সমুদ্রের পানি কণ্ঠনালীর নিচে নামাতে পারে না, সেই শিক্ষার মূল্যই বা কী? পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শরীয়া-ফ্যাকাল্টি আছে, উসূলুদ্দীন ফ্যাকাল্টি আছে, কিন্তু এর কোনো প্রভাব বাস্তব জীবনে নেই। মূলত এসব ইলম ও শিক্ষার রূহ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাক, তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোনো মাদরাসা যখন নেই কি আর করা, তাহলে আমাকে এমন কোনো আলেমের সন্ধান দিন, যিনি সনাতন পদ্ধতির অনুসারী, আমি তার সঙ্গে দেখা করবো। আমার আগ্রহ দেখে তারা আমাকে বলল, শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর মাজারের কাছে একটি মসজিদ আছে। সেই মসজিদ সংলগ্ন একট মকতব আছে। সেখানে একজন পুরাতন শিক্ষক আছেন, যিনি পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এ তথ্য পেয়ে আমি সেই শিক্ষকের খোঁজে বের হলাম এবং খুঁজতে খুঁজতে তাঁর খেদমতে পৌঁছে গেলাম। তাঁকে দেখেই বুঝলাম, বাস্তবেই তিনি একজন বুজুর্গ আলেম। আমার মনে হল, আমি কোনো আল্লাহ ওয়ালা আলেমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছেছি। লক্ষ্য করলাম তিনি চাটাইয়ের উপর বসে আছেন। পরিধানে মোটা মোটা কাপড়। জুতোও সাধারণ। চেহারার উপর

আল্লাহর ফজলে ইলমের ঝলকও দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ পর তাঁর খেদমতে বসার পর মনে হলো, আমি এক বেহেশতি-পরিবেশে এসে পড়েছি।

সালাম দেয়ার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোত্থেকে এলেন? বললাম, আমি পাকিস্তান থেকে এসেছি। তারপর তিনি দারুল উলূম (করাচি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, যে মাদরাসায় আপনারা পড়েন-পড়ান, সেই মাদরাসাটি কী ধরনের মাদরাসা? আমি তাঁকে বিস্তারিত উত্তর দিলাম।

জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কী পড়ানো হয়? কি কি কিতাব আপনাদের সিলিবাসে আছে? যে সব কিতাবে আমাদের মাদরাসাগুলোতে পড়ানো হয়।

আমি সেগুলোর নাম বললাম, কিতাবগুলোর নাম শুনে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন ও আঝোরে কাঁদতে লাগলেন। চোখের পানি টপটপ করে পড়ছে আর তিনি অঝোরে বলে যাচ্ছেন, এসব কিতাব এখনো আপনাদের মাদরাসাগুলোতে পড়ানো হয়? আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ্ পড়ানো হয়। বললেন, আহ্! আমরা তো আজ এসব কিতাবের নাম শুনা থেকে মাহরূম হয়ে গেছি। এখন যখন নাম শুনলাম আমার কান্না চলে এসেছে। এ সব কিতাব আল্লাহ্ ওয়ালা সৃষ্টি করতো। সত্যিকারের মুসলমান তৈরি করতো। আমাদের দেশ থেকে আজ এসব কিতাব উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আপনাকে নসিহত করছি, আমর এ পয়গাম আপনি আপনার দেশে আলেম সমাজ ও জনগণের কাছে পৌছে দিবেন। তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে সবকিছু বরদাশত করলেও এসব মাদরাসা বিলুপ্ত হওয়া কখনো বরদাশত করবে না। ইসলামের দুশমনরা এ কথা খুব ভালভাবেই জানে যে, যতদিন এসব সাদা-সিধে মৌলভীরা সমাজের মাঝে থাকবে, ততদিন মুসলমানদের অন্তর থেকে ঈমানের বাতি নিভিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এ জন্যই ইসলামের দুশমনরা এ সব মাদরাসার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর জন্য নিজেদের নানান মিশনারী লাগিয়ে রেখেছে।

হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তির একটি শর্ত

আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, রাসূল সা. হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে মুশরিকদের সাথে একটি চুক্তিনামায় আবদ্ধ হয়েছিলেন। চুক্তিনামায় লিপিবদ্ধ একটি শর্ত ছিলো, যদি কোনো ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে মদীনায় যায়, তাহলে মুসলমানরা ঐ লোককে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে, পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কায় এলে তাকে ফেরৎ পাঠাতে মক্কাবাসীরা বাধ্য থাকবে না। ঐ অযৌক্তিক শর্তটি রাসূল সা. বিশেষ রহস্যের কারণে মেনে নিয়েছিলেন। কেননা, তিনি জানতেন মদীনা থেকে কোনো ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে মক্কা যাবে না। চুক্তিনামায় তখনও স্বাক্ষর হয় নি। এরই মধ্যে মক্কার এক ব্যক্তি মুসলমান হল। তাঁর নাম ছিলো আবূ জান্দাল। তাঁর পিতা ছিলো কাফের। মুসলমান হওয়ার অপরাধে ছেলের উপর সে অমানবিক নির্যাতন চালাতে লাগল। তাঁর পায়ে শিকল বেঁধে দিল। অবশেষে যখন এই বেচারা জানতে পারলেন, রাসূল সা. হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেছেন, তখন যে কোনো উপায়ে পায়ে শিকল নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মক্কা থেকে হুদায়বিয়ার দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। পায়ে শিকলসহ এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছিলেন নির্যাতিত এই সাহাবী। এর জন্য তাঁকে কত কষ্ট করতে হয়েছে! নবীজার দরবারে এসে তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠেছে। বাবা আমার পায়ে শিকল দিয়ে রেখেছে। রাত দিন তিনি আমাকে মারধর করেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই নির্যাতন থেকে উদ্ধার করুন। আমি আপনার কাছে আসতে চাই।

যার সাথে হুদায়বিয়ার চুক্তি চূড়ান্ত হচ্ছিল, ঐ লোকটি তখন ওখানেই ছিলো। রাসূল সা. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বেচারা আবূ জান্দাল অনেক নির্যাতন ভোগ করেছে। তুমি অন্তত একে আমার কাছে থাকতে দাও। লোকটি উত্তর দিলো, যদি আপনি একে এখানে রেখে দেন, তাহলে চুক্তি লঙ্ঘন প্রথমে আপনার কাছ থেকে হয়েছে ধরা হবে। এটা গাদ্দারী হবে। কেননা, মক্কা থেকে কেউ এলে তাকে ফেরৎ পাঠাবেন, চুক্তিতে এ কথাটাও তো আছে। রাসূল সা. বললেন, আবূ জান্দাল নির্যাতিত। পায়ে শিকল পরে আছে। চুক্তি এখনো সম্পন্ন হয় নি। কেননা, চুক্তিনামায় এখনো দস্তখত হয় নি। সুতরাং লোকটা এই চুক্তির বাইরে রাখো।

লোকটি উত্তর দিলো, হবে না। আপনি তাঁকে ফেরৎ পাঠান। যেহেতু চুক্তির শর্তগুলো তখন চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিলো, তাই অবশেষে রাসূল সা. আবূ জান্দাল রা.-কে বললেন, আবূ জান্দাল! আমি তোমাকে আমার কাছে রাখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু যেহেতু আমি চুক্তি করে ফেলেছি, তাই আমি অপারগ। এখন তুমি ফেরৎ যাও। এ ছাড়া আমার কাছে কোনো পথ নেই। আবূ জান্দাল রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে পশুদের কাছে পাঠাবেন না। তারা রাত দিন আমার সাথে পশুর মত আচরণ করে। রাসূল সা. তাঁকে বুঝালেন, শুন আবূ জান্দাল! আমি যেহেতু ওয়াদা করে ফেলেছি, তাই আমাকে তা রক্ষা করতেই হবে। সূতরাং এ মুহূর্তে আমি অপারগ। আল্লাহ তোমার জন্য বিকল্প পথ খুলে দিবেন।

চুক্তি রক্ষার এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাসূল সা. অবশেষে আবূ জান্দাল রা.-কে এই অবস্থায় মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা আবূ জান্দাল রা. অন্যভাবে মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। সেটাও এক দীর্ঘ ইতিহাস।

সারকথা হলো, আমি বলেছিলাম, প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি যার সাথেই করা হবে, কাফের-ফাসিক, ঘুষখোর, দূর্নীতিবাজ– যাই হোক না কেন, কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই হবে। হ্যাঁ! দূর্নীতিবাজ সরকারকে হটিয়ে ন্যায় পরায়ণ সরকার আনার চেষ্টা করা আবশ্যক। তবে চুক্তি বিষয়টিও রক্ষা করা জরুরি।

হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রা.

হযরত দিহইয়ায়ে কালবি রা. ছিলেন নবী করীম সা.-এর সেসব সাহাবীদের একজন, যারা ছিলেন কান্তিময় সৌন্দর্যের অধিকারী। নবী করীম সা. তাঁকে হযরত জিবরাঈল আ.-এর সদৃশ অভিহিত করেছিলেন। হযরত জিবরাঈল আ. কখনো মানুষের আকৃতিতে আগমন করলে সাধারণত হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রা.-এর অবয়ব ধারণ করতেন। একবার হযরত আয়েশা রা. দেখলেন, হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রা. একটি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে আছেন। আর নবী করীম সা. সেই ঘোড়ার উপর হাত রেখে হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রা.-এর সাথে কথা

বলছেন। হযরত আয়েশা রা. পরে যখন নবী করীম সা.-এর কাছে সেই ঘটনা মনে করিয়ে দেন, তখন নবীজী বললেন, তিনি তো জিবরাঈল আ. ছিলেন। (তবকাতে ইবনে সা'দ : ৪/২৫০)

এক বর্ণনায় এমনও এসেছে, তিনি এত চমৎকার রূপ লাবণ্যের অধিকারী ছিলেন যে, যখন কোনো নতুন এলাকায় যেতেন, তখন সেখানকার তরুণীরা তাঁকে দেখার জন্য ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসত। (আল মিসবাহুল মুযিউ : ১/২৮৬)

নবী করীম সা. রোম সম্রাটের কাছে ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, সেই পত্র হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রা.-ই বহন করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি নবী করীম সা.-এর দূত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। যখন তিনি সম্রাটের কাছে পত্র পৌঁছিয়ে মদিনায় রওয়ানা দিলেন। তখন সিরিয়া থেকে নবী করীম সা.-এর জন্য কিছু পেস্তা, আখরূট, কা'ফ (কা'ফ এক প্রকারের রুটি, যা শুস্ক ও গোলাকার হয়। মাঝখানে বৃত্তাকারে খালি থাকে) একটি পশমী জুব্বা ও চামড়ার তৈরি দু'টি মুজা উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন। নবী করীম সা. তাঁর সেই উপহারগুলো সাদরে গ্রহণ করেন- মোজা জোড়া এত বেশি পরিধান করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত সেগুলো ফেটে যায়। (আল মিসবাহুল মুযিউ : ১/২৬৮)

হাদীসে এসেছে, একবার নবী করীম সা.-এর কাছে মিশরের মিহি সুতার তৈরি কিছু কাপড় আসে। এগুলোকে বলা হত কিবতী কাপড়। নবী কারীম সা. তাঁর একটি টুকরো কাপড় হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রা. কে দিয়ে তাঁকে বললেন, এই কাপড়কে দু'ভাগ করবে। এক ভাগ দিয়ে তুমি তোমার জামা বানাবে, আর দ্বিতীয় ভাগটি তোমার সহধার্মিনীকে দিয়ে দিবে। সে তা উড়না হিসেবে ব্যবহার করবে। হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রা. যখন সেই কাপড় নিয়ে হাঁটা শুরু করেন, তখন নবী কারীম সা. তাঁকে দ্বিতীয়বার ডেকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে বলবে, সে যেন এর নিচে কোনো আস্তর লাগিয়ে নেয়। যাতে কাপড়ের উপর দিয়ে দেহ ফুটে না ওঠে। (ইবনে আসাকির : ৫/২১৯)

এ ঘটনা প্রবাহে হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রা.-এর প্রতি নবী করীম সা.-এর প্রগাঢ় ভালবাসা ও অকৃত্রিম স্নেহের যে চিত্র দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে, তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না।

তিনি বদর যুদ্ধের পর আনুমানিক সবকটি যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করে ছিলেন। ইয়ারমুক যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি মিযযা নগরীতে বসবাস শুরু করেন। এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ.

আল্লামা শামী রহ.-এর মূল নাম মোহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন। তিনি ১১৯৮ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি শৈশবে কুরআনে কারীম হিফজ করেছিলেন। হিফজ সমাপ্ত করার পর তাঁর পিতা তাঁকে ব্যবসার প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য দোকানে বসাতে শুরু করলেন। তিনি সেখানে বসে উচ্চ আওয়াজে তেলাওয়াত করতেন। বরাবরের মত একদিন তিনি দোকানে বসে তেলাওয়াত করছিলেন। ইত্যবসরে সেখান দিয়ে এক অচেনা লোক যাচ্ছিলেন। লোকটি তাঁকে এ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করতে দেখে বললেন, আপনার এভাবে তেলাওয়াত করা দুই কারণে জায়েয নেই। প্রথম কারণ হলো, এটি বাজার। লোকেরা এখানে হইহুল্লোড়ের কারণে আপনার তেলাওয়াত শুনতে পায় না। আপনার কারণে তারা গুণাহগার হবে। এ গুণাহ আপনাকে বহন করতে হবে। দ্বিতীয় কারণ হলো, আপনার তেলাওয়াতে যথেষ্ট ভুল হয়। আল্লামা শামী রহ. সেদিনই দোকান থেকে উঠে গেলেন। চলে গেলেন তার যুগের সবচেয়ে বড় কারী সাঈদ হামাভী রহ.-এর কাছে। বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, আমি আপনার কাছে কেরাত ও তাজবীদ শিখতে চাই। তিনি তা মঞ্জুর করলেন। এরপর তাঁর কাছে পড়াশোনা শুরু করে দেন।

আল্লামা শামী রহ. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই ইলমে কেরাত ও তাজবীদের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব মাদানিয়াহ, জাযরিয়াহ ও শাতিরিয়াহ মুখস্ত করে ফেলেন। এভাবে তিনি কেরাত ও তাজবীদের উপর পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ঐ ঘটনাটি তাঁর অন্তরে ইলম অর্জনের নেশা ধরিয়ে দেয়। যার কারণে

পরবর্তীকালে তিনি সমকালীন বড় বড় ওস্তাদগণের কাছ থেকে সমস্ত দীনি ইলম আহরণ করেন। এরপর নিজেকে রচনা ও সংকলনের কাজে নিয়োজিত করেন। অনেকগুলো কিতাব রচনা করেন। তার সবিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল হানাফী ফিকাহ। এ কারণে তাঁরবেশির ভাগ রচনাই হলো হানাফী ফিকাহ বিষয়ে। তাঁর রচনাবলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো, "আদ-দুররুল মুখতার"-এর ভাষ্যগ্রন্থ রদ্দুল মুহতার। এটি ফতোয়ায়ে শামী নামে বিশ্বজুড়ে খ্যাত। খুবই ব্যাপক তথ্য সমৃদ্ধ ও বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। হিজরি বার শতকের পর হানাফী মতাদর্শের মুফতীদের সবচেয়ে বড় জ্ঞান-উৎস হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। যার কারণে হানাফী ফিকাহ এর গভীর বিশ্লেষণ ও তত্ত্বানুসান্ধানের ক্ষেত্রে এটি একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এতে একেকটি মাসআলা গবেষণা করর জন্য আল্লামা শামী র. কে কয়েক কুড়ি কিতাবের পাতা উল্টাতে হয়েছে। তিনি পরবর্তী লেখকদের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর না করে মূল উৎস গ্রন্থের দ্বারস্থ হয়ে প্রতিটি মাসআলা গবেষণা করেছেন।

সম্পর্ক ভাঙ্গা সহজ, গড়া কঠিন

আব্বাজান মুফতি শফী রহ. -এর সাথে এক লোকের পারিবারিক সম্পর্ক ছিলো। এমনিতে তিনি খুব নেক মানুষ ছিলেন। কিন্তু কিছু লোকের অভ্যাস থাকে কথায় কথায় অন্যের দোষ ধরা। লোকটিরও এ বদ অভ্যাস ছিলো। কারো সাথে সাক্ষাত হলেই তিনি তার একটা না একটা দোষ ধরে বসতেন। তার এ তিরস্কারের অভ্যাসের কারণে মানুষ তাকে এড়িয়ে চলতো। একবার তিনি তার এ অভ্যাসটা আমার উপর প্রয়োগ করে বসলেন। আমাকে একটা কথা বলে বসলেন, যা সত্যিই সহনীয় ছিলো না। যদিও কথাটা আমি তার সামনে হজম করে নিলাম। কিন্তু সাথে সাথে এও ভাবলাম যে, লোকটি নিজেকে কী মনে করে? টাকা পয়সা ও মান সম্মানের গরমে তার কাছে কি কেউ মানুষ মনে হয় না। তাই আমি বাড়িতে গিয়ে তার উদ্দেশ্যে চটজলদি একটি চিঠি লিখে ফেললাম। চিঠিতে এও লিখলাম, আপনার এই বদঅভ্যাসটি অসহনীয়। এজন্য মানুষ আপনাকে ভাল চোখে দেখে না। আজ আপনি আমার সাথে যে ব্যবহার

করেছেন, তাও ছিলো আমার সহ্যের বাইরে। এ কারণে আমি ভবিষ্যতে আপনার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাই না।

চিঠি তো লিখে ফেললাম। তবে আমার একটা অভ্যাস ছিলো, এ জাতীয় কোনো বিষয় সামনে এলে অবশ্যই আব্বাজানের সামনে পেশ করতাম। তাই চিঠিটা আব্বার সামনে পেশ করে ঘটনা খুলে ফেললাম। আমি এ সবই রাগের মাথায় করেছি; আব্বাজান তা বুঝতে পারলেন। তাই তিনি চিঠিটা নিজের কাছে রেখে বললেন, ঠিক আছে এখন যাও। এ ব্যাপারে পরে কথা বলবো। এই বলে তিনি ব্যাপারটিকে পিছিয়ে দিলেন। পরের দিন তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, তোমার চিঠিটা আমি পড়েছি। আচ্ছা, বলতো, এর দ্বারা তুমি কি করতে চাচ্ছো? বললাম, আমি চাচ্ছি, চিঠিটা পাঠাবো এবং তার সাথে সম্পর্ক শেষ করে দিবো। আমার কথা শোনার পর আব্বাজান বললেন, দেখো! এটা কোনো লম্বা-চওড়া কাজ নয়, যার জন্য সময় ব্যয় করতে হবে কিংবা কঠিন সাধনা করতে হবে। তবে সম্পর্ক তৈরি করা এমন কাজ, যা সব সময় সম্ভব হয় না। সুতরাং এত তাড়াহুড়া করছো কেন? চিঠিটা তাকে এখনই দিতে হবে, এমন তো কোনো কথা নয়, আরো কিছু দিন অপেক্ষা করো। দেখো কী হয়? হ্যাঁ! যদি তার সাথে মেলামেশা দ্বারা তোমার কাছে কষ্ট অনুভূত হয়, তাহলে তার কাছে যেও না। এই তো যথেষ্ট। চিঠি লিখে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়া তো জরুরি নয়। এতো ঘটা করে সম্পর্ক শেষ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

তারপর তিনি বললেন, সম্পর্ক এমন এক বিষয়, যা যথা সম্ভব রক্ষা করতে হয়। সম্পর্ক ছিন্ন করা সহজ, তৈরি করা কঠিন। যদি তোমার মেজাজ ও রুচি তার সাথে খাপ না খায়, তাহলে তার কাছে যেও না। সকাল সন্ধা তার কাছে যাওয়া আসা করতে হবে এমন তো জরুরি নয়। সম্পর্ক যখন আছে, তা হলে তা তোমার পক্ষ থেকে নষ্ট করো না। এসব কথা বলার পর আব্বাজান দ্বিতীয় আরেকটি চিঠি বের করে আমার হাতে দিলেন। বললেন, এ চিঠিটা পড়, আর তোমার চিঠিটাও পড়। আমার চিঠিতে অভিযোগের প্রকাশ ঘটেছে। তার আচরণ তোমার কাছে ভালো লাগেনি তাও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ চিঠি দ্বারা সম্পর্ক শেষ করার ঘোষণা দেওয়া হয় নি।

আমি আব্বাজানের লিখিত চিঠিটা হাতে নিয়ে দেখলাম, আমার চিঠিও তাঁর চিঠির ভাষার মাঝে আসমান-জমিনের পার্থক্য বিদ্যমান। আমি লিখেছিলাম নিজের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য, আর তিনি লিখেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত পালনের জন্য। তাঁর চিঠিতেও অভিযোগ উঠে এসেছে, যা আমার চিঠিতেও এসেছিল। তবে পাথক্য হলো, আমারটাতে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছিল, তাঁরটাতে সেটা বলা হয় নি।

তারপর তিনি বললেন, দেখো! লোকটির সাথে সম্পর্ক অনেকদিন থেকে। তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়; সম্পর্কটা পারিবারিক। আমার আব্বাজন তথা তোমার দাদাজানের সময় থেকে এ সম্পর্কটা চলে আসছে। তার আব্বা আর তোমার দাদা পরস্পরে বন্ধু ছিলেন। এত পুরনো একটি সম্পর্ককে মুহূর্তের ভেতর কেটে দেওয়া মোটেই সঙ্গত হতে পারে না।

এ মহিলাটি ছিলেন হযরত সাফিয়া রা.

সুদীর্ঘ হাদীস, যেখানে স্থান পেয়েছে নবী-জীবনের একটি ঘটনা। হাদীসটি সারমর্ম হলো– রাসূলুল্লাহ সা. মসজিদে নববীতে ই'তেকাফ করতেন প্রতি রমজানে। একবার তিনি ই'তেকাফে ছিলেন। এরই মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া র. মসজিদে নববীতে চলে এলেন রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে দেখা করতে। যেহেতু ই'তেকাফে থাকার কারণে নবীজী সা. ঘরে যেতে পারছিলেন না, তাই হযরত সাফিয়া রা. নিজেই চলে এলেন মসজিদে। এসে কিছুক্ষণ বসলেন। তারপর যখন ফেরার সময় হলো, রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের দরজা পর্যন্ত এলেন।

রাসূলুল্লাহ সা. যখন তাঁকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। দেখতে পেলেন, দুইজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে দেখা করার জন্য এদিকেই এগিয়ে আসছেন। রাসুলুল্লাহ সা. ভাবলেন, এ দুজন কাছে এলে উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া রা.-এর সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি সাহাবীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ওখানেই একটু অপেক্ষা কর। এ নির্দেশ এ জন্য দিলেন যেন সাফিয়া রা. পর্দার সাথে ঘরে ফিরে যেতে পারেন। সাফিয়া রা. যখন নিরাপদে চলে

গেলেন, তখন তিনি সাহাবীদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে বললেন, এবার আসতে পার। সাহাবীরা আসার পর রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে বললেন, ওই মহিলাটি ছিল সাফিয়া রা.। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, এ কোনো পরনারী ছিলো না; বরং সে ছিলো আমার স্ত্রী।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবীদ্বয়কে এও বলেছিলেন যে, আমি বিষয়টি তোমাদের এ জন্য স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, শয়তান যেন তোমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে না পারে। সে যেন তোমাদের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করতে না পারে যে, কে ছিলো এই নারী! তাই রাসূলুল্লাহ সা. স্পষ্ট করে দিলেন, এ ছিলো সাফিয়া রা., আমার স্ত্রী।

ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এসেছে।

তুমি প্রথম দলভুক্ত

হযরত আনাস রা. -এর খালা হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. হুযুর সা.-এর দুধ সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। একদিন হুযুর সা. দুপুর বেলা তাঁর ঘরে শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ মুচকি হাসতে হাসতে হুযূর সা. ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান মুচকি হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূল সা. এরশাদ করেন, আমি স্বপ্নে আমার উম্মতের ঐ সকল মুজাহিদদের দেখলাম, যারা জিহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের ঢেউ এমন ভাবে পাড়ি দিবে যেন বাদশাহ তাঁর সিংহাসনে বসে আছে। এ কথা শুনে হযরত উম্মে হারাম রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করেন যেন আমি তাদের দলভুক্ত হই। হুযূর সা. দু'আ করলেন। অতঃপর হুযূর সা. দ্বিতীয় বার আবার স্বপ্ন দেখলেন। কিছুক্ষণ পর আবার মুচকি হেসে জাগ্রত হলেন। হযরত উম্মে হারাম এবারও হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে হুযুর সা. বললেন, আমার উম্মতের প্রথম দল যারা রোমের শহর কনস্টাটিনেপলে জিহাদ করবে তাদের ক্ষমার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। হযরত উম্মে হারাম রা. দ্বিতীয়বার দু'আর আবেদন করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু জবাবে রাসূল সা. বললেন, তুমি প্রথম দলভুক্ত। -সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস : ২৭৯৯

হুযুর সা.-এর এ দু'টি সুসংবাদই এমন ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে যে, হযরত ওসমান গণী রা.-এর খেলাফত কালে হযরত মু'আবিয়া রা. কবরাছের উপর আক্রমণ করেন। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমুদ্র পথে জিহাদ। আর এ জিহাদে হযরত উম্মে হারাম রা. তাঁর স্বামী উবাদা ইবনে ছামেত রা.-এর সাথ শরীক ছিলেন। এ যুদ্ধে বিজয়লাভ হয়েছিল এ জন্য যে, কবরাছবাসী মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। ফেরার সময় হযরত উম্মে হারাম রা. একটি ঘোড়ার উপর অরোহণ করতে চাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঘোড়া লাফিয়ে উঠলে তিনি জমিনে পড়ে যান। এই আঘাতেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন।

পরবর্তীতে যখন হযরত মু'আবিয়া রা. খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি আপন সন্তান ইয়াযিদের নেতৃত্বে কনস্টান্টিনেপলে হামল করেন। এই যুদ্ধে বহু সাহাবী শামিল ছিলেন। আবূ আইয়ূব আনছারী রা.ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটাই ছিল মুসলমান কর্তৃক কনস্টান্টিনেপল অবরোধ। এই অবরোধ ছিল দীর্ঘ দিন। হযরত আবূ আইয়ূব আনছারী রা. এরই মাঝে অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেন এবং কনস্টান্টিনেপলের প্রাচীরের নীচে তাঁকে দাফন করা হয়। এই অভিযানে কনস্টানটিনেপল বিজয় হয় নি। সৈন্য বাহিনী ফেরৎ চলে আসে।

হযরত নানূতবী রহ. ও তাঁর বিনয়

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী র. ছিলেন ইলমের অথৈই সমুদ্র। হযরতের লেখা "আবে হায়াত" "তাকদীরে দিলপযীর" "কাসীমুল উলূম" এবং "মুবাহাসায়ে শাহজাহানপুর" প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে তাঁর রাজকীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সামান্য হলেও ধারণা আসবে। উক্ত গ্রন্থাবলির মধ্য হতে কিছু গ্রন্থ এমনই উচ্চাঙ্গের যে, বড় বড় আলেমের পক্ষেও তা বুঝে ওঠা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অবস্থা এমনই যে, তাঁর সমবয়সী বুযুর্গ হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানূতবী রহ.-এর একটি কথা দারুল উলূমে প্রশিদ্ধ ছিল, "আমি আবে হায়াত ছয় ছয় বার পড়েছি, এখন তা কিছু কিছু বুঝে আসছে।"

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলতেন, এখন পর্যন্ত হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী রহ-এর লেখা আমার বুঝে

আসে না। আবার খুববেশি মেধা প্রয়োগ করে চিন্তা-ভাবনা করা আমার সাধ্যের বাইরে। তাই তার থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকি আর নিজের মনকে একথা বলে প্রবোধ দেই, প্রয়োজনীয় বিষয়াবলির ইলম অর্জন করার জন্য যখন অনেক সহজ কিতাব রয়েছে, তখন কেন কষ্ট করত যাবো।

এমন বিস্তৃত ও গভীর ইলম বিশেষ করে যুক্তিবিদ্যা প্রভাবিত শাস্ত্রে প্রখর পাণ্ডিত্ব অর্জন হওয়ার পর যে কোনো ব্যক্তির মনেই শিক্ষা দীক্ষার কঠিন অহংবোধ জন্মানো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু হযরত নানুতবী রহ.-এর অবস্থা এমন ছিলো, তিনি নিজেই বলতেন- 'যেভাবে সুফীদের সমালোচনা হয়, সেভাবে আমার সাথে 'মৌলভী' হওয়ার পদবী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সে জন্য বেশ দেখে শুনে কদম ফেলতে হচ্ছে। যদি 'মৌলভী' এর বন্ধন জুড়ে দেওয়া না হত, তাহলে আমি 'কাসেম'-এর মত এক মাটির টুকরোর খবর কে রাখতো?

হযরতের সরলতা সম্পর্কে হযরত মাওলানা আহমদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. বলতেন, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. যে ছাত্রের মাঝে অহংকার দেখতেন, তার দ্বারা কখনো কখনো নিজের চপ্পল উঠাতেন। আর যে ছাত্রের মাঝে বিনম্রতা দেখতেন, তিনি নিজেই সে ছাত্রের চপ্পল ওঠাতেন।

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী রহ. ও তাঁর বিনয়

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর ফিকাহ শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত নানুতবী রহ. হযরতকে 'এ যুগের আবূ হানীফা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এ পদবিতেই তিনি সে যুগে প্রশিদ্ধ ছিলেন, হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর মত উঁচু মাপের বিশ্লেষক যেখানে আল্লামা শামী রহ.-কে 'ফকীহুন নফস' -এর মর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, সেখানে তিনি হযরত গাঙ্গুহী রহ.-কে 'ফকীহুন নফস' বলতেন। হযরতের সম্পর্কে হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর ঘটনা শুনাতেন- একবার হযরত গাঙ্গুহী রহ. হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন, হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ল। সব ছাত্র দ্রুত কিতাব নিয়ে ভেতরে চলে গেল। কিন্তু হযরত নিজে সকল ছাত্রের চপ্পল একত্র করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে সবাই কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে গেল।

দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর

দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাসে একথাটি খুব প্রশিদ্ধ যে, দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর এমন দুই বুযুর্গের হাতে হয়েছে যাদের দু'জনেরই নাম ছিল 'মাহমূদ' এবং দু'জনই দেওবন্দ নগরীর সন্তান ছিলেন। তাদের একজন ছিলেন উস্তাদ আর অপরজন ছিলেন ছাত্র। উস্তাদ হচ্ছেন মোল্লা মাহমূদ হাসান সাহেব আর ছাত্র হলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান সাহেব রহ.। অধমের শ্রদ্ধেয় দাদাজান মাওলানা ইয়াসীন সাহেব বলেন, একবার মোল্লা মাহমূদ সাহেব বললেন, 'সুনানে ইবনে মাজা' -এর যেই হাশিয়াহ [গ্রন্থের প্রান্তস্থিত টীকা-টিপ্পনী] হযরত আবদুল গণী মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. -এর নামে প্রকাশিত হয়েছে, তার বৃহৎ একটি অংশ হযরত আমাকে দিয়ে লিখেছেন। হযরত খুবই সরলভাবে জীবন-যাপন করতেন বলে এ কথা শুনে ছাত্ররা বিস্মিত হয়ে যায়। [অর্থাৎ তাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয় যে, এত উচ্চমান হাশিয়ার লেখক, অথচ এতটাই সরল জীবন-যাপন] আল্লাহ তা'আলা এই ফেরেশতাস্বভাব বুযুর্গকে ইলমের জশ নাম-পদবীর আকাঙ্খা থেকে এতটাই পবিত্র রেখেছিলেন যে, তিনি কত বড় আলেম; তা সাধারণ লোকদের পক্ষেও জানা মুশকিল ছিল।

ঘরোয়া বাজার-সওদা, গোশত-তরকারী সব কিছু তিনি নিজেই বাজার থেকে কিনে বয়ে নিয়ে আসতেন। একজন সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করতেন। কিন্তু হযরতের জ্ঞান এতটাই নখদর্পণে ও স্মরণ শক্তি এত বেশি প্রখর ছিল যে, অধমের দাদাজান হযরত মাওলানা ইয়াসীন সাহেব সম্ভবত মানতিক বা উসূলে ফিকহের একটি কিতাব ঘটনাক্রমে দরসে পড়তে পারেন নি। দাওরায়ে হাদীস পড়ার পূর্বেই তিনি কিতাবটি পড়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। তাই তিনি মোল্লা মাহমূদ সাহেবের কাছে কিতাবটি পড়ার আবেদন করলেন। হযরত বললেন, মাদরাসার নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও বাকি মুহূর্তগুলো বিভিন্ন দরসে ও সবকে ভরে আছে। শুধু এই ঘরের বাজার-সওদা করার সময়টুকু খালি আছে। তুমি যদি এ সময় আমার সাথে থাকো, তাহলে হয়ত তার মধ্যে দিয়ে এর সবক পড়ানো যাবে। দাদাজান বলেন, কিতাবটি বেশ বড় ও কঠিন ছিল। যা অন্য যে কোনো আলেমের জন্য গভীর অধ্যায়ন ও চিন্তা ভাবনা করে

পড়ানোও দুস্কর ছিল। অথচ মোল্লা মাহমূদ সাহেব কিছু সময় রাস্তায়, কিছু সয়ম কসাইর দোকানে, এভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো কিতাব অনায়াসে এমনভাবে অধ্যয়ন করিয়ে দিলেন যে, তার জন্য সামান্যতম বেগও তাঁকে পোহাতে হয় নি।

আমার ওয়াজ করার যোগ্যতা নেই

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান কুদ্দিসা সিররুহু কত উচ্চ পর্যায়ের ইলম ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন, তা ব্যক্ত করার মত শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে হযরতের এক ঘটনা থানভী রহ. শুনিয়েছেন– 'একবার হযরত কানপুর গেলেন, সেখানকার লোকেরা ওয়াজ করার জন্য হযরতকে জোরাজুরি করল। হযরত বেশ অপারগতা জানিয়ে বললেন, আমার ওয়াজ করার অভ্যাস নেই। শেষমেশ একান্ত বাধ্য হয়েই ওয়াজ করার জন্য দাঁড়ালেন। সেখানে তিনি এক হাদীস পড়লেন, فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد। হযরত তার অনুবাদ করলেন, 'একজন আলেম শয়তানের কাছে হাজার আবেদ অপেক্ষা বেশি ভারী।'

সভাস্থলে এক প্রশিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, এই অনুবাদ ভুল। যে ব্যক্তি ভালভাবে হাদীসের অর্থ করতে পারে না। তার জন্য ওয়াজ করা জায়েয নেই।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. তার জবাবে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা জানার পূর্বে আমাদের কিছুক্ষণ বুকের উপর থুতনী রেখে ভাবা দরকার যে, হযরতের স্থলে আমরা যদি হতাম, তাহলে কী করতাম? অনুবাদ যখানে সঠিক, সেখানে প্রশ্নকারীর আপত্তির ঢং শুধু অবজ্ঞাসুচক ও মানহানীকরই নয়; বরং তা রীতিমত ক্রোধজাগানিয়া ও উত্তেজক। কিন্তু সেই যুগের শায়েখের কার্যপদ্ধতি শুনুন। হযরত থানভী রহ. বলেন, এ কথা শুনে হযরত সাথে সাথেই বসে গেলেন এবং বললেন– "আমি তো আগেই বলেছিলাম, আমার ওয়াজ করার যোগ্যতা নেই। কিন্তু এরা তো মানল না। ভাল হলো, এখন আপনার স্বাক্ষ্যই আমার অপারগতার দলিল হয়ে গেল।"

এ কথা বলে তিনি প্রথমে ওয়াজ শেষ করে দিলেন এরপর তিনি সেই আলেমের কাছে জানার জন্য প্রশ্ন করলেন, আপনি আমার ভুলটা চিহ্নিত

করে দিন, যাতে আগামীর জন্য সংশোধন হয়ে যায়। মাওলানা বললেন যে, أشد শব্দের অর্থ أثقل তথা খুব ভারী নয়; বরং তার অর্থ হলো أضر তথা খুব ক্ষতিকারক।

তখন হযরত বললেন, নবীজীর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা সংক্রান্ত হাদীসে এসেছে,

"يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علّي"

> "কখনো কখনো আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, ঘন্টির ধারাবাহিক ধ্বনি- প্রতিধ্বনির মত করে, যা আসার উপর খুব ভারী মনে হয়।"

এখানে কি أشد শব্দটির অর্থ أضر হবে? এই প্রশ্নটির উত্তরে লোকটি নির্বাক হয়ে গেল।

জান্নাতের বাজার

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. ছিলেন একজন উচুস্তরের তাবেয়ী। ছিলেন একজন বড় মাপের ওলী ও হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর শিষ্য। এক রেওয়ায়েতে এসেছে, তিনি বলেন, একবার আমি আমার ওস্তাদ হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলাম। সেদিন ছিল জুমার দিন। তিনি কোনো কিছু কেনার ইচ্ছা করলেন। সদাই কেনা কাটা করলেন। ফেরার পথে আমাকে বললেন, সায়ীদ! আমি দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারে এভাবে একত্রিত করুন। দেখুন! এ হলো সাহাবায়ে কেরাম। তাদের সার্বক্ষণিক ভাবনাই ছিল আখেরাতকে ঘিরে। সামান্য প্রসঙ্গ হলেই তারা আখেরাতের ভাবনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। এ চেতনা তাদের মাঝে ছিল সদা জাগ্রত। তারা সজাগ থাকতেন, যেন পার্থিব কাজ-কর্ম আখেরাত থেকে তাদেরকে গাফেল না করে ফেলে। মানুষ সাধারণত পার্থিব কাজকর্মের ঘোরে পড়েই আখেরাতের জীবনকে ভুলে যায়। হযরত আবূ হুরায়রা রা.-কে দেখুন! দুনিয়ার কাজ তথা বাজার-সদাই করছেন এবং এই ভেতর নিজের জন্য ও শিষের জন্য দু'আ করছেন, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের বাজারে গিয়ে মিলিত হওয়ার তৌফিক দান করেন।

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা রা. কে প্রশ্ন করলাম, জান্নাতেও বাজার হবে কি? কারণ আমরা তো শুনেছি যে, সেখানে সবকিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। আর বাজারে তো কেনাবেচা হয়। হযরত আবূ হুরায়রা রা. উত্তর দিলেন, জান্নাতেও বাজার বসবে। আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, জান্নাতে বাজার বসবে প্রতি জুম'আ বারে। বাজারে বেহেশতিগণ উপস্থিত হবেন। তারপর রাসূল সা. তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, বেহেশতিগণ যখন নিজ নিজ জান্নাতে চলে যাবে, সেখানের সুখ-আনন্দ ভোগ করতে থাকবে এবং সেখানে তারা বর্ণনাতীত আনন্দে-আত্মহারা থাকবে। এমনকি সেখান থেকে কোথাও যাওয়ার কথা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। ইত্যবসরে একজন ঘোষণা হঠাৎ ঘোষণা করবে, সকল বেহেশতিকে দাওয়াত করা হচ্ছে, তারা যেন নিজ নিজ জান্নাত থেকে বের হয়ে বাজারের দিকে যান। এ ঘোষণা শোনার পর বেহেশতিগণ নিজ নিজ ঠিকানা থেকে বের হয়ে বাজারের দিকে চলতে শুরু করবেন। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পাবে মহা বিস্ময়কর কাণ্ড! নানা প্রকার মনোহর সামগ্রী সেখানে থরে থরে সাজানো রয়েছে, জীবনে যেগুলো তারা কখনও দেখেনি। তবে সেখানে কোনো ধরনের বেচা কেনা হবে না; বরং ঘোষণা করা হবে, যার যেটা পছন্দ, তুলে নিয়ে যাও। তারপর বেহেশতিগণ জান্নাতের বাজারের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে হেঁটে যাবে। তাদের জন্য অপেক্ষামান নানা বিষয়ে তারা দেখতে পাবে। যার যেটা পছন্দ হবে, সে সেটা নিজের মত তুলে নিয়ে যাবে।

কেনা-কাটা পর্ব শেষ হবার পর পুনরায় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হবে, সবাই আল্লাহর দরবারে সমবেত হোন। ঘোষণা শোনার পর সকলেই সমবেত হবে মহান আল্লাহর দরবারে। তখন তাদেরকে বলা হবে, আজকের এই দিনটি সেই দিন, দুনিয়াতে জুমাবার হিসেবে তোমরা যা পেতে। এ দিনটিতে তোমরা জুমআর নামাযের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে সমবেত হতে। সেদিনের একত্র হওয়ার বিনিময়ে আজ তোমাদেরকে জান্নাতে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হলো। আল্লাহর এ দরবারে সেদিন সকলের জন্য কুরসি পাতা থাকবে।

দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে দাওয়াত দেওয়া হবে। কারো কুরসি হবে মূল্যবান হীরা-জহরতের, কারো কুরসি হবে সোনার, কারো কুরসি হবে রূপার। সকলেই নিজ স্তর অনুযায়ী কুরসি পাবে। তবে প্রত্যেকের কাছে নিজের কুরসিটা এতটা মূল্যবান হবে যে, অপরের কুরসি দেখে অতৃপ্তির সামান্যতম আক্ষেপও তার মাঝে জাগ্রত হবে না। কেননা জান্নাত মানে আক্ষেপ, হতাশা, দুঃখ, ও ব্যদনামুক্ত এক সুখময় পরিবেশ। জান্নাতে সবচেয়ে নিম্নমানের মর্যাদার অধিকারী যারা হবে, তাদরে কুরসি গুলোর চারপাশে মিশক্ আম্বরের টিলা নির্মিত থাকবে। এভাবে বেহেশতিগণ প্রত্যেকে যখন নিজ নিজ আসন গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহর দরবারের সূচনা হবে ইসরাফিল আ.-এর কণ্ঠে কালামে পাক তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তিনি এমন সূরে আল্লাহর কালাম ও প্রশংসাবাণী শুনাবেন যে, তাঁর সূর-মূর্ছনার কাছে পৃথিবীর সকল সূর-বাদ্য ও শিল্প মনে হবে একেবারেই তুচ্ছ।

আল্লাহর কালাম ও প্রশংসাবাণী শুনানোর পর আকাশ ছেঁয়ে যাবে ঘর মেঘে। মনে হবে এখনই বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। বেহেশতিগণ মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকবে। ইতিমধ্যে শুরু হবে মেশক ও জা'ফরানের বর্ষণ। কী স্নিগ্ধ, কী ঝিরঝিরে, কী মিষ্টি ঘ্রাণ ছড়ানো বৃষ্টি! যা এই পৃথিবীতে কোনদিন কেউ কল্পনা করে নি। তারপর আল্লাহর নির্দেশে এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত হবে। আলতভাবে যে বায়ূ সকলকে স্পর্শ করে যাবে। এতে সকলেই এক অন্য রকম সজীবতা ও প্রশান্তি অনুভব করবে। সেই সাথে তাদের চেহারা ও শরীরের সৌন্দর্য আরো ঝলমলিয়ে উঠবে। তাদের পূর্বের রূপ-গুণ আরো অনেক গুণ বেড়ে যাবে। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সকলকে বেহেশতিকে পানীয় পরিবেশন করা হবে। পৃথিবীর কোনো পানীয়ের সঙ্গে সেই পানীয়ের তুলনা চলে না।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরাই বলো! দুনিয়াতে যে আমি তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলাম, তোমাদের ঈমান ও নেক আমলের বিনিময়ে অমুক অমুক নেয়ামত দান করব, সে সকল নেয়ামত তোমরা বুঝে পেয়েছো ? নাকি এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে? তখন জান্নাতবাসী প্রত্যেকেই এক বাক্যে বলবে, হে আল্লাহ! যে সব

নেয়ামত আপনি আমাদেরকে দান করেছেন, এর চাইতে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে? আপনি কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছেন পরিপূর্ণভাবেই। আমরা আমাদের প্রতিটি আমলের বিনিময় পেয়ে গেছি। এখন কোনো কিছুর প্রতি আমাদের আর আগ্রহ নেই। সব রকমের সুখ শান্তি আমরা পেয়েছি। কামনা-বাসনার কিছু আমাদের মাঝে আর নেই। এরপরও আর কি বাকী থাকতে পারে? হাদীস শরীফে এসেছে, এখানেও ওলামায়ে কেরামের দরকার হবে। এ প্রশ্নের উত্তরের সময় সকলেই ছুটে যাবে তাদের নিকট। জানতে চাইবে, এমন কি নেয়ামত আছে, যা আমরা এখনও পাইনি? ওলামায়ে কেরাম জানাবেন, হ্যাঁ! এখনও একটি নেয়ামত বাকি আছে। তোমরা আল্লাহর দরবারে তাঁর দিদার প্রার্থনা করো। তখন সকল বেহেশতি এক বাক্যে প্রার্থনা করে ওঠবে, হে আল্লাহ! এখনও একটি মহান নেয়ামত আমরা পাই নি। তা হলো আপনার দিদার। এ নেয়ামত এখনও বাকি আছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ! একটি নেয়ামত এখনও তোমরা পাও নি। এখনই তোমাদেরকে এ নেয়ামত দিয়ে ধন্য করা হবে। এরপর সকলেই আল্লাহর দিদার লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা সকলের সামনে নিজের মহান সত্তাকে প্রকাশ করবেন। বেহেশতিদের কাছে এ সুমহান নেয়ামতের তুলনায় পূর্বের সকল নেয়ামত মনে হবে একে বারেই নগণ্য ও তুচ্ছ। মনে হবে এটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। মহান প্রভুর দিদার লাভের পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্য দিয়ে এ দরবারের সমাপ্তি ঘটবে। তারপর সকলেই পৌছে যাবে নিজ নিজ ঠিকানায়।

রূপ সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। বেহেশতি পুরুষগণ যখন নিজ নিজ ঠিকানায় গিয়ে পৌছবেন, তখন তাদের স্ত্রী ও হুরগণ জিজ্ঞেস করবে, আজ তোমাদের কী হয়েছে, তোমাদের চেহারার রূপ-লাবন্য অনেক বেড়ে গেছে? তোমরা এত রূপ কোথায় পেলে? তখন তারা বলবে, আমরা তোমাদেরকে যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তোমরাও তো দেখি তার চেয়ে অনেকগুণে বেশি রূপবতী-লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠছে। রূপের জৌলুস তো দেখি উপচে পড়ছে! হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন, উভয় শ্রেণীর এ উপচানো রূপ-সৌন্দর্য মূলত ঐ বাতসের স্পর্শের কারণে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রবাহিত হয়েছিল।

সারকথা হলো, জান্নাতে জুম'আর দিন অনেক বিশাল সমাবেশ হবে। বাজার বসবে। আল্লাহর দিদার হবে। এটা আল্লাহ তা'আলারই একান্ত করুণা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন!

হযরত শায়খুল আদব রহ.-এর পাঠদান পদ্ধতি

আব্বাজান রহ. বলতেন, হযরত এ'জায আলী সাহেবের পাঠদান পদ্ধতির নাতিজা ছিল, আমরা আরবি শিখার প্রথম বছরে আরবিতে টুকটাক রচনা লিখতে শুরু করে দিলাম। একবার মাওলানা আমাদেরকে কিছু হোম ওয়ার্ক দিয়েছিলেন। যা আমি কোনো কারণবশতঃ সম্পন্ন করতে পারি নি। যতটুকু পেরেছিলাম, তার সাথে ওজর সূচক দুই কথা লিখে পেশ করলাম। মাওলানা তা দেখে খাতার মাঝে একটি আরবি কবিতা লিখে দেন,

بقدر الله تكتسب المعال – ومن طلب العلى سَهِرَ الليالى

"চেষ্টা অনুপাতে উচ্চ পদ অর্জিত হয়,
বড় পদ পেতে হলে রাত জাগতে হয়।"

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বলেন, এরপর থেকে আমি আর কোনো দিন ঘরের লিখনির কাজে আলসেমি করি নি।

হযরত থানুভী রহ.-এর মজলিসে

কয়েকদিন পূর্বে হযরত ড. হাফীজুল্লাহ সাহেব দারুল উলূম করাচি এসেছিলেন। তিনি হলেন মুফতি মুহাম্মদ হাসান সাহেব রহ.-এর খলিফা। তিনি তাঁর সংস্পর্শে দীর্ঘ দিন ছিলেন। আর হযরত মুহাম্মদ মুফতি সাহেব রহ. হযরত থানুবী রহ.-এর খালিফা ও তাঁর একান্ত ভক্ত ছিলেন। হযরত হাফীজুল্লাহ সাহেব মুফতি মুহাম্মদ হাসান সাহেবের একটি ঘটনা শুনে বর্ণণা করে বলেন যে,

'আমরা যখন হযরত থানভী রহ.-এর মজলিসে বসতাম, তো আমাদের মাঝে এক ভিন্ন রকম পরিস্থিতি বিরাজ করত, আমাদের প্রত্যেক্যের এমন মনে হত যে, মজলিসে যতজন আছে, সবাই আমার চেয়ে শ্রেষ্ট। আর

আমি সবার চেয়ে নিকৃষ্ট ও নিম্নস্তরের। আর মনে হত, এরা সবাই কতটা অগ্রসর হয়েছে, আমি কতটা পিছিয়ে রয়েছি। একদিন আমি আমার এ অবস্থা হযরত মাওলানা খায়ের মোহাম্মদ সাহেবের কাছে বর্ণনা করলাম। তিনিও হযরত থানভী রহ.-এর খলীফা ছিলেন। আমার একথা শুনে তিনি বললেন, এরূপ অবস্থা তো আমাদেরও হয়। তাই আমরা দু'জনই থানভী রহ.-এর নিকটে গিয়ে আমাদের উভয়ের এ অবস্থার বিবরণ দিলাম। হযরত থানভী রহ.-বলেন, তোমরা তোমাদের যে অবস্থা বর্ণনা করছো, সত্যি বলছি, এরূপ অবস্থা আমারও হয়। যখন আমি কোনো মজলিসে বসি, সবাইকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও নিজেকে সবার চেয়ে নিকৃষ্ট মনে হয়।'

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর কাফ্‌ফারা

আবূ বকর সিদ্দীক রা. রাসূল সা.-এর প্রধান সাহাবী। তাঁর একজন গোলাম ছিল। যাকে তিনি কোনো কারণে লা'নত করেছিলেন। মূলত গোস্বার ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাঁর মুখে লা'নত শব্দটি বের হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি যখন রাসূল সা. শুনলেন, তিনি তাঁর এ প্রিয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন,

"لعّانين وصديقين كلّا ورب الكعبة"

> অর্থ : লা'নত করবে, সিদ্দীকও হবে, কা'বার প্রভুর কসম, এ দু'টি এক সঙ্গে থাকতে পারে না।

দেখুন! এত কঠোর ভাষা তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবীকে বলেছেন, শুধু এক গোলামের প্রতি তাকিয়ে। এরপর কী হলো? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. গোলামটিকে আজাদ করে দিয়েছিলেন।

ধোঁকাবাজ আমাদের দলভুক্ত নয়

একবার রাসূল সা. বাজারে গিয়েছিলেন। দেখতে পেলেন এক লোক গম বিক্রি করছে। তিনি গম বিক্রেতার কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর গমের স্তুপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে নিচের কিছু গম উপরিভাগে নিয়ে এলেন। দেখতে পেলেন, উপরিভাগের গমগুলো ভাল হলেও ভেতরকার গমগুলো

ভেজা জ্যাবজ্যাবে ও ভ্যাপসা। ফলে ক্রেতা যখন কিনবে, সে তো উপরিভাগের গমগুলো দেখেই কিনবে। সে মনে করবে, কত সুন্দর সোনালী গম। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এর কারণ কী? ভালো গুলোকে উপরে রাখলে আর খারাপ গুলোকে ভাল দ্বারা লুকিয়ে রাখলে কেন? খারাপগুলো যদি উপরে রাখতে, তাহলে ক্রেতা দেখতে পেত, তারপর বিবেচনা করে কিনত। অন্যথায় রেখে দিত। ওই ব্যক্তি উত্তর দিলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টির কারণে কিছু গম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই সেগুলোকে আমি ভালোগুলো দ্বারা ঢেকে রেখেছি। রাসূলাল্লাহ সা. বললেন, এরূপ করো না। নিচের গুলো উপরে করে দাও। তারপর তিনি বললেন,

مَنْ غَشَّنَا فليس منّا (صحيح مسلم، كتاب الإيمان)

"যে ব্যক্তি ধোকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

অর্থাৎ ভেজাল মিশ্রিত করে, ভালো খারাপ মিলিয়ে যদি বিক্রি করে, তাহলে এটা ভাবা যাবে না যে, আামি ধোঁকা দেইনি। কারণ আমি তো ভেজাল হলেও মাপে কম দেই নি; বরং এটাও ধোকা। আর ধোঁকাবাজ মুসলমানদের দলভুক্ত নয়; বরং এটি মুনাফেকীর নিদর্শন। কোনো মুসলমানের প্রতীক এটি নয়।

হযরত মুফতি সাহেব রহ. ও পবিত্র রওজার যিয়ারত

আব্বাজান মুফতি শফী রহ. যখন পবিত্র রওজার যিয়ারতে যেতেন, তখন রওজার একবারে নিকটে যেতেন না; বরং সব সময় তিনি রওজার নিকটবর্তী যে খুঁটিটি আছে, সেখানে কেউ দাঁড়ালে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেন।

এ প্রসঙ্গে একদিন তিনি নিজেই বলেন, একদিন মনে মনে ভাবলাম, হয়তবা আমি কঠিন হৃদয়ের মানুষ। অন্যথায় রওজার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি না কেন? এই যে আল্লাহর বান্দারা রওজার একেবারে জালি ছুঁয়ে ধরার চেষ্টা করছে, আমি এ ধরনের কিছু করি না কেন? রওজার যত কাছে যাওয়া যায়, ততই তো সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি কী করবো, আমার কদম যে উঠতে চায় না। উক্ত চিন্তা যখনই আমার অন্তরে আসে, তখনই

এই অনুভূতিতে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি যে, পবিত্র রওজা থেকে যেন আওয়াজ আসছে ...

> 'একথা মানুষের কর্ণকুহরে পৌছে দাও যে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত সমূহের উপর আমল করে, সে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আমার নিকটেই আছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের কোনো তোয়াক্কা করে না, তার অবস্থান একেবারে কাছে হোক কিংবা দূরে, প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে উভয়টিই সমান।'

উক্ত অনুভূতির মাঝে যেহেতু এ নির্দেশও আছে, 'মানুষের কাছে পৌছিয়ে দাও' তাই আব্বাজান তাঁর ওয়াজ ও আলোচনায় মানুষের সামনে এটা বর্ণনা করতেন। এমনকি বলতেন, পবিত্র রওজার এক যিয়ারতকারী বাস্তবেই এ আওয়াজ শুনেছে। তারপর একদিন বললেন, আসলে ঘটনাটি আমার সঙ্গেই ঘটেছে।

কে ওই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি?

৭ম হিজরির মুহাররম মাসে হুদায়বিয়া থেকে ফেরার আনুমানিক দেড় মাস পর নবী করীম সা. ইসলামী বাহিনী নিয়ে খায়বর বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন নবী করীম সা. খায়বরের কাছাকাছি 'সোহবা' নামক স্থানে পৌছেন, তখন ছিলো আসরের ওয়াক্ত। এখান থেকে অগ্রসর হতেই খায়বরের ভবনগুলো চোখে পড়ে। নবীজী তখন সৈন্যদল থামিয়ে এ দু'আ করেছিলেন-

اللهمَّ إنى أسئلك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من

شر هذه القرية وشر أهلها وشر مافيها.

> "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এই জনপদের, তার অধিবাসীদের এবং এখানকার সবকিছুর কল্যাণ প্রার্থনা করছি। সঙ্গে সঙ্গে এই বসতির, তার অধিবাসীদের এবং এখানকার সবকিছুর অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি।"

বর্ণনাকারী বলেন, এটি নবী কারীম সা.-এর সব সময়ের অভ্যাস। তিনি যখনই কোনো নতুন বসতিতে আসতেন, এই দু'আ করতেন।

পরদিন নবী করীম সা. খায়বরের নায়ীম কেল্লার উপর আঘাত হানলেন। এ হামলায় হযরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. সাহসিকতার সাথে লড়াই করেন। কিন্তু যুদ্ধের এক পর্যায়ে কেল্লার উপর থেকে জনৈক ইহুদি তাঁর উপর একটি চরকির তক্তা ছুড়ে মারে। যার আঘাতে তিনি শহীদ হন। তবে এরপর খুব দ্রুত কেল্লা বিজিত হয়। এরপর একে একে কয়েকটি কেল্লা পদানত হয়। তবে সবচেয়ে বড় সংঘর্ষ হয়েছিল কামুস কেল্লা জয়ের সময়। এটি সেই কেল্লা যার পাদদেশে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিচারে এটিকে খায়বারের সবচেয়ে মজবুত কেল্লা মনে করা হতো। শত্রুপক্ষ তাদের সৈন্যদলের সমস্ত শক্তি এখানেই ব্যয় করেছিল। প্রায় বিশ দিন এই কেল্লা অবরোধ করে রাখতে হয়। নবী করীম সা. একে একে বেশ কয়েকজন সাহাবীকে এই কেল্লার উপর আক্রমণ করতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কেল্লাটি পদানত হচ্ছিল না। বিজয় না করেই তাদের ফিরতে হয়েছিল। অবশেষে একদিন রাসূল সা. এরশাদ করলেন, "আমি এমন একজনের হাতে ঝাণ্ডা দিতে যাচ্ছি, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও রাসূলও তাঁকে ভালবাসেন। ইনশাআল্লাহ! তাঁর হাতে মহান আল্লাহ তা'আলা এই কেল্লা বিজিত করে দিবেন।

প্রত্যেকে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল যে, এই সৌভাগ্য কে লাভ করবে? সাহাবায়ে কেরাম কৌতুহল ও প্রতীক্ষার ঘোরে সেই রাত অতিবাহিত করলেন। সকালে সূর্য উঠতেই রাসূল সা. হযরত আলী রা.-কে ডেকে তাঁর হাতে ঝাণ্ডা অর্পন করলেন। নবীজীর এই নির্বাচন সাহাবায়ে কেরামকে অবাক করে দিল। কারণ, সে সময় হযরত আলী রা. চোখের পীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এ কথাও পাওয়া যায় যে, হযরত আলী রা. নবী করীম সা.-এর কাছে এই নিবেদন করলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি চোখের পীড়ার কারণে নিজের পা পর্যন্ত দেখতে পাই না। নবী করীম সা. তাঁর দু'চোখের উপর তাঁর থু থু মোবারক লাগিয়ে দু'আ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ ভালো হয়ে গেল। হযরত আলী

রা. ঝাণ্ডা হাতে অগ্রসর হলেন। কেল্লার পাদদেশে পৌঁছে সেই ঝাণ্ডা গেঁথে দিলেন।

নামকরা ইহুদি পালোয়ান মুরাহহাব রণ সংগীত গাইতে গাইতে সম্মুখ সমরে নেমে এলো। হযরত আলী রা. তাঁর সঙ্গে লড়াই করার এক পর্যায়ে তরবারী দিয়ে তার মাথার উপর এমন এক আঘাত করলেন যে, তার মাথা দু'ভাগ হয়ে গেল। নবী করীম সা. -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর হাত ধরেই কেল্লা বিজিত হলো।

এটি সেই কেল্লা। যার সিংহফটক উপড়ে ফেলার গল্প 'দারে খায়বর' নামে লোকমুখে বিখ্যাত। গল্পটি হলো, লড়াইয়ের এক পর্যায়ে হযরত আলী রা.-এর হাত থেকে ঢাল পড়ে গিয়েছিল। যার কাণে তিনি কেল্লার সিংহফটক উপড়ে সেটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সেই বর্ণনাটি খুবই দূর্বল। তা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। হাদীস বেত্তাগণ সেই রেওয়ায়েতটি কড়া ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কামুস কেল্লা পদানত হওয়ার পর শত্রুপক্ষের কোমর ভেঙ্গে গেলো। এরপর একে একে ওয়াতিহ, সালালিম কেল্লা বিনাযুদ্ধে বিজিত হলো। ইহুদিরা অস্ত্র ফেলে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করলো।

হযরত সফিয়া রা. -এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সফিয়া রা. ছিলেন বনূ নাযীরের সরদার হুয়াই ইবনে আখতারের কন্যা এবং কামূস কেল্লার অধিপতি কেনানার স্ত্রী। নবী করীম সা. খায়বরের উপর আক্রমণ করার কিছু পূর্বে এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, ইয়াসরিবের দিক থেকে একট চন্দ্র উড়ে তাঁর কোলে এসে পড়লো। তিনি তাঁর সে স্বপ্ন স্বামীকে জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বামী গালে চড় মেরে বসল। বলল, তুমি ইয়াসরিবের বাদশাহর স্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছো? এরপরই নবী করীম সা. কামূস কেল্লা জয় করেন। সেই যুদ্ধে কেনানা নিহত হয়। হযরত সাফিয়া যুদ্ধবন্দি হিসেবে গ্রেফতার হন। সাহাবায়ে কেরাম রা. নবীজীর সকাশে নিবেদন করলেন, সে এক সর্দারের মেয়ে, আরেক সরদারের স্ত্রী। এ কারণে আপনি তাকে অন্য কারো দাসী না বানিয়ে আপনার দাসী বানিয়ে নিন। নবী করীম সা. তাঁকে ডেকে বললেন,

তুমি যদি তোমার ধর্মের উপর থেকে যেতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে বাধ্য করবো না। কিন্তু তুমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গ্রহণ করো, তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে। এরপর নবীজী বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে আজাদ করে তোমার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তুমি তাদের সঙ্গে থাকতে পারবে। আর যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে আজাদ করে আমি নিজে তোমাকে বিয়ে করে নিবো। হযরত সফিয়া রা. দ্বিতীয় পথ বেছে নিলেন। এভাবে তিনি নবী করীম সা.-এর পূণ্যবতী স্ত্রী হওয়ার মহা সৌভাগ্য অর্জন করেন।

নবী করীম সা. 'সোহবা' নামক এই স্থানটিতে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। এখানেই হযরত সাফিয়া রা.-এর সাথে বিয়ের অলিমাও অনুষ্ঠিত হয়। অলিমার আয়োজনও ছিল অন্য রকম। চামড়ার একটি দস্তরখান বিছিয়ে দেওয়া হল। হযরত আনাস রা.-কে বলা হল, তুমি সবাইকে জানিয়ে দাও– যার কাছে যা খাবার আছে, সে যেন তা নিয়ে উপস্থিত হয়। কেউ খেজুর নিয়ে এলো। কেউ আনলো পনির। কেউ যব হাজির করলো। কেউ ঘি আনলো। এভাবে যখন কিছু খাবার জমা হলো। তখন সবাই একসঙ্গে বসে খেয়ে নিলেন। এই আয়োজনে কোনো গোশত বা রুটি ছিল না। -(সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

হযরত আবূ বকর রা.-এর ইমামতি

হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস সায়েদী রা. বলেন, রাসূল সা. একদিন জানতে পারলেন যে, বনূ আমর ও ইবনে আওফের পরস্পরের মাঝে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়েছে। রাসূল সা. এ ঝগড়া মিটমাট করে দেওয়ার লক্ষ্যে তাদের মাঝে গেলেন। সঙ্গে কতিপয় সাহাবীকেও নিয়ে গেলেন। যেন মীমাংসা কর্মে তাঁকে সহযোগীতা করতে পারেন। সেখানে দীর্ঘ কথাবার্তার প্রয়োজন হয়। এমনকি নামাযের সময় চলে আসে। তথা মসজিদে নববীতে নবীজী যে সময়টিতে নামায পড়তেন, সেই সময় চলে আসে। কিন্তু যেহেতু তিনি মীমাংসাকর্ম এখনো শেষ করতে পারেন নি, তাই মসজিদে নববীতেও যেতে পারলেন না।

হাদীসটি এখানে উল্লেখ করার দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, রাসূল সা. মানুষের মাঝে ঝগড়া-ফ্যাসাদ মিটানো এবং পরস্পর সম্প্রীতি সৃষ্টি করার ব্যাপারে এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে এত সময় ব্যয় করেছেন; এমনকি এ কারণে তিনি নামাযের নির্দিষ্ট সময় চলে আসার পরও মসজিদে যেতে পারেন নি।

বর্ণনাকারী বলেন, নবীজীর মোয়াজ্জেন হযরত বেলাল রা. যখন দেখলেন, নামাযের সময় চলে আসার পরও হুযুর সা. এখনো আসেন নি, তাই তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.-এর নিকট গিয়ে আরজ করলেন, হে আবূ বকর সিদ্দীক! নামাযের সময় উপস্থিত। অথচ রাসূল সা. এখনো আসেন নি। মানুষ নামাযের অপেক্ষায় আছে, হতে পারে নবীজীর আসতে আরো কিছু দেরি হবে। তাই আপনি ইমামত করবেন কি? সিদ্দীকে আকবর রা. উত্তর দিলেন, রাসূল সা. -এর যখন আরো বিলম্ব করার সম্ভাবনা আছে, তাহলে যদি বলো, আমরা নামায পড়ে নিতে পারি। অতঃপর হযরত বেলাল রা. 'আল্লাহু আকবর' বলে উঠলেন আর হযরত আবূ বকর রা. ইমামতির স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবূ বকর রা. যখন 'আল্লাহু আকবর' বলে নামায শুরু করলেন, অবশিষ্টরা তাঁর ইকতেদা করলেন। ইতিমধ্য হুযূর সা. তাশরীফ আনলেন এবং তিনিও আবু বকরের ইকতেদা করে কাতারের এক পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। মানুষ যখন দেখলো, নবীজী এসেছেন; অথচ আবূ বকর রা. এখনও জানেন না, ভাবলো- আবূ বকরকে তো জানানো উচিত, যেন তিনি পিছনে এসে ইমামতির জন্য হুযূর সা. কে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারেন। সেই সময়ে এ বিষয়ে যেহেতু মানুষের মাসআলা জানা ছিল না, তাই তারা তালি বাজিয়ে আবূ বকরকে সতর্ক করার চেষ্টা শুরু করল। কিন্তু হযরত আবূ বকর রা. তো নামায শুরু করলে অন্য জগতে চলে যেতেন, ডানে বামে কি হচ্ছে, সেই খবর তাঁর থাকতো না। তাই প্রথমে একজন তালি বাজানোর পরও তাঁর কানে যায় নি। তখনও তিনি নামাযেই ব্যস্ত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন দেখলেন, এক দু'জনের তালিতে কাজ হচ্ছে না, তাই তারা কয়েকজন মিলে আরো জোরে তালি বাজাতে লাগলেন। এতক্ষণে আবূ বকর রা.-এর বোধোদয় হলো এবং আড়চোখে ডানে বামে তাকালেন। তখনই দেখতে

পেলেন হুযুর সা. এসেছেন। কাতারের মাঝে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। পেছনে যেতে আরম্ভ করলেন। এই অবস্থায় হুযূর সা. তাকে ইঙ্গিতে বোঝালেন যে, পিছনে চলে আসার প্রয়োজন নেই। আপন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে নামায শেষ কর। এতদসত্ত্বেও হযরত আবূ বকর রা. রাসূল সা.-এর সামনে দাঁড়িয়ে ইমামতি করার সাহস পেলেন না। তাই উল্টো পদক্ষেপে পেছনের দিকে আসতে আসতে কাতারের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর হুযূর সা. অগ্রসর হয়ে ইমামতি করলেন এবং অবশিষ্ট নামায শেষ করলেন।

নামায শেষে হুযূর সা. সকলের প্রতি সম্বোধন করে বললেন, 'নামাযের মাঝে কোনো বিষয় দেখা দিলে তালি বাজানো আরম্ভ কর। এটা কি ধরনের পদ্ধতি? এটা তো নামাযের মর্যাদার পরিপন্থী। তা ছাড়া তালি বাজানো তো মহিলাদের জন্য বৈধ হতে পারে। অর্থাৎ এমনিতে তো মহিলাদের জামাত করা উচিত নয়। যদিও করে, অথবা যদি তারা পুরুষের জামাতে শামিল হয় আর তখন কোনো ব্যাপারে ইমামের মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রে তাদের প্রতি নির্দেশ হলো, হাতের উপর হাত মেরে তালি বাজাবে। তাদের নামাযের মাঝে سبحان الله الحمد الله বলা উচিত নয়। কারণ, এরূপ করলে তাদের স্বর পুরুষদের কানে পৌঁছবে। অথচ তাদের স্বরও পর্দার শামিল। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো ঘটনা ঘটলে বিধান হলো, তারা سبحان الله অথবা الحمد الله বলে ইমামের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। অনেক সময় দেখা যায়, ইমাম সাহেব স্বশব্দে কেরাত পড়ার স্থলে নিঃশব্দে পড়া শুরু করেছেন, তখনও এই একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ মুক্তাদিরা سبحان الله ,الحمد الله বলে ইমাম সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। মোটকথা, নামাযের এরূপ কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে হুযূর সা. বলেছেন, তখন তোমরা তালি বাজিয়ো না; বরং سبحان الله বলবে।

অতঃপর হযরত আবূ বকর রা. -এর দিকে ফিরে রাসূল সা. বললেন, হে আবূ বকর! আমি তো ইঙ্গিতে আপনাকে পেছনে না আসার জন্য বলেছিলাম। ইঙ্গিত করেছিলাম, আপনি ইমামতি চালিয়ে যান, তারপরেও

আপনি পিছনে চলে আসলেন এবং ইমামতি করার ব্যাপারে সংকোচ বোধ করলেন। আপনি এমন করলেন কেন? উত্তরে হযরত আবূ বকর রা. বিস্ময়কর বাক্য উচ্চারণ করেছেন। তিনি বললেন,

"من كان لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم"

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ কুহাফার ছেলের এই স্পর্ধা ছিল না যে, রাসূল সা.-এর উপস্থিতিতে মানুষের ইমামতি করবে।"

আবূ কুহাফা হযরত আবূ বকর রা.-এর পিতার নাম। তাহলে বক্তব্য দাঁড়ায়, আমার এতবড় স্পর্ধা ছিল না যে, আপনি আছেন আর আমি ইমামের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবো। আপনি যখন ছিলেন না, তখন ছিলো ভিন্ন কথা। কিন্তু আপনি চলে আসার পর ইমামতি চালু রাখার মত দুঃসাহস আমার ছিলো না। তাই পিছনে সরে এসেছি। হযরত আবূ বকরের এই উত্তর শুনে মহানবী সা. আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। তিনি নীরব থাকাই সমীচীন মনে করলেন।

রাসূল সা.-এর সদকা

আমাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো। তাহলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর নিজের অবস্থা ছিল, যত সম্পদ আসছে সবই সদকা করে দিতেন। এক বারের ঘটনা, রাসূল সা. নামাজ পড়ানোর উদ্দেশ্যে জায়নামাজে গেলেন, ইতোমধ্যে ইকামত হয়ে গেল। এখনই নামাজ আরম্ভ করবেন। হঠাৎ জায়নামাজ থেকে সরে ঘরে চলে গেলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নামাজ পড়লেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্যবোধ করে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনি এমন কাজ করলেন, যা ইতিপূর্বে কখনো করেন নি। এর কারণ কি? বিশ্ব নবী সা. উত্তর দিলেন, আমার ঘরে যাওয়ার কারণ হলো, আমি যখন জায়নামাজে দাঁড়িয়েছি, তখন স্মরণ হলো, আমার ঘরে সাতটি দীনার আছে। মুহাম্মদ সা. আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে আর তার ঘরে সাতটি দীনার থাকবে- এ ব্যাপারটিতে আমার খুব

লজ্জা অনুভব হলো। তাই আমি সেগুলো বিলিয়ে দিতে গেলাম। তারপর এসে নামাজ পড়লাম।

বুলগার পরিচিতি

"বুলগার" নরওয়ের একটি শহর। শহরটি ৫৫ ডিগ্রী অক্ষাংশে এবং ৬৬ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। মুক্তাদী বিল্লাহ-এর শাসনামলে বুলার নামে একজন মুসলমান বুযুর্গ ব্যক্তি ঐ শহরে পৌছে দেখতে পান যে, শহরের রাজা ও রাণী কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত। জীবনের ব্যাপারে তারা নিরাশ হয়ে পড়েছেন। বুলার তাদেরকে বললেন, আমি আপনাদের চিকিৎসা করলে আপনারা কি আমার ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ করবেন? রাজা ও রাণী সম্মতি জানান। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে বুলারের চিকিৎসায় তারা দু'জনই সুস্থ হয়ে উঠেন। বুলারের হাতে তারা মুসলমান হন। রাজা রাণী মুসলমান হওয়ার ফলে গোটা শহরের সব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা মুক্তাদির বিল্লাহ-এর কাছে পয়গাম পাঠান যে, আমাদের কাছে একজন লোক পাঠিয়ে দিন, যিনি আমাদেরকে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা দিতে পারবেন।

বুলারের অদূরবর্তী 'খাযর' এলাকার রাজা ছিলেন অমুসলিম। তিনি বুলগারের রাজা ও তার অধিবাসীদের মুসলমান হওয়ার সংবাদ পেয়ে বুলগারে আক্রমণ করেন। বুলার বুলগারের অধিবাসীদের বললেন, 'তোমরা ভয় করো না। আল্লাহ আকবার, আল্লাহু আকবার বলে শত্রুর মোকাবিলা করবে।' এভাবে উভয় দলের মধ্যে লড়াই হয়। খাযারের রাজা পরাজিত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি বুলগারের রাজার সাথে সন্ধি করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ চলাকালে আমি আপনাদের বাহিনীতে লাল রঙের ঘোড়ায় আরোহিত অস্বাভাবিক বড়ো কিছু মানুষ দেখতে পেয়েছি। তারা আমার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করেছিলেন। বুলার বললেন, 'তারা আল্লাহর প্রেরিত বাহিনী।' এ গোটা শহর যেহেতু বুলারের দাওয়াতে মুসলমান হয়েছিল, তাই শহরের নামও বুলার রাখা হয়। কাল পরিক্রমায় তা বুলগার হয়ে যায়।

মুসলমানদের জন্য একটি অর্থ সংস্থা

মেলবোর্নে মিস্টার নাসের আবদুল হাকীম নামে মিসরি মুসলমান 'মুসলিম কমিউনিটি কো-অপারেটিভ' নামে (যার সংক্ষিপ্ত রূপ MCCA হওয়ার কারণে মানুষ একে মক্ক উচ্চারণ করে) একটি অর্থ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী বিধান অনুসারে পূঁজি বিনিয়োগের কাজ করা। নাসের সাহেবের এবং স্থানীয় আলেমগণের ইচ্ছা ছিলো, আমি যেন প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করি এবং এটি কতটুকু শরিয়তের চাহিদা অনুযায়ী চলছে, তা প্রত্যক্ষ করি। তাই ২রা মে মঙ্গলবার নয়টায় তাঁর অফিসে যাওয়ার কথা ছিল। অফিসটি মেলবোর্ণ শহরে অবস্থিত। মিস্টার নাসের আবদুল হাকিম আমার কাছে প্রতিষ্ঠানটির মূল গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা করলেন। এর মূল কথা হলো, এই প্রতিষ্ঠানে মানুষ তাদের ব্যয় অতিরিক্ত অর্থ জমা রেখে তার শেয়ার লাভ করে এবং প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের ইসলামিক বিধি-বিধান অনযায়ী লোদেরকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পূঁজি সরবরাহ করে থাকে। প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত যত কাজ করেছে, তার একটি বড়ো অংশে আবাসিক বাড়ি ব্যবস্থা করার জন্যে পূঁজির যোগান দিয়েছে। Diminishig Purtership (ক্রমহ্রাস মান অংশীদারি) -এর মূলনীতির ভিত্তিতে তারা পূঁজি সরবরাহের কাঠামো তৈরি করেছেন। এর অর্থ হলো, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌথ অংশীদারিত্বে বাড়ি ক্রয় করা হয়। বিশ শতাংশ মূল্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিশোধ করে। আর আশি শতাংশ পূরণ করে প্রতিষ্ঠান। এরপর প্রতিষ্ঠান তার নিজের অংশ ঐ ব্যক্তিকে ভাড়া দেয়। তিনি ক্রমান্বয়ে বাড়ির প্রতিষ্ঠানের অংশটি ক্রয় করেন এবং এক সময় পুরো বাড়িটির মালিক হন।

পশ্চিমা দেশগুলোতে বাড়ির মালিকানা লাভের জন্য সাধারণত সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতে হয়। তাই শরিয়ত সম্মত পন্থায় বাড়ি পাওয়া মুসলমানদের জন্য একটি বিরাট সমস্যা। আলহামদুলিল্লাহ! এখন যে সব দেশে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী বিধান অনুসারে বাড়ির মালিকানা লাভ করা সম্ভব হয়। মুসলিম কমিউনিটি কো-অপারেটিভ এ ধরনেরই একটি প্রতিষ্ঠান। মিস্টার নাসের আবদুল হাকিম বললেন, গত বছর প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের মধ্যে সাত শতাংশ লভ্যাংশ

বণ্টন করা হয়েছে। এটি ওখানকার লভ্যাংশের হারের দিক থেকে একটি বড় ধরনের সফলতা।

সমগ্র দুনিয়া মাছির একটি ডানার সমানও নয়

এক হাদীসে নবী করীম সা. বলেছেন,

لو كانت الدنيا تعدل عن الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة

অর্থাৎ দুনিয়ার মর্যাদা যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাছির একটি ডানার সমানও হতো। তাহলে তিনি কোনো কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।" -জামে তিরমিযি, কিতাবুয যুহদ, হাদীস : ২৩২১

দুনিয়ার মূল্যহীনতার কারণেই কাফেররা পার্থিব জগতে আয়েশী জীবন যাপন করতে পারে। আল্লাহর নাফরমানি সত্ত্বেও দূরাচারী কাফের গোষ্ঠি কত সুখে জীবন কাটাচ্ছে। দুনিয়া এতই তুচ্ছ যে, তার মর্যাদা মাছির একটি ডানা বরাবরও নয়। যদি মাছির একটি ডানাসম মর্যাদাও তার থাকত, তাহলে কোনো কাফেরের ভাগ্যে পানির একটি চুমুকও জুটতো না।

একবার কোনো এক পথে হুযূর সা. সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন, কান কাটা মৃত একটি ছাগল ছানা পড়ে আছে। তিনি মৃত ছাগল ছানাটির প্রতি ইঙ্গিত করে সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যে এ ছাগল ছানাটিকে এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ছানাটি যদি জীবিতও থাকত, তাহলেও এক দেরহামের বিনিময়ে কেউ একে খারিদ করত না। কারণ এটি কানকাটা ত্রুটি যুক্ত। আর এখন তো সে মৃত। মৃত লাশটি নিয়ে আমরা কি করবো? অতঃপর হুযূর সা. বললেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট এ পার্থিব জগৎ ও তার সকল ধন সম্পদের মূল্য তার চেয়েও তুচ্ছ। বকরির এ ছানাটির যেমনিভাবে তোমাদের কাছে কোনো মূল্য নেই, তেমনিভাবে এ দুনিয়ারও কোনো মূল্য আল্লাহ তা'আলার কাছে নেই।

সাহাবায়ে কেরামের অস্থি-মজ্জায় নবী করীম সা.-এর কথা বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, দুনিয়ার প্রতি কোনো উৎসাহ থাকতে পারবে না। তাকে অন্তর দেওয়া যাবে না। প্রয়োজন মুহূর্তে তাকে অবশ্যই কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু ভালবাসা যাবে না। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের হৃদয় থেকে দুনিয়া চলে যাওয়ার পর সারা দুনিয়া তাদের গোলামে পরিণত হয়েছে। কিসরা তাদের কদমে আঁচড়ে পড়েছে, কাইসার তাদের পদতলে অবনত হয়েছে। অথচ তারা কিসরা কাইসারের ধন সম্পদের প্রতি চোখ তুলেও তাকান নি।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে অভাব অনটন

হযরত আয়েশা রা. বলেন, সেই সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিলো, একবার নকশি করা একটি সুতি কাপড় আমাদের ঘরে কোত্থেকে যেন হাদিয়া স্বরূপ এসেছিল। কাপড়টি বেশি দামি ছিল না। অথচ পুরো মদিনার কোথাও কোনো বিয়ে হলে কনেকে সেই কাপড়টি পরিধান করানোর জন্য সকলেই তা আমার নিকট ধার নিত। বিয়ে শাদিতে এই কাপড়টিই ছিল কনের জন্য মূল্যবান বস্ত্র। অতঃপর আয়েশা রা. বলেন, অথচ আজ এ ধরনের কত কাপড় বাজারে লুটোপুটি খাচ্ছে। ওই কাপড়টি যদি এখন আমার বাঁ দিকে দিই, তাহলে সেও নাক ছিটকাবে। ঘটনাটি থেকে অনুধাবন করুন, নবী করীম সা. -এর যুগের অভাব অনটন কত তীব্র ছিল।

আব্বাজানের মজলিসে আমার উপস্থিতি

আব্বাজানের মজলিস বসতো সপ্তাহের প্রতি রবিবার। কারণ, তখনকার দিনে সরকারী ছুটি ছিল প্রতি রবিবার। এটি শেষ মজলিসের ঘটনা। এরপর আব্বাজানের আর কোনো মজলিস হয় নি। পরবর্তী মজলিস আসার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আব্বাজান যেহেতু তখন অসুস্থ ও শয্যাশায়ী ছিলেন, তাই তাঁর রুমে সবসময় লোকজনের আসা যাওয়া লেগেই থাকতো। আব্বাজান খাটে থাকতেন, আর লোকজন গিয়ে সামনে, নিচে এবং সোফার উপর বসে যেত। ওই দিন অনেক লোকের সমাগম

হয়েছিল বিধায় রূম একেবারে ভারপুর ছিলো। কেউ কেউ তখন দাঁড়িয়েও ছিল। আমি সেদিন একটু বিলম্বে পৌছলাম। আব্বাজান আমাকে দেখেই বললেন, তুমি আমার নিকট চলে আসো। কিন্তু এত লোককে ডিঙ্গিয়ে আমি কীভাবে তাঁর নিকট যাবো? বিধায় একটু সংবোচবোধ করতে লাগলাম। যদিও আমি জানতাম, শিষ্টাচার পরিপন্থী বিষয়েও বড়দের নির্দেশ মানতে হয়, তবু কেন যেন আমার দ্বিধাবোধ হল। আব্বাজান এই অবস্থা দেখে পুনরায় বললেন, তুমি আমার নিকট চল আসো, তোমাকে একটি গল্প শোনাবো। অবশেষে আমি কোনো মতে আব্বাজানের নিকট গিয়ে বসে পড়লাম।

আব্বাজন বলতে লাগলেন, একবার হযরত থানভী রহ.-এর দরবারে মজলিসে চলছিল। সেখানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। ছোট্ট কামরা, সংকীর্ণ জায়গা, আর মানুষ কানায় কানায় পূর্ণ, অথচ আমি পৌছলাম দেরি করে। হযরত আমাকে দেখে বললেন, আসো, আমার নিকট চলে আসো। আমি তখন এত লোকের মাঝখান দিয়ে হযরতের নিকট কীভাবে পৌছবো- এ দ্বিধা-সংকোচে পড়ে গেলাম। হযরত পুনরায় আমাকে বললেন, আমার কাছে চলে আসো, তোমাকে একটি গল্প শুনাবো। হযরত আমাকে এই গল্পটি শোনালেন।

'মোঘল সম্রাট আলমগীর রহ.-এর পিতার ইন্তেকালের পর স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি দেখা দিলো। আলমগীরগণ ছিলেন দুইভাই। অপর ভাইয়ের নাম ছিলো দারাশাকু। তারা পরস্পর ছিল সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী। উভয় ভাই ছিলেন সিংহাসনের প্রত্যাশী। তাদের সময়ে একজন বুযুর্গ ছিলেন। উভয় ভাইয়ের ইচ্ছা হলো বুযুর্গের কাছ থেকে নিজের জন্য দু'আ নেওয়া।

প্রথমে গেলেন দারাশাকু। বুযুর্গ তখন নিজ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দারাশাকুকে বললেন, আসো, এখানে খাটের উপর আমার নিকট বসো। দারাশাকু উত্তর দিলেন, আমি নিচেই বসি; আপনার সামনে আপনার খাটের উপর বসার দুঃসাহস আমার নেই। বুযুর্গ পুনরায় বললেন, আমি তোমাকে ডাকছি। তুমি আসো, এখানে আমার পাশে বসো। বুযুর্গের কথা দারাশাকু তবুও মানল না। সে নিচেই বসে রইল। অবশেষে বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা, তোমার মর্জি। এই বলে তিনি তাকে যা নসিহত করার ছিলো করে দিলেন। উপদেশান্তে দারাশাকু চলে গেলো।

কিছুক্ষণ পর আসলেন আলমগীর। তিনি এসে যখন নিচে বসতে উদ্যত হলেন, বুজুর্গ বললেন, তুমি নিচে বসো না; বরং আমার কাছে বসো। আলমগীর বুজুর্গের নির্দেশ শুনে তৎক্ষণাৎ গিয়ে উপরে ওঠে বসে পড়লেন।

তারপর বুজুর্গের উপদেশ শুনলেন এবং নিজ গন্তব্যের পথে পা বাড়ালেন। উভয়ই বিদায় নেওয়ার পর বুজুর্গ উপস্থিত লোকজনকে বললেন, তারা নিজেদের ব্যাপারে নিজেরাই তো ফয়সালা করে নিল। দারাশাকুকে আমি সিংহাসন দিতে চেয়েছি, সে নিতে অস্বীকার করল। আর আলমগীরকে দেওয়ার পর সে তা লুফে নিল। সুতরাং ফয়সালা হয়ে গেছে। সিংহানের উপযুক্ত আলমগীরই। শেষ অবদি সিংহাসন আলমগীরের ভাগ্যেই জুটল।

দু'জন সর্ব নিম্ন জান্নাতীর জান্নাত

১. বিখ্যাত সাহাবী হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত মূসা আ. আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ! বেহেশতিদের মধ্য থেকে সবচেয়ে নিম্নস্তরের বেহেশতে কে থাকবে? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিয়েছিলেন, যখন সকল বেহেশতি জান্নাত চলে যাবে, জাহান্নামীরা চলে যাবে জাহান্নামে, তখন এক ব্যক্তি জান্নাতের বাইরে থেকে যাবে। সে জান্নাতের আশে পাশে কোথাও ঠাঁই নেবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, দুনিয়াতে থাকাকালে নিশ্চয়ই তুমি বড় বড় রাজা-বাদশার গল্প শুনেছে।

সে সবের মধ্য থেকে তোমার পছন্দনীয় গল্পটি আমাকে বলো। কতটা বিস্তৃত ছিলো তাদের রাজত্ব। তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমাকে শোনাও।

তখন সে ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! আমি অমুক অমুক বাদশার গল্প শুনেছি। তাদের রাজত্ব ছিলো বিশাল। তারা আপনার পক্ষ থেকে বিপুল নেয়ামত পেয়েছিলো। আহা! আমিও যদি সে রকম রাজত্ব পেতাম। এভাবে সে তার জ্ঞানের ঝুলি থেকে চারজন বাদশার গল্প শুনাবে, যারা দুনিয়াতে বিভিন্ন সময় রাজত্ব করেছিলো। বিস্তারিত শোনার পর আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি তো তাদের রাজত্বের কথা শুনালে, কিন্তু তাদের জীবনের ভোগ বিলাশের কথা তো শুনালে না।

তখন সে তার ইচ্ছেমত তাদের সেসব ভোগ-বিলাসের কথা তুলে ধরবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা! সেসব রাজা-

বাদশার গল্প, তাদের রাজত্বের গল্প, তাদের এলাকার গল্প ও ভোগ বিলাসের গল্প আমাকে শুনিয়েছো, তার সব গুলো যদি তোমাকে একসঙ্গে দেওয়া হয়, তাহলে কি তুমি খুশি হবে? তখন লোকটি আরজ করবে, হে আল্লাহ! এর চাইতে মহান নেয়ামত আর কি হতে পারে! আমি অবশ্যই খুশি হবো। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার গল্পের চার রাজা-বাদশা, তাদের নয়নাভিরাম রাজত্ব ও ভোগ বিলাশের চেয়েও দশগুণ প্রাচুর্য আমি তোমাকে দান করলাম। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ. কে বললেন, সর্ব নিম্ন বেহেশতির অবস্থা হবে এমনই। এ কথা শোনর পর হযরত মূসা আ. বললেন, হে আল্লাহ! এ যদি হয় সর্বনিম্ন বেহেশতির অবস্থা, তা হলে আপনার সেই প্রিয় বান্দার অবস্থা কেমন হবে, যাকে আপনি উচ্চতর জান্নাত দান করবেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রিয় বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে, তার সম্মানে আমি যে সব আয়োজন করবো, সেগুলো তো সৃষ্টি করে আমি এমন এক সুরক্ষিত ভাণ্ডারে এমন ভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি যে,

"ما لم ترعين ولم يسمع أذن ولم يخطر على قلب أحد من الخلق"

'যা কোনো চোখ দর্শন করে নি, কোনো কান যার কথা শ্রবণ করে নি এবং যা কোনো মানুষ আজো কল্পনা করে নি।'

২. অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা হবে, বদ আমলের কারণে প্রথমে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কারণ, মুমিন বান্দাও বদ আমল করলে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ জন্য সে প্রথমে জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামে দগ্ধ হওয়া অবস্থায় সে আল্লাহর কাছে আরজ করবে, হে আল্লাহ! জাহান্নামের অগ্নি জিহ্বা ও তার উত্তাপ আমাকে পুড়ে ফেলেছে। আমার প্রতি বড় দয়া হবে, যদি আমাকে সামান্য সময়ের জন্য হলেও জাহান্নাম থেকে উঠিয়ে পাড়ে বসিয়ে দেন, যেন ক্ষণিকের জন্য হলেও আগুন থেকে বাঁচতে পারি। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, এরপরে আর কিছু দাবি করবে না তো? বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আমি ওয়াদা দিচ্ছি, এরপর আমি আর কিছু দাবী করবো না। আল্লাহ বলবেন, ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি। তারপর এই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে জাহান্নামের পাড়ে বসিয়ে দেওয়া

হবে। জাহান্নামের পাড় ঠাঁই নেওয়ার পর তার বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তিতে আরো কিছু পাওয়ার আশা ঝিলিক দিয়ে ওঠবে। সে পুনরায় ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! জাহান্নামের অগ্নিগর্ভ থেকে তো মুক্তি দিয়েছেন আপনিই। এটা আপনার করুণা। কিন্তু বসিয়েছেন এমন স্থানে যেখানে জাহান্নামের অগ্নি-জিহ্বা যথারীতি আমাকে লেহন করছে। যদি আমাকে সমান্য সময়ের জন্য এমন স্থানে জায়গা দিতেন, যেখানে জাহান্নামের উত্তাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, বান্দা! তুমি তো সবেমাত্র বলেছিলে যে, আর কোনো কিছু চাইবে না, সে ওয়াদা কি তুমি লঙ্ঘন করছো? বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! বেশি নয়, আমাকে এখান থেকে একটু দূরে নিয়ে যান। অঙ্গীকার করছি, এরপর আর কোনো কিছু দাবী করবো না।

আল্লাহ তা'আলা এবারও তার ফরিয়াদ কবূল করবেন। তাকে এমন স্থানে স্থানান্তরিত করবেন, যেখান থেকে জান্নাতের হৃদয়কাড়া দৃশ্যাবলি সে দেখতে পাবে। কিছুক্ষণ পর তার চিন্তা শক্তি আরো প্রখর হয়ে ওঠবে। ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! সবই আপনার করুণা। আমাকে জাহান্নামের অগ্নিশিখা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এমন স্থানে বসতে দিয়েছেন, যেখান থেকে জান্নাতের হৃদয়কাড়া দৃশ্যাবলি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। আমাকে আরেকটু সুযোগ দিন, যেন জান্নাতের দরজার কাছে যেতে পারি এবং জান্নাতটাকে একটু দেখে নিতে পারি। আহা! জান্নাত না জানি কেমন!

আল্লাহ বলবেন, বান্দা! তুমি কিন্তু আবারও অঙ্গীকার ভঙ্গ করছো। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আপনি যখন একান্ত দয়া করে এ পর্যন্ত এনে দিয়েছেন, তখন জান্নাতটাও এক নজর দেখতে দিন। আল্লাহ বলবেন, এক নজর দেখতে দিলে তো তুমি বলবে, আমকে একটু ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিন। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে শুধু এক নজর দেখতে দিন। এরপর আর কিছুই বলবো না। তারপর মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতটা এক নজর দেখার সুযোগ করে দিবেন; কিন্তু আল্লাহর জান্নাতে এক ঝলক দেখার সাথে সাথেই সে ফরিয়াদ করে উঠবে, হে আল্লাহ! ইয়া আরহামার রাহিমীন! আপনি যখন এত দয়া করেছেন, এবার আরেকটু দয়া করুন। মেহেরবানী করে এর ভেতরেও প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ

তাআলা বলবেন, দেখ বান্দা! প্রথমেই বলেছিলাম, তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে। কিন্তু আমার অনুগ্রহে যখন এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি, তখন তোমাকে আর নিরাশ করবো না। ভেতরে প্রবেশ করবো। আর সেখানেও তোমাকে গোটা পৃথিবীর সমান এলাকা দান করবো। বান্দা বলবে, আল্লাহ গো! ওগো আর হামার রাহিমীন! ওগো দয়ার সাগর! করুণার আধার! আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? এও কী সম্ভব? আমার মত নগণ্য গোলাম এত বিশাল জান্নাতের অধিকারী হবে কেমন করে? আল্লাহ বলবেন, আমি কারো সাথে ঠাট্টা করি না। সত্যিই আমি তোমাকে এমন জান্নাত দান করলাম।

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. হাদীসটি বলার সময় হেসে ফেলেছিলেন। তারপর সে সব সাহাবী তাঁর কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন, তারাও নিজেদের শিষ্যদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করার সময় হেসে ফেলতেন। তারপর সেই শিষ্যগণও তাদের শিষ্যদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করার সময় হাসেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সা. -এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ যখনই হাদীসটি বর্ণনা করেন, তারা হাসেন। যারা তাদের কাছ থেকে হাদীসটি শুনেন তারাও হাসেন। এ কারণ এ হাদীসকে 'মুসালসাল বিয যিহ্‌ক' হাদীস বলা হয়।

আল্লাম শিব্বীর আহমদ উসমানী রহ.

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বলতেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ওসমানী রহ.-কে বক্তৃতার অসাধারণ প্রতিভা দিয়েছিলেন। সাথে সাথে হযরতের মেজাজের মাঝে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতামুখী মানসিকতাও প্রদান করেছিলেন। যার কারণে দেখা গেছে, কখনো মেজাজের মাঝে ক্লেদাক্ততা এসে গেলে তিনি বক্তৃতা চালিয়ে যাওয়ার মুড হারিয়ে ফেলতেন।

পিরোজপুরে যখন কাদিয়ানীদের সাথে আমাদের মুনাজারা হয়, তখন সেখানে ওলামায়ে দেওবন্দের অনেক বুযুর্গ হাজির হন। যাদের মধ্য হতে আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ., মাওলানা মুর্তুযা হাসান খান রহ. ও হযরত আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী রহ. -এর মত দীনি ব্যক্তিত্বগণ ও ছিলেন। এলাকাবাসী সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে সেই মহান বুযুর্গদের

মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার জন্য রাতে এক বিশাল মহা সমাবেশের আয়োজন করে।

এমনিতে এ সকল ওলামায়ে কেরাম ইলম ও ফজলের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেরাই নিজেদের উপমা ছিলেন। কিন্তু বক্তৃতার ক্ষেত্রে সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল হযরত ওসমানী রহ. -এর উপর। কেননা হযরতের বক্তৃব্য বোদ্ধামহল থেকে শুরু করে সর্বসাধারণ; সবার বোধগম্য হতো এবং জনসাধারণ তাঁর বক্তব্যে বেশ প্রভাবিত হতো। সেহেতু সমাবেশের পোগ্রামে হযরত বক্তৃতা দিবেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

কিন্তু যখন সমাবেশের সময় ঘনিয়ে আসে হঠাৎ হযরতের মানসিকতার মাঝে ক্লেদাক্ত মলিনভাবে ছেয়ে যায়। যার ফলে হযরত ওয়াজ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেন এবং এ জন্য অপারগতা প্রকাশ করেন। সে সময় যত ওলামায়ে কেরাম ছিলেন সকলই হযরতকে নবোদ্যমে বক্তৃতা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে জলসায় হাজির করার প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই মাওলানাকে রাজি করা গেল না। এমনকি হযরত মাওলানা মুর্তুযা হাসান খাঁন সাহেব প্রকাশ্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে ফেললেন।

কিন্তু আমি জানতাম, হযরত এ ব্যাপারে মা'যূর। যতক্ষণ না তিনি মন থেকে সাড়া পাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কিছুই বলতে পারবেন না। এ জন্য আমি নিরবতা অবলম্বন করলাম, সবাই যখন ব্যর্থ মনোরথে জলসার দিকে চলে যেতে লাগলেন, তখন আমি তাদের বললাম, আপনারা যান, আমি আসছি। এরপর কামরায় আমি একাই হযরতের সাথে রয়ে গেলাম। কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর আমি হযরতের কাছে নিবেদন করলাম, হযরত! আমি জানি, আপনার মনের ভেতর সংকোচ ভাব বিরাজ করছে। এখন যদি এই কামরায় একাকি বসে থাকেন, তাহলে তা বেড়ে গিয়ে দুর্বিসহ মানসিক চাপের বোঝা হয়ে মাথার উপর চেপে বসবে। তার চেয়ে বরং বয়ান করার প্রয়োজন নেই, আপনি শুধু জলসা থেকে ঘুরে আসুন। হতে পারে মেজাজ ভালো হয়ে যাবে।

তিনি বললেন, সবাই বক্তৃতার জন্য চাপচাপি করবে। আমি বললাম, তা সামলানোর দায়িত্ব আমার। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আপনাকে

জোরাজুরি করবে না। এ কথার উপর হযরত রাজি হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমরা জলসা এসে হাজির হলাম। সেখানে তখন অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বক্তব্য প্রদান করছিলেন। হযরত যখন সভাস্থলে উপস্থিত সুধী মণ্ডলীর উদ্দীপনা দেখলেন, তখন হযরতের অন্তরে নিজ থেকেই স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি নিজেই উপস্থাপককে ডেকে জানিয়ে দিলেন, তিনি কিছু কথা বলবেন, এরপর তিনি দেড় ঘণ্টা এমন বক্তৃতা করেন যে, সকলের তৃষ্ণার্ত রসনা সুতৃপ্ত হয়ে গেল।

হে আল্লাহ! আপনি কবুল করে নিন

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বলতেন, হযরত মাওলানা ওসমানী রহ. ইলম ও আমলের পর্বত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতবী রহ.-কে যেই ইলমে লাদুনী (আল্লাহ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান) প্রদান করেছিলেন, বিশেষ করে ফালসাফা (দর্শন), ইলমে কালাম (যুক্তিবিদ্যা) ও হিকমতে দ্বীন (ধর্মতত্ত্ব) -এর ক্ষেত্রে নানুতবী রহ.-কে এমনই স্মূক্ষ্ম বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ বিবেক প্রদান করেছিলেন, হযরতের এ সম্পর্কিত রচনাবলি বড় বড় আলেমদের পক্ষে বুঝা সম্ভম হয়ে উঠে না। কিন্তু দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের এ সুবিশাল জামাআতের মাঝে এমন দুই বুযুর্গ রয়েছেন, যারা হযরত কাসেম নানুতবী রহ. -এর হিকমত ও প্রজ্ঞার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তা সবার কাছে সহজবোধ্য ভাবে বোধগম্য করার জন্য পরিশ্রম ব্যয় করেছেন, তাদের একজন হলেন হযরত আল্লামা শিব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. আর অপরজন হলেন মাও. কারী তৈয়্যব সাহেব রহ.।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান শুনাতেন, যখন হযরত ওসমানী রহ. সহীহ মুসলিম শরীফের বিশ্বখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল মুলহিম সংকলন করেন, তখন তার পাণ্ডুলিপি হারামাইন শরীফাইনে নিয়েছিলেন। সেখানে নবী করীম সা. -এর রওজায়ে আকদাসের সামনে বসে ধারাবাহিকভাবে পাতা উল্টান। তারপর রওজায়ে আকদাস ও হরমে মক্কা-এর মুলতাযামে বসে পাণ্ডুলিপি মাথায় রেখে দু'আ করেছিলেন- "হে আল্লাহ! আমি অধম দরিদ্রতার ভূবনে বসে এই পাণ্ডুলিপি সংকলন করেছি, আপনি তা কবূল করে নিন এবং তার প্রকাশনার ব্যবস্থা করে নিন।"

তিনি যখন হারামাইন শরীফাইন থেকে ফিরে আসেন, তখন হায়দারাবাদের নিযামের পক্ষ থেকে হযরতের খেদমতে আর্জি আসে, আমি এ কিতাব আমার ব্যবস্থাপনায় ছেপে দিব। এভাবে কিতাবটি হায়দারাবাদের নিযামের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মহাসমারোহে সাড়ম্বরে প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি অর্জন করে নেয়।

এ-বি-সি-ডি-এর পর্দার আড়াল

হযরত আল্লামা ওসমানী রহ. পাকিস্তানের প্রথম সাংবিধানিক সংসদের সদস্য ছিলেন। সেখানে তিনি ইসলামী সংবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য দিন-রাত অন্যান্য সাংসদদের সাথে আলোচনা করতেন। একবার তাঁর কোনো এক প্রস্তাবের উপর সম্ভবত সাবেক গভর্নর জেনারেল গোলাম আহমদ বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, মাওলানা! এ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। ওলামায়ে কেরাম তার কি বুঝবে? কাজেই এ ব্যাপারে তাদের নাক না গলানোই উচিত। সে সময় হযরত যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার মধ্য হতে বাক-বিদগ্ধ একটি অংশ হচ্ছে– 'আমাদের এবং আপনাদের মাঝখানে শুধুমাত্র এ-বি-সি-ডি-এর পর্দার আড়াল। এ কৃত্রিম আবরণ উঠিয়ে দেখুন, টের পাবেন যে, অজ্ঞ কে? আর বিজ্ঞ কে?

এখতেলাফ করার পদ্ধতি

কাপড়ের পাতলা মোজা; যা খুব মোটাও নয়, কিন্তু তলায় চামড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে; এ ধরনের মোজাকে ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় رقيق منعل (রাকীকে মুনা'আল) বলা হয়। এ ধরনের মোজার উপর উপর মাসেহ করা যাবে কি না? এ নিয়ে হানাফী ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতনৈক্য রয়েছে। এ মাসআলায় শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের রায় ছিল, মাসেহ সহীহ হবে না। [এ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রমাণাদি একত্র করে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান একটি প্রবন্ধ সংকলন করেছেন, যা ফতোয়ায়ে দারুল উলূমের অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে]।

তবে হযরত মাদানী রহ. এ ধরনের মোজার উপর মাসেহ করাকে জায়েয মনে করতেন। এ নিয়ে তাঁরা একাধিকবার মৌখিকভাবে আলোচনাও

করেছেন বটে; কিনতু কোনো ঐক্যমতে উপনীত হতে পারেন নি। একদিন হযরত মাদানী রহ. বললেন, 'এ মাসআলার উপর অধিকতর বিশ্লেষণরজন্য আমি কিছু সময় বের করে দারুল উলূম ইফতায় আসবো।' সেমতে তিনি একদিন আগমন করলেন এবং আলোচনা শুরু হল। বেশ দীর্ঘ আলোচনা। যেখানে উভয় পক্ষ প্রয়োজনের সময় কিতাব খুলে প্রমাণ পেশ করতেন। হযরত মাদানী রহ. স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন আর আমি তার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করি। এভাবে প্রায় তিন দিন ধরে আলোচনা চললো। অবশেষে হযরত মাদানী রহ. বললেন, "আপনার কথাও অযৌক্তিক নয়; আবার তা আমার কাছে সুস্পষ্ট বুঝে আসছে না। অন্য দিকে আমার পেশ করা দলিলের উপর আপনি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। এ জন্য আপনি থাকুন আপনার অবস্থানে আর আমাকে ছেড়ে দিন আমার অবস্থানে।"

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. বললেন, সেই ঘটনার কিছুদিন পর একবার হযরত মাদানী রহ. আমার ভগ্নিপতি হযরত মাওলানা হাসান সাহেবের বাসায় আগমন করলেন। সে সময় আমি যেখানে উপস্থিত ছিলাম। হযরত তখন সে ধরনেরই এক জোড়া চামড়ার শুকতোলা বিশিষ্ট পাতলা মোজা পরিহিত ছিলেন। মাগরিবেরর নামাযের সময় হলে হযরত মাদানী রহ. ওযূ করলেন এবং সেই মোজার উপর মাসেহ করলেন। ওজু শেষে আমাকে বললেন, 'মুফতি সাহেব আপনার মতে এই মাসেহ শুদ্ধ নয়। এ কারণে আমার পেছনে আপনার নামায আদায় করা শুদ্ধ হবে না। তাঁর চেয়ে বরং ভালো হবে আপনিই ইমামতি করুন।' হযরতের এই কথার উপর আমি আর কৃত্রিমতা দেখাতে যাইনি। তাই সেদিন আমিই ইমামতি করি।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান এই ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন, এই সমস্ত বুজুর্গানে দীন কীভাবে এখতেলাফ করতে হয়, তার পদ্ধতিও নিজের মহৎ কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব রহ.-এর ধৈর্য ও সহনশীলতা

আব্বাজান রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবকে এক আদর্শ আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও সহিষ্ণু শক্তি প্রদান

করেছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের ভূমির কাছ ঘেষেই স্থানীয় এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কিছু জায়গা ছিল। সে জায়গায় কিছু অংশ দারুল উলূম দেওবন্দের জন্য ক্রয় করা হয়। সে নেতার মৃত্যুর পর তার কোনো এক উত্তরসূরী এক দিন মাদরাসা প্রাঙ্গণে এসে সেই জমির মালিকানাসত্ত্ব দাবি করে বসে এবং হযরত মুহতামিম সাহেবকে সম্বোধন করে উচ্চ স্বরে গালমন্দ করতে থাকে। সে এতটাই উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা তুবড়ি ছুটাচ্ছিল যে, মাওলানারই কয়েকজন ভক্ত উত্তেজিত হয়ে যায় এবং তাঁরা তাকে তাঁর ভাষাতেই উত্তর দেওয়ার সংকল্প করে ফেলে। কিন্তু মাওলানা তাদেরকে নিষেধ করে দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে বললেন, শেখ সাহেব! আপনি অযথাই রাগান্বিত হচ্ছেন। একটু ভেতরে আসুন! আরামে কিছু কথা বলি। কিন্তু লোকটি রীতিমত ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রকাশ করেই যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর মাওলানা আবার বললেন, ভেতরে এসে কথা বললে ভালো হয়। তারপর তাকে খানিকটা জোর করেই অফিসকক্ষে নিয়ে আসলেন এবং তার সাথে অত্যন্ত বিনম্র আচরণ করলেন। একটু পর সে কিছুটা নরম হলে মাওলানা ধীরে সুস্থে নিজের জায়গা থেকে ওঠে এক আলমারী খুললেন এবং সেখান থেকে কিছু কাগজ পত্র নিয়ে এসে ঐ ব্যক্তির সামনে পেশ করে বললেন, দেখুন! আপনার পূর্বসূরী অমুক তারিখে এই জমিন দারুল উলূম দেওবন্দের কাছে বিক্রি করেছে এবং তার রেজেস্ট্রিও সম্পন্ন হয়েছে।

সে ব্যক্তি কাগজ-পত্র দেখে সীমাহীন লজ্জিত হল এবং মাওলার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ দেখে হতবাক হয়ে গেল।

তিনি আমায় এমন সাহস জুগিয়েছেন

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. বলতেন, আমাকে সংকলন, গ্রন্থ রচনা ও সম্পদনামুখী করার ক্ষেত্রে হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব রহ.-এর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। হযরতের অভ্যাস ছিল, মাদরাসা পরিচালনার কাজে শত ব্যস্ততার মাঝেও ছাত্রদের প্রতি বিশেষ নজর রাখা। কোনো ছাত্রের মাঝে কোনো ধরনের প্রতিভা দেখলে তিনি তাকে সাহস জুগিয়ে তার সেই প্রতিভা বিকাশের প্রয়াস চালাতেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশুনা করার সময় থেকেই আমার উপর হযরতের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। অনেকবার এমন ঘটেছে, আমি পরীক্ষার হলে বসে উত্তর লিখছি আর হযরত আমার কাছে এসে আমার লেখা উত্তরগুলো দেখছেন। প্রায় সময় এত খুশি হতেন যে, অন্য মুদাররিসদের কাছে গিয়ে নিজ খুশি প্রকাশ করে আসতেন।

একবার কোনো এক পত্রিকায় বা পুস্তিকায় উম্মতের সর্ব সম্মত মাসআলার পরিপন্থি কোনো এক অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল। হযরত আমাকে তার জবাব লিখতে বললেন। আমি নির্দেশ পালন করলাম। এটিই ছিল আমার জীবনের প্রথম রচনা। আমি যখন রচনাটি লিখে হযরত মুহতামিম সাহেবকে দেখালাম, তখন তিনি যারপরনেই খুশি হন এবং আমাকে হযরত শাহ সাহেব, শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এজাজ আলী সাহেবসহ অন্যান্য মুদাররিসের কাছে নিয়ে যান এবং তাদেরকে আমার লেখা এ প্রবন্ধটি দেখান। সেই প্রবন্ধ ছিল আমার ছাত্রজীবনের প্রথম রচনা, সেহেতু নির্ঘাত তার মাঝে কোনো না কোনো ভুল-ত্রুটি থেকে থাকবে। কিন্তু হযরত আমার সাথে যেভাবে সদাচরণ করছেন, তা আমাকে এতটাই সাহস জুগিয়েছিলেন যে, তখন থেকে আমার মাঝে লেখালেখির প্রতি প্রচণ্ড স্পৃহা জন্ম নেয়। এরপর থেকে হযরতের দফতর হতে 'আল-কাসিম' নামে দারুল উলূম দেওবন্দের যে পত্রিকা বের হত, আমি তাতে নিয়মিত প্রবন্ধ লেখা শুরু করে দিলাম। ফরেগ হওয়ার পর কিছুদিন লেখালেখির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মত অবসরের সুযোগ ছিল না। সেহেতু এ সময় হযরতের মনে আমার প্রতি কিছুটা ক্ষোভ জন্ম নেয়। এরপর যখন আমি দু'তিনটি পুস্তিকা লিখে হযরতকে দেখালাম, তখন তিনি খুব খুশি হলে বললেন, এটিই তো সেই কাজ, যার মাঝে আমি তোমাকে ব্যস্ত দেখতে চাই।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রা.

কোনো মুসলমানের কাছে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রা.-এর পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন নেই। হযরত আবূ আইয়ূব রা.-এর মূল নাম খালেদ ইবনে যায়দ। তিনি পবিত্র মদিনার খাযরাজ গোত্রের মানুষ। শুরুতেই তিনি

ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান সাহাবী, যিনি রাসূল সা.-এর হিজরতের পর এক মাস তাঁর মেহমানদারী করার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মহানবী সা.-এর বাহন 'কাসওয়া' আবূ আইয়ূব আনসারী রা. -এর বসত ঘরের সামনে এসেই থেমে যায়।

মহানবী সা.-এর ইচ্ছায় তিনি তাঁকে নিচ তলার কামরায় থাকতে দেন। আর আবূ আইয়ূব আনসারী রা. নিজে পরিবারসহ উপর তলার কামরায় থাকেন। একবার উপরের কামরায় পানি পড়ে গেলে তারা আশংকা করে, এই পানি চুইয়ে নিচে রাসূল সা.-এর উপর পড়তে পারে। তাই তারা গায়ের চাদর বিছিয়ে পানি শুকিয়ে ফেলেন। আবূ আইয়ূব আনসারী রা. প্রতিটি যুদ্ধে রাসূল সা.-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আলী রা. তার শাসনামলে তাকে মদিনার গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরে তিনি জিহাদের আগ্রহে আলী রা.-এর কাছে চলে যান এবং তাঁর সঙ্গে খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

হযরত মু'আবিয়া রা. তার পুত্র ইয়াযীদের নেতৃত্বে কনস্টানটিনেপল আক্রমণের জন্য প্রথম যে বাহিনী প্রেরণ করেন, তাদের সঙ্গে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রা.-ও ছিলেন। সেই সময়ের অবরোধ দীর্ঘ হয়। তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইয়াযিদ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে যান। তাঁকে বলেন, কোনো কাজ থাকলে আমাকে নির্দেশ করুন। উত্তরে আবূ আইয়ূব আনসারী রা. বলেন–

"আমার একটি মাত্র আকাঙ্খা আছে, আমার মৃত্যুর পর আমার মৃত দেহ শত্রুভূমিতে যত দূর সম্ভব ভেতরে নিয়ে যাবে এবং আমাকে ওখানে দাফন করবে।"

এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন। ইয়াযিদ তাঁর অসিয়ত পূরণ করেন এবং কনস্টান্টিনেপলের নগর প্রাচীরের কাছে তাঁকে দাফন করেন।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, কনস্টান্টিনেপল বিজিত হওয়ার পর সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ গুরুত্বের সঙ্গে আবূ আইয়ূব আনসারীর কবর খোঁজ করেন। এক বুযুর্গের সহযোগিতায় সেখানে তাঁর কবর পেয়ে যান। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ 'জামে' আবি আইয়ূব' নামে ওখানে একটি

সমজিদ নির্মাণ করেন। তখন থেকে এই স্থান সাধারণ এবং বিশেষ সর্ব স্তরের মানুষের যিয়ারত কেন্দ্রে পরিণত হয়।

এখানকার পুরো মহল্লাটিকেই আবূ আইয়ূব বলা হয়। পবিত্র মাজারে বসে মানুষ কুরআন তেলাওয়াত করে থাকে।

হযরত বেলাল হাবশী রা.

হযরত বেলাল হাবশী রা. এবং তাঁর ইসলামের খেদমত সম্পর্কে কোন মুসলমান জানে না? সম্ভবত এমন কোনো মুসলমান খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি হযরত বেলাল রা.-এর মহান নাম শুনা মাত্র তাঁর হৃদয়ের তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রবল অনুরাগের পুলক অনুভব করে না। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে তিনি ছিলেন মক্কার একজন সামান্য দাস। রাসূল সা. যখন সর্ব প্রথম ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন, তখন যারা সর্বাগ্রে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। এমনকি সে সময় যখন হযরত আমর ইবনে আবাসা রা. নবী করীম সা.-এর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাওহীদের এই পয়গামে আপনার সাথী হিসেবে আর কে আছে? তখন নবীজী সা. উত্তর দিয়েছিলেন, حُرٌّ وعَبْدٌ (একজন স্বাধীন ব্যক্তি, আর একজন ক্রীতদাস)। স্বাধীন ব্যক্তি বলতে উদ্দেশ্য হযরত আবূ বকর রা. আর ক্রীতদাস বলতে উদ্দেশ্য হযরত বেলাল রা.।

হযরত বেলাল রা. যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর মালিক তাঁকে অনেক কষ্ট দেয়। দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে সেই অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করার ঘটনাগুলো আজ সোনালী ইতিহাস। তাঁকে প্রচণ্ড রোদে উত্তপ্ত কংকরের উপর শুইয়ে দেওয়া হত। ইসলাম ত্যাগ করে লাত উজ্জার উপসনায় ফিরে যেতে বল প্রয়োগ করা হত। কিন্তু এমন চরম নিপীড়ন মূলক অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে احد، احد (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) ছাড়া আর কোনো শব্দ বের হত না। অবশেষে সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বকর রা. তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

এরপর থেকে হযরত বেলাল রা. হয়ে যান নবী করীম সা.-এর নিত্য সহচর। দেশে কি বিদেশে, সব সময় তাঁর পাশে পড়ে থাকতেন। এক

সময় নবীজীর সার্বক্ষণিত মুয়াজ্জিন মনোনীত হন। হযরত বেলাল রা.-এর শিখর স্পর্শী সম্মান ও মাহাত্ব বুঝতে একটি হাদীসই যথেষ্ট। যেখানে বর্ণিত রয়েছে, একদা নবী সা. ফজরের নামাযের পর হযরত বেলাল রা. কে জিজ্ঞেস করলন, হে বেলাল! আমাকে তোমার সেই আমলটি বলো, যা তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি আশাপ্রদ। কেননা আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। উত্তরে তিনি নিবেদন করলেন, আমি দিনে কিংবা রাতে যখনই ওজু করি, সঙ্গে সঙ্গে আমার রবের জন্য যতটুকু সাধ্যে কুলায় নামায পড়ি। -[তবকাতে ইবনে সা'দ : ১/১৬৭]

এরপর একে একে অনেকগুলো দিন কেটে যায়। সময়ের পালা বদলে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে সেই মক্কা নগরী বিজিত হয়। সেখানে হযরত বেলাল রা.-কে অমানসিক নির্যাতন করা হয়েছিল। নবী করীম সা. তখন হযরত বেলাল রা.-কে কা'বা গৃহের ছাদে উঠে আজান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মাফিক হযরত বেলাল রা. এই প্রথম মক্কা মোকাররমায় কা'বা গৃহের ছাদে উঠে আজান দিলেন। -[তারীখে মক্কা : আযরাকী]

নবী করীম সা. ইন্তেকালের পর হযরত বেলাল রা.-এর কাছে মদিনা মুনাওয়ারার আকাশ-বাতাশ ভারি হয়ে ওঠে। তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। অবশেষে সিরিয়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. তাঁকে বুঝিয়ে মদিনায় রেখে দিয়েছিলেন। অতপর তিনি হযরত ওমর রা.-এর যুগে সিরিয়ায় চলে আসেন।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সিরিয়ায় অবস্থান কালে হযরত বেলাল রা. একবার স্বপ্নে রাসূল সা.-এর যিয়ারত করেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, নবী করীম সা. তাঁকে বলছেন, বেলাল! এই অবহেলা কেন? এখনো কি তোমার আমার সাথে সাক্ষাত করার সময় হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেগে ওঠেন। প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাত বাহন তলব করেন। মদিনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। রওজায়ে আকদাসে উপস্থিত হলেন। দু'চোখ বেয়ে বাধবাঙ্গা অশ্রু ঝড়ছে। হযরত হাসান ও হুসাইন রা. আগমন

করলেন। হযরত বেলাল রা. তাদের দু'জনকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। তারা দুজন নিবেদন করলেন, আমরা আপনার আযান শুনতে উদগ্রীব। হযরত বেলাল রা. ছাদে ওঠে আযান দিতে শুরু করলেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে আযান শুরু করা মাত্রই গোটা মদিনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো। যখন তিনি "আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাহ" বললেন, ঘরে ঘরে প্রচণ্ড ক্রন্দন রোল দেখা দিল। যখন তিনি বললেন, "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" তখন পর্দানশীল মহিলারা পর্যন্ত অস্থির হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। সবার মুখে একটাই কথা, রাসূল সা. দ্বিতীয়বার প্রেরিত হয়েছেন।" কথিত আছে যে, তাদেরকে এর চেয়ে বেশি কাঁদতে আর কখনই দেখা যায় নি। [উসদুল গবা ১/২৪৪-২৪৫]

উক্ত বর্ণনারটির সনদ দূর্বল। এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী সনদে বর্ণিত রয়েছে যে, ঘটনাটি সিরিয়ায় ঘটেছিল। হযরত ওমর রা. যখন সিরিয়ায় আসেন, তখন তিনি হযরত বেলাল রা.-কে আযান দেওয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি যখন আজান শুরু করলেন, তখন সবার চোখ থেকে বাধভাঙ্গা অশ্রু ঝরতে লাগল। সে দিনের চেয়ে বেশি কাঁদতে তাদেরকে আর কোনো দিন দেখা যায় নি। -[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১/৩৫৭]

হযরত বেলাল রা. -এর জীবন-চরিত থেকে জানা যায় যে, নবী করীম সা.-এর ইন্তিকালের পর থেকে হযরত বেলাল রা. প্রচণ্ড অস্থির হয়ে পড়েন। পরবর্তী জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত পরকালে নবীজীর সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় অতিবাহিত হতো। তাই তো যখন তার পরপারে যাত্রার অভিষ্ট মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি আত্ম-বিস্মৃত হয়ে এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন—

غداً نلقى الأحبة ÷ محمدًا وحزبه

"কাল প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলন হবে,
মুহাম্মাদ সা. ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে"

মৃত্যু যন্ত্রণা দেখে হযরত বেলাল রা. -এর স্ত্রী বললেন, হায় আফসোস! তার উল্টো পিঠে হযরত বেলাল রা. বললেন, আহা কী আনন্দ!

হযরত শুরাহবিল ইবনে হাসানা রা.

হযরত শুরাহবিলের মায়ের নাম হাসানা। বংশ পরিক্রমা মায়ের দিকেই সংযুক্ত। তিনিও সর্বাগ্রে ইমান আনয়নকারীদের একজন ছিলেন, যাদেরকে প্রথম জীবনে আবেসিনিয়ায় ও পরবর্তীকালে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছিল। হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. তৎকালীন সিরিয়া ভূখণ্ড জয় করার জন্য চারটি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে চারটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। তন্মোধ্যে একটি বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন হযরত শুরাহবিল ইবনে হাসানা রা.। তাঁর নেতৃত্বেই জর্ডানের অধিকাংশ এলাকা বিজিত হয়। এক সময় তিনি ফিলিস্তিনের গভর্নরের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। সিরিয়ার বিজয়াভিযানে তার বীরত্ব, সাহসিকতা, প্রাণ-বিসর্জনের চেতনা এবং বুদ্ধিদীপ্ত রণকৌশলের অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসের সোনালী বর্ণে লিখিত আছে। তিনি আমওয়াসের মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। বিস্ময়ের বিষয় হলো, তিনি ও হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররা রা. একই দিনে ইন্তিকাল করেন।

হযরত ম'আয ইবনে জাবাল রা.

হযরত ম'আয ইবনে জাবাল রা. একজন উঁচু স্তরের আনসারী সাহাবী ছিলেন। যাকে রাসূলুল্লাহ সা. أعلمهم بالحلال والحرام (সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হালাল ও হারাম বিষয়ে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী) বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি মদিনার খায়বর বংশের সন্তান ছিলেন। হিজরতের পর মদিনা থেকে যে সত্তরজন আনসারী নবী করীম সা.-এর খেদমতে হাজির হয়ে 'আকাবা' নামক স্থানে বাইআত গ্রহণ করেচিলেন, তাঁদের মাঝে তিনিও ছিলেন। সে সময় তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তখনও তাঁর দাড়ি গজায় নি। বদর যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন বিশ বছরের যুবক। বলতে গেলে সবকটি যুদ্ধে তিনি নবী করীম সা.-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী সা. হযরত মু'আয রা.-কে মক্কাবাসীদের দীন শিখানোর জন্য মক্কায় রেখে দিয়েছিলেন। -[মুস্তাদরাকে হাকেম : ৩/২৭০]

নবী করীম সা. হযরত মু'আয রা.-কে খুবই ভালবাসতেন। তিনি সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী, যাকে সম্বোধন করে একবার নবী করীম সা. বলেছিলেন, 'হে মু'আয! আমি তোমাকে সত্য করে বলছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তোমাকে ভালোবাসি।' উত্তরে হযরত মুআয রা. বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে ভীষণ ভালবাসি।' তখন নবীজী সা. তাঁকে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা শেখাবো না, যা তুমি প্রতি নামাযের পর পাঠ করবে?

رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

-[সূনানে নাসায়ী, আবূ দাউদ হাদীস নং : ১৫২২]

একবার নবী করীম সা. এরশাদ করলেন,

نعم الرجل ابو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل معاذ بن جبل.

"আবূ বকর ভালো মানুষ, ওমর ভালো মানুষ ও মুআয ইবনে জাবাল ভালো মানুষ।" [জামে তিরমিযী, বাব : মানাকিবি মুআ'য হাদীস : ৩৭৯৭]

নবী করীম সা. তাঁর সুমহান জীবনের পড়ন্ত বেলায় হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামানের গভর্নর করে প্রেরণ করেন। নবী সা. তখন তাঁকেই ইসলামী শরিয়তের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সেই বিখ্যাত প্রশ্ন করেছিলেন, কীভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করবে? হযরত মুআ'য রা. বলেছিলেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবো। যদি সেখানে কোনো সমাধান না পাই, তাহলে তাঁর রাসূল সা.-এর সুন্নাত মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেবো। নবী করীম সা. তখন ফের প্রশ্ন করলেন, যদি রাসূলের কথার মাঝে তার কোনো সমাধান খুঁজে না পাও, তবে কী করবে? হযরত মু'আয রা. বলেছিলেন, আমি আমার রায়ের ক্ষেত্রে ইজতেহাদ করবো এবং সত্যে পৌছাতে চেষ্টার কমতি করবো না।' নবী করীম সা. তখন তাঁর বুকের উপর হাত রেখে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন, যা আল্লাহর রাসূলের ইচ্ছানুকূল।" [জামে তিরমিযী, হাদীস : ১৩২৭-১৩২৮]

শুধু এতটুকুই নয়, যখন হযরত মুআয রা. -এর রওয়ানা হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো, তখন নবী কারীম সা. তাঁকে বিদায় জানাতে নিজেই চলে এলেন। এমনকি তিনি হযরত মুআয রা.-কে নিজের সামনে উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করান। এখানেই ক্ষান্ত হন নি। যখন তাঁকে নিয়ে বহনকারী উষ্ট্রী চলতে শুরু করেন, তখন নবীজী অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। নবী করীম সা. জানতেন যে, এটি আমার নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের সঙ্গে সর্বশেষ সাক্ষাৎ। আর সে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। দোজাহানের সরদার নবী করীম সা.-এর পক্ষ থেকে সাধারণত আবেগের বহিঃপ্রকাশ কদাচিৎ ঘটত বলেই ইতিহাস জানায়। কিন্তু এটি হযরত মু'আয রা.-এর সাথে নবী করীম সা. -এর এক বিশেষ বন্ধনের চমক বৈ কিছু নয় যে, এ সময় নবীজীর বরকতময় মুখে এমন কিছু বাক্য উচ্চারিত হয়, যা দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যাওয়া প্রেমাস্পদকে বিদায় জানাবার প্রাক্কালে নবীজীর হৃদয়ে আবেগের সিঞ্চন ছিলো। নবীজী সা. বলেছিলেন–

انك عسى أن لا تلقان بعد عامى هذا، ولعلك أن تمر بمسجدى وقبرى

"হে মু'আয! সম্ভবত এ বছরের পর আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাৎ ঘটবে না। হয়ত বা তোমাকে আগামীতে আমার মসজিদ বা আমার কবরের পাশ দিয়ে যেতে হবে।"

হযরত মু'আয রা. না জানি কতক্ষণ ধরে নিজের আবেগ চাপা দিয়ে ধরে রাখছিলেন। কিন্তু এ কথা শুনতেই ভেঙ্গে পড়লেন। সম্ভবত এতক্ষণ তিনি নিজের মনকে এ প্রবোধ দিতে যাচ্ছিলেন যে, এটি এক দেড় বছরের বিচ্ছেদ মাত্র। কিন্তু যখন নবী করীম সা. -এর মুখ থেকে ঐ বাক্য শুনলেন, তখন জেনে ফেললেন যে, জগত আলোকিতকারী এই প্রখর সূর্যকে আর জীবন্ত-জাগ্রত দেখা যাবে না। তাঁর মুখ থেকে হাহাকার বেরিয়ে এলো। বাঁধভাঙ্গা অশ্রু ঝরতে লাগল। নবীজী সা. বললেন, মু'আয! কেঁদো না।' এতটুকু বলে নবীজী মুখ ফিরিয়ে মদিনা মুনাওয়ারা মুখী হলেন এবং ইরশাদ করলেন–

ان أولى الناس بى المتقون من كانوا وحيث كانوا

"আমার সবচেয়ে কাছের লোক তারাই, যারা আল্লাহকে ভয় করে, সে যেই লোকই হোক আর যেখানকারই হোক।" [মুসনাদে আহমদ : ৫/৩২৫]

এরপর হযরত মুআয রা. ইয়ামান চলে গেলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন, ততোদিনে নবী করীম সা. -তাঁর প্রিয় প্রেমাস্পদের কাছে চলে গেছেন। এরপর আর হযরত মু'আয রা. মদিনা মুনাওয়ায় থাকেন নি। সিরিয়ায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো সেখানকার জিহাদে অংশগ্রহণ করা। অনন্তর শাহাদাতের তুঙ্গস্পর্শী মর্যাদা লাভ করবেন। হযরত ওমর রা. তাঁর সেই অভিপ্রায় বুঝে ফেললেন। তিনি তখন হযরত সিদ্দীকে আকবার রা.-এর কাছে নিবেদন করলেন, আপনি তাঁকে মদিনা মুনাওয়ারাতেই রেখে দিন। এ মুহূর্তে জাতির তাঁর খুব প্রয়োজন। উত্তরে হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. বললেন, সে নিজের জন্য বিশেষ এক পথ (শাহাদাত) বেছে নিয়েছে। কাজেই আমি তাঁকে বাধা দিতে পারি না।

এভাবে হযরত মুআয রা. সিরিয়া চলে গেলেন। তিনি এখনে বিভিন্ন যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি দীনের প্রচার ও শিক্ষাদানের কাজে অব্যাহত রাখেন। এভাবে তিনি হযরত আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ রা.-এর ডান হাতের ভূমিকা পালন করে যান।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা.-এর সঙ্গে হযরত ওমর রা. -এর গভীর সম্পর্কে ছিলো। তিনি বলতেন, عجزت النساء أن تلدن مثل معاذ (ম'আযের মত ব্যক্তিত্ব জন্ম দিতে নারীরা অক্ষম হয়ে গেছে।)একবার হযরত ওমর রা. তাঁর এক গোলামকে চারশ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন, তুমি এগুলো আবূ উবায়দার কাছে নিয়ে যাও। এগুলো তাঁর হাতে দিয়ে কিছুক্ষণ তাঁর ঘরে অবস্থান করে দেখবে যে, তিনি সেগুলো কী করেন? স্বর্ণ মুদ্রাগুলো নিয়ে গোলাম হযরত আবূ উবায়দার ঘরে হাজির হলো। হযরত আবূ উবায়দা রা. স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে হযরত ওমর রা.-কে অনেক দু'আ করলেন, "আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।" তার উপর রহম করুন।" এরপর তিনি তার গৃহকর্মীকে ডেকে বললেন, এই সাত মুদ্রা নিয়ে অমুকের কাছে চলে যাও। ওই পাঁচ মুদ্রা নিয়ে অমুকের কাছে যাও; এভাবে তিনি সবগুলো

মুদ্রা তখনই বন্টন করে দিলেন। গোলাম হযরত ওমর রা. -এর কাছে ফিরে এলো। তখন হযরত ওমর রা. পুনরায় সে পরিমাণ মুদ্রা গোলামের হাতে দিয়ে বললেন, এখন এগুলো নিয়ে মুআয ইবনে জাবালের কাছে যাও। এগুলো তার হাতে দিয়ে দেখবে তিনি কী করেন? গোলাম স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা.-এর বাড়িতে এলো। সেগুলো হাতে নিয়ে তিনিও বিভিন্ন লোকের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন। যখন সবগুলো মুদ্রা ফুরিয়ে এলো, তখন ঘরের ভেতর থেকে স্ত্রী বলে উঠলেন, 'আমরাও তো নিঃস্ব। কিছু আমাদের কেও দিন।"

তখন থলের মাঝে মাত্র দু'টি মুদ্রা অবশিষ্ট ছিলো। হযরত মুআয রা. সেই দু'টি মুদ্রা স্ত্রীকে দিয়ে দিলেন। গোলাম ফিরে এসে হযরত ওমর রা.-কে গোটা বৃত্তান্ত জানিয়ে দিলো। হযরত ওমর রা. খুশি হয়ে বললেন, এরা দু'জন ভ্রাতৃপ্রতীম। একজন অপর জনের মত। -তবকাতে ইবনে সা'দ : ৩/২০১

হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. যখন মহামারীতে আক্রান্ত হন, তখন তিনি তাঁর পরে সিরিয়ায় প্রশাসক হিসেবে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা.-এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। সে সময় মহামারী প্রচণ্ড দ্রুততার সঙ্গে সবর্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন হযরত মু'আয রা. লোকদেরকে একটি হাদীস শুনান যে, আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা একদিন সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হবে। তোমাদের হাতে সেই অঞ্চল বিজিত হবে। সেখানে এমন এক রোগ দেখা দিবে, যা ফোড়া বা পাঁচড়ার মত ছড়িয়ে পড়বে। সেই ব্যাধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শাহাদাত দান করবেন এবং তোমাদের আমল পরিশ্রদ্ধ করবেন।"

এরপর হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা. দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ! যদি মু'আয বাস্তবেই নবী সা. থেকে উক্ত এরশাদ শুনে থাকে, তাহলে তাঁকে ও তাঁর পরিবারের লোকদেরকে সেই ফজিলত থেকে বড় একটি অংশ দাও। দু'আ কবুল হয়ে যায়। এক সময় তাঁর ঘরেও মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। হযরত মু'আয রা. -এর কোনো সন্তানই এই মহামারী থেকে রক্ষা পায় নি। হযরত মু'আয রা. -এর হাতের তর্জনীতে মহামারীর প্রকোপে পাঁচড়া দেখা দেয়। তা দেখে তিনি বলেন, 'যদি কেউ একটি লাল উট

দিয়ে আমার কাছ থেকে এটি নিতে চায়, তবুও আমি তা গ্রহণ করবো না। [মুসনাদে আহমদ]

হযরত মু'আয রা.-কে মহামারীতে আক্রান্ত হতে দেখে জনৈক ব্যক্তি খুব কাঁদতে লাগলো। হযরত মু'আয রা. জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছো? সে উত্তর দিলো, আমি এ জন্যে কাঁদছি না যে, আপনার মাধ্যমে আমি কোনো পার্থিব উপকার পেতাম। আমার কান্নার কারণ হলো, সেই ইলম, যা আমি আপনার কাছ থেকে পেতাম। হযরত মু'আয রা. বললেন, ইলমের উপরও কেঁদো না। দেখো! হযরত ইবরাহীম আ. এমন এক ভূখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে কোনো ইলম ছিলো না। এরপরও আল্লাহ তাকে ইলম দিয়েছেন। কাজেই আমার মৃত্যুর পর চার ব্যক্তির কাছে ইলম খুঁজবে– ১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ২. সালমান ফারসি রা. ৩. আবদুল্লাহ ইবনে সালামা রা. ৪. আবূ দারদা রা.।

অনন্তর তাঁর দু'আ কবুলের প্রহর ঘনিয়ে এলো। ১৮ হিজরিতে সেই মহামারীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স ৩৩ বছরের বেশি ছিলো না।

আপন গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি

হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার আমি হুযূর সা.-এর খেদমতে বসেছিলাম। এমতাবস্থায় এক লোক সম্মুখভাগ থেকে আমার দিকে আসছিল। ঐ লোকটি রাস্তায় থাকাকালীন রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন–

بئس أخو العشيرة

"এ ব্যক্তিটি নিজ গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি"

হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি একটু নড়ে চড়ে বসলাম এই চিন্তা করে যে, এ হলো গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। তার ব্যাপারে সাবধানে থাকা উচিত। যখন ঐ ব্যক্তিটি মজলিসে এসে বসে পড়ল। তখন রাসূল সা. নিজ অভ্যাস অনুযায়ী নম্র ভাষায় তার সাথে কথা বললেন। পরবর্তীতে যখন ঐ লোকটি চলে গেল, তখন হযরত আয়েশা রা. হুযুর সা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া

রাসূলুল্লাহ! আপনি বললেন, এই ব্যক্তিটি নিকৃষ্ট। কিন্তু যখন সে আপনার কাছে এসে বসল তখন আপনি তার সাথে অতি নম্র ভাষায় কথা বললেন। এর কারণ কি? উত্তরে রাসূল সা. বললেন, দেখো! সে খুব নিকৃষ্ট ব্যক্তি। যার অনিষ্টতার ভয়ে মানুষ তার সাথে চলা ফেরা ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ স্বভাবগত ভাবেই লোকটি খারাপ। যদি তার সাথে নম্র আচরণ না করা হয় তাহলে সে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি আমার অভ্যাস অনুযায়ী তার সাথে নম্র আচরণ করেছি। [জামে তিরমিযি, অধ্যায় : আল বিরর ওয়াস সিলাহ, পরিচ্ছেদ : মাজাআ ফিল মুদারাত হাদীস : ১৯৯৬]

গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া

নবী যুগের দু'জন মহিলার ঘটনা হাদীস শরীফে এসেছে। তারা রোযা রেখেছিলো। রোযা অবস্থায় পরস্পরে গল্পগুজবে লিপ্ত হলো। এক পর্যায়ে অন্যের গীবতও শুরু করে দিলো। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি নবী করীম সা. -এর দরবারে এসে আরজ করলো। হে আল্লাহর রাসূল! দু'জন মহিলা রোযা রেখেছিলো। তাদের অবস্থা এখন নিতান্ত নাজুক। পিপাসায় তাদের কলজে ফেটে যাচ্ছে। হয়তো তারা মারাই যাবে। রাসূল সা. সম্ভবত ওহীর মাধ্যমে আগেই জেনেছেন যে, মহিলাদ্বয় এতক্ষণ গীবত করেছিলো। তিনি বললেন, তাদেরকে আমার নিকট আনো। কথামতো তাদেরকে নবীজী সা.-এর খেদমতে হাজির করা হলো। নবীজী সা. লক্ষ্য করলেন, সত্য সত্যই তারা মৃত প্রায়।

নবীজী সা. বললেন, একটি বড় পাত্র নিয়ে আসো। পাত্র আনা হলো। নবীজী সা. দু'জন মহিলা থেকে একজনকে নির্দেশ করলেন, পাত্রটিতে বমি করো। মহিলা যখন বমি করা করলো, দেখা দিলো এক অবাক কাণ্ড। বমির সাথে বক্ষ পুঁজ ও গোশতের টুকরো উগড়ে পড়ছে। তারপর দ্বিতীয় মহিলাকেও তিনি একই নির্দেশ করলেন। দেখা গেলো সেও রক্ত-পুঁজ ও দুর্গন্ধযুক্ত গোশত বমি করছে। এক পর্যায়ে পাত্র সম্পূর্ণ ভরে গেলো। নবীজী সা. মহিলাদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, এসব তোমাদের ভাই বোনের রক্ত, পুঁজ ও গোশত। রোযা অবস্থায় তোমরা এগুলো খেয়েছিলে। অর্থাৎ তাদের গীবত করেছিলে। রোযা রাখার কারণে তো তোমরা বৈধ খাবারও

পরিহার করেছিলে। অথচ হারাম খাবার তথা গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের রক্ত, পূঁজ ও গোশত ভক্ষণ তোমরা পরিহার করতে পারনি। এগুলো খেয়ে তোমাদের পেট ভরে গিয়েছিলো। ফলে তোমরা আজ এ দুরাবস্থায় শিকার হয়েছিলে। যাও, ভবিষ্যতে কখনো আর গীবত করবে না। উক্ত ঘটনা আমাদের জন্য নিশ্চয়ই শিক্ষাপ্রদ। গীবতের রূপক নমুনাও আল্লাহ মানুষকে দেখালেন। গীবতের পরিণাম কত বীভৎস! কত ভয়াবহ!

আসলে আমাদের রুচির বিকৃত ঘটেছে। অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে। পাপের ভয়াবহতা ও গুনাহের বীভৎসতা আমাদের অন্তর থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ যাদের অর্ন্তদৃষ্টি ও সঠিক অনুভূতি দান করেছেন, তাদেরকে গুনাহের পরিণতি কখনো কখনো দেখিয়েও দেন।

হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.

হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রা. নবী করীম সা. -এর মহান সাহাবায়ে কেরামের একজন, যার সম্মানিত সত্তা সমকালীন সময়ের সর্বোচ্চ সম্মান, বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে ঈমান আনয়ন কারীদের একজন। তিনি এমনই এক কঠিন মুহূর্তে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা আঙ্গুল দিয়ে গণনা করা যেত। তিনি সেই মহান দশ জনের একজন, যাদেরকে "আশারায়ে মুবাশশারাহ" বলে স্মরণ করা হয়। যাঁদেরকে স্বয়ং নবী করীম সা. জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমবার তিনি আবিসিনিয়া (বর্তমানে ইথিওপিয়া) অভিমুখে হিজরত করেন। পরবর্তী সময়ে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করে চলে আসেন।

নবী করীম সা.-এর সঙ্গে তিনি যুদ্ধগুলোতে কেবল অংশগ্রহণই করেন নি; বরং প্রতিটি প্রতিকূল মুহূর্তে জীবনবাজি রেখে রাসূলের প্রতি ভালবাসা এবং নিখাদ আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন।

বদর যুদ্ধের সময় তাঁর পিতা মক্কায় কাফেরদের সহযোদ্ধা হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিলো। যে তখন যুদ্ধ চলাকালে আপন ছেলে (হযরত আবূ উবায়দা রা.) কে শুধু খুঁজে বের করে তার মুখোমুখি হতে তৎপর ছিলো। হযরত আবূ উবায়দা রা. যদিও তাঁর পিতার কুফরির

কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু পিতার উপর তরবারি উঠাতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। এজন্য যখনই সে মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল, তিনি ফাঁক বের করে সরে পড়তেন। কিন্তু তাঁর পিতা কোনোভাবেই তাঁর পিছু ছাড়ছিলো না। অবশেষে তাকে মুখোমুখি হতেই হয়। লড়তেই যখন হলো, তখন এক আল্লাহর গভীর বন্ধনের সামনে অন্যসব প্রতিবন্ধক সম্পর্কে কাটা পড়ে যায়। পিতা-পুত্রের মাঝখানে উন্মুক্ত তরবারি চলতে শুরু করলো, অবশেষে কুফরির উপর ঈমান বিজয়ী হলো। পুত্রের হাতে পিতার নিহত হতে হলো। [আল ইসাবা : ২/২৪৪]

ওহুদ যুদ্ধের প্রক্কালে যখন কাফেরদের আকস্মিক আক্রমণে দোজাহানের সরদার নবী করীম সা. -এর শিরস্ত্রাণের দু'টি আংটা নবীজীর প্রবিত্র গণ্ডদেশের গভীরে ঢুকে যায়, তখন হযরত আবূ উবায়দা রা. নিজ দাঁত দিয়ে কামড়ে সেগুলোকে বের করেন। এই টানাটানির কারণে হযরত আবু উবায়দা রা.-এর সামনের দুটি দাত ভেঙে পড়ে যায়। দাত পড়ে যাওয়ার কারণে চেহারার সৌন্দর্য্য না কমে বরং তা বেড়ে গিয়েছিলো। লোকদের মন্তব্য হলো, সামনের পাটিতে দাঁত নেই; এমন লোকদের মধ্যে হযরত আবূ উবায়দা রা.-এর চেয়ে সুন্দর কেই কাউকে দেখে নি। -মুস্তাদরাকে হাকেম : ৩/২৬৬

ইয়ামানের আধিবাসীগণ যখন মুসলমান হন, তখন তারা তাদেরকে দীন শিখানোর জন্য কাউকে শিক্ষকরূপে প্রেরণ করার আবেদন করেন। নবী করীম সা. তখন হযরত আবূ উবায়দা রা. -এর দু'হাত ধরে বলেছিলেন,

هذا أمين هذه الأمة

ও হলো উম্মতের সবচেয়ে বিশস্ত ব্যক্তি"

তাঁর সম্পর্কে নবী করীম সা.-এর এই উক্তি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

لكل أمة أمين و أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.

"প্রতিটি উম্মতের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। এই উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলো আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

হযরত আয়েশা রা. কে একবার জিজ্ঞেস করা হয় যে, নবী করীম সা. -এর কাছে তার সাহাবীদের মধ্য হতে কোন সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলো? হযরত আয়েশা রা. উত্তরে বললেন, আবূ বকর রা.। জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কে? তিনি বললেন, উমর। জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কে? তার উত্তরে হযরত আয়েশা রা. বলেন, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ। -জামে তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস : ৩৬৫৭

হযরত হাসান বসরী রা. হতে [মুরসাল সনদে] বর্ণিত, নবী করীম সা. একবার সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন,

ما منكم من أحدٍ إلّا لو شئت أخذت بعض خلقه إلّا ابا عبيده

> "আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের প্রত্যেকের আচরণের মাঝে কোনো না কোনো আপত্তিকর বিষয় অবশ্যই খুঁজে পাবো। তবে ব্যতিক্রম হলো আবূ উবায়দা।"

নবী করীম সা. -এর তিরোধানের পর যখন সাকফায়ে বনূ সা'য়েদাহ্-এ সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ নিয়ে কথা উঠে, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. খালিফা হিসেবে দু'জনের নাম প্রস্তাব করেন। একজন হলেন ওমর রা.। অপরজন হলেন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ রা.। কিন্তু যেহেতু হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. -এর সত্তাই এমন যে, তাঁর বর্তমানে অন্য কারো উপর সবার একমত হওয়ার প্রশ্নই ছিলো না, এ কারণে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম এক বাক্যে হযরত আবূ বকর রা.-কেই খলিফা হিসেবে মেনে নেন। কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতিতে হযরত আবূ বকর রা.-এর পক্ষ থেকে হযরত আবূ উবায়দা রা.-এর নামের প্রস্তাব পেশ হওয়াটাই প্রমাণিত করে যে, তাঁর চোখে হযরত উবায়দা রা.-এর অবস্থান কতো উর্ধ্বে ছিলো!

হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. তাঁর শাসনামলে সিরিয়ার অভিযানগুলোর দায়িত্ব হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.-এর হাতে অর্পন করেছিলেন। সেমতে জর্ডান ও সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা তাঁর হাতেই বিজিত হয়। মাঝখানে ইয়ারমুক যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে ইরাক থেকে সিরিয়ায় পাঠান।

সে সময় হযরত খালেদ রা. কে সিরিয়ার পরিচালিত অভিযানগুলোর সর্বাধিনায়ক মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু হযরত ওমর রা. তাঁর শাসনামলের সূচনাতেই হযরত খালেদ রা.-কে অধিনায়কত্বের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁর হাতেই সর্বাধিকনায়কের দায়িত্ব অর্পন করেন। এরপর গোটা সিরিয়া তাঁরই নেতৃত্বে বিজিত হয়। হযরত খালেদ রা. তাঁর অধীনে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে হযরত ওমর রা. -এর পক্ষ থেকে তিনি সিরয়ার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।

সিরিয়ার এ ভূ-খণ্ডটি তার শষ্য শ্যামলিমা, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবেচনায় মরুচারী আরবদের জন্য ভূস্বর্গের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না। অপর দিকে সেখানে তখনকার সময় বিবেচনায় অত্যন্ত উন্নত সভ্যতা তথা রোমান সভ্যতার যুগ চলছিল। কিন্তু মহান সেই সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম সা. -এর সংস্পর্শের বদৌলতে নিজেদের মন-মানসিকতায় যে অমোচনীয় বর্ণ রাঙিয়ে নিয়েছিলেন, তা এতটাই পোক্ত ছিল যে, সিরিয়ার এই ভূবন-মোহনী রূপ সৌন্দর্য তাদের দুনিয়া বিমুখতা ও অল্পে তুষ্টি, আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকা এবং সার্বক্ষণিক পরকালমুখী চিন্তা ভাবনার উপর বিন্দু মাত্র প্রভাব ফেলতে পারে নি। হযরত আবূ উবায়দা রা.-এর একটি ঘটনা এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

হযরত আবু উবায়দা রা. তখন সিরিয়ার গভর্নর। সে যুগে একবার হযরত ওমর রা. সিরিয়ার সফরে এলেন। একদিন হযরত ওমর রা. তাঁকে বললেন, আমাকে তুমি তোমার ঘরে নিয়ে চলো।'

হযরত আবূ উবায়দা উত্তরে বললেন, আপনি আমার ঘরে গিয়ে কী করবেন? সেখানে আপনি সম্ভবত আমার অবস্থানের উপর চোখ কচলানো ছাড়া-আর কিছুই পাবেন না?

কিন্তু হযরত ওমর রা. যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। অগত্যা তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে গেলেন। হযরত উমর রা. ঘরে ঢুকে কোনো জিনিস পত্রই দেখতে পেলেন না। আক্ষরিক অর্থেই শুন্য ঘর। হযরত ওমর রা. হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার আসবাবপত্র কোথায়? এখানে তো কেবল এমনি জিন, একটি পেয়ালা ও একটি একটি মশক দেখতে পাচ্ছি। আপনি সিরিয়ার গভর্নর, আপনার কাছে কোনো খাবারও কি নেই?

এ কথা শুনে হযরত আবু উবায়দা রা. দেয়ালের তাকের দিকে গেলেন। সেখান থেকে রুটির কিয়দাংশ উঠিয়ে নিলেন। হযরত ওমর রা. তা দেখে কেঁদে ফেললেন। হযরত আবূ উবায়দা রা. বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! আমি আমি তো আপনাকে পূর্বেই জানিয়ে ছিলাম যে, আপনি আমার অবস্থা দেখলে চোখ কচলাবেন। আসল কথা হলো, একজন মানুষের জন্য এই কয়েকটি আসবাবই যথেষ্ট, যা তাকে তার চির শয্যার কবরে পৌঁছে দেবে।'

হযরত ওমর রা. তখন বললেন, আবূ উবায়দা! যার নাম শুনলে রোম - সম্রাটের মত বিশাল শক্তিও ভয়ে কেঁপে উঠতো, যার নেতৃত্ব রোমের বিশাল কেল্লা বিজিত হয়েছিল; যার পদতলে প্রতিদিন রোমীয় ধন-দৌলতের স্তুপ জমে যেত, সেই আবূ উবায়দা শুকনো রুটির ছেড়া অংশ খেয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর ভেতরের সঠিক চিত্র উপলব্ধি করে তাঁকে যদি কেউ এতটা লাঞ্ছিত ও উপক্ষো করে থাকে, তাহলে বলতে হবে, দোজাহানের সরদার সা.-এর এই নিবেদিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরামই করেছেন।

হযরত আবূ উবায়দা রা. ছিলেন সেই মহান সৌভাগ্যের অধিকারীদের একজন, যাঁরা শাশ্বত সত্যবাদী নবী সা. -এর পবিত্র কণ্ঠ থেকে নিজেদের জান্নাতী হওয়ার অগ্রীম সুসংবাদ পেয়েছিলেন। নবী করীম সা.-এর কোনো সংবাদের উপর তাদের কারো সামান্যতম সংশয়েরও প্রশ্ন উঠে না। এতদসত্ত্বেও হযরত আবূ উবায়দা রা.-এর মনে খোদাভীতির এতটাই উদ্বেলিত চেতনা ছিল যে, প্রায়শই তিনি বলতেন,

وددتُ إنى كنت كبشًا فيذبحنى أهلى، فيأكلون لحمى ويحسون موتى

'হায় আমি যদি এক ভেড়া হতাম, আমার গৃহবাসীরা আমাকে যবাই করে আমার গোশত খেয়ে ফেলত আর আমার ঝোল পান করে ফেলতো!"

হযরত ওমর রা. তাঁকে এতটাই সম্মান ও মূল্যায়ন করতেন যে, একবার যখন তাঁর পরে খলিফা কে হবে, এ প্রশ্ন ওঠে, তখন তিনি বলেন, যদি আবূ উবায়দা বেঁচে থাকা অবস্থায় আমি মারা যাই, তাহলে কারো সঙ্গে

পরামর্শ করারও প্রয়োজন নেই। আমি তাঁকে আমার পর খলিফা মনোনীত করার নির্দেশ দেবো। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার এই প্রস্তাবনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আমি নিবেদন করবো যে, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি যে, 'প্রতিটি উম্মতেরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকেন, আর এই উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হলেন আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ'।

যখন জর্ডান ও সিরিয়ায় সেই ঐতিহাসিক মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, যার কড়ালগ্রাস হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়, তখন হযতর ওমর রা. হযরত আবূ উবায়দা রা.-কে একটি চিঠি লিখেছিলেন যে,

سلام عليك أما بعد: فإنّه قد عُرضت لى حاجة، أريد أن أشافهك بها، فعزمتُ عليك إذا نظرت فى كتابى هذا أن لا تضعه من يدك حتى تقبل الي.

"সালাম! আমার একটি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যার কারণে আপনার সাথে মৌখিক কথা বলতে চাই। কাজেই আমি পূর্ণ তাগাদার সঙ্গে আপনাকে বলছি, যখনই আপনি আমার এই পত্র দেখবেন, তা আপনার হাতে নিয়েই তৎক্ষণাৎ আমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবেন।"

হযরত আবূ উবায়দা রা. গোটা জীবনে আমীরের শতভাগ অনুগত্য প্রদর্শন করে এসেছেন। কিন্তু এ পত্র হাতে পেয়েই বুঝে ফেললেন যে, আমাকে হযরত ওমর রা. যে তীব্র প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মদিনা মুনাওরায় ডেকেছেন, সেটি হলো, তিনি আমাকে এই মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে বের করে নিতে চান। পত্রটি পড়েই তিনি তাঁর সাথীদের বলেন,

عرفت حاجة أمير المؤمنين! إنه يريد أن يستبقى من ليس بباقٍ

"আমি আমীরুল মু'মিনীনের প্রয়োজন বুঝে ফেলেছি। তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, যে আর বেঁচে থাকবার নয়।"

একথা বলে তিনি হযরত ওমর রা.-কে জবাবে চিঠি লেখেন,

يا أمير المؤمنين! إنى قد عرفت حاجتك إليّ، وإنى فى جند من المسلمين، لا أجد بنفسى رغبةً عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله فى وفيهم أمره وقضائه، فخلنى من عزيمتك يا أمير المؤمنين ودعنى فى جندى.

"হে অমিরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে যে প্রয়োজনে ডেকেছেন, তা আমি জানি। কিন্তু আমি মুসলমানদের এমনই এক বাহিনীর মাঝখানে বসে আছি, আমার মনে যাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো আগ্রহই পাচ্ছি না। কাজেই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে আসতে পারছি না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আমার ও তাদের ব্যাপারে তাঁর তাকদীরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। কাজেই হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে আপনার তাগাদাপূর্ণ নির্দেশ থেকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে আমার বাহিনীর মাঝেই থাকতে দিন।"

হযরত ওমর রা. পত্রটি পড়ার পর চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারলেন না। দু'চোখ বেয়ে অবারিত লোনাজল ঝরতে লাগল। যারা তাঁর কাছে বসা ছিলেন, তারা জানতেন যে, পত্রটি সিরিয়া থেকে এসেছে। হযরত ওমর রা.-কে কাঁদতে দেখে তারা জিজ্ঞেস করলেন, আবূ উবায়দা রা. কি ইন্তিকাল করেছেন? ওমর রা. তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, এখনো তো হয় নি, তবে মনে হচ্ছে, হয়ত হয়ে যাবে।

এরপর হযরত ওমর রা. দ্বিতীয় চিঠি লিখেন,

سلام عليك أما بعد! فإنك أنزلتَ الناس أرضًا عميقةً فارفعهم إلى ارضٍ مرتفعة نزهةٍ

"সালাম! আপনি লোকদেরকে ভাটি অঞ্চলে রেখেছেন। এখন তাদেরকে নিয়ে এমন কোনো উঁচু উজানে নিয়ে যান, যেখানকার বাতাস স্বচ্ছ।"

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রা. বলেন, এ পত্রটি যখন হযরত আবূ উবায়দার কাছে পৌছে, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আমীরুল মুমিনীনের এই পত্রটি এসেছে। এখন আপনি এমন একটি স্থান খুঁজে বের

করুন, যেখানে সৈন্যদেরকে নিয়ে অবস্থান করা যাবে। আমি স্থানের সন্ধানে বের হওয়ার জন্য ঘরে পৌছাতেই দেখি যে, আমার স্ত্রী মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছেন। আমি ফিরে এসে হযরত আবূ উবায়দা র.-কে ব্যাপারটি জানালাম। তখন তিনি নিজেই সেই স্থানের সন্ধানে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং উটের উপর জিন ফেলেন। সবেমাত্র তিনি পাদানিতে পা রাখেন, সেই মুহূর্তে তাঁকে মহামারী আক্রান্ত করে। এরপর সেই মহামারীতে আক্রান্ত হয়েই তিনি ইন্তেকাল করেন। মহান আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট বানিয়ে দেন।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা.

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ হলেন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা.-এর চাচাত বোন। তিনি অনেক উঁচু মানের বক্তা ছিলেন। এ কারণে তিনি "খতীবাতুন নিসা" (নারীদের বক্তা) উপাধিতে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন। তিনি নবী করীম সা. থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর রা.-এর যুগে রোমানদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইয়ারমুক প্রান্তরে সে ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘঠিত হয়, সেই যুদ্ধে তিনিও অন্যান্য মুসলিম নারীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধাহত আত্মীয়দের ক্ষত স্থানে পট্টি বেঁধে দেওয়াসহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমের জন্য এই নারীদেরকে রণাঙ্গনে নিয়ে যওয়া হতো। উভয় পাশের মাঝে তুমুল সংঘর্ষের প্রাক্কালে তারা মুসলিম যোদ্ধাদের উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাতেন। কিন্তু ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের মাঝে এমন তীব্র সংঘর্ষ বেধে যায়, নারীদেরকেও আত্মরক্ষার জন্য হাতে তরবারী নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে হয়। সে দিন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা. তাঁর তাঁবুর খুঁটি নিয়ে নয় জন রোমান সৈন্যকে মৃত্যুর ওপারে পৌছে দেন। মহিয়ষী এ নারীর উপর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করেছেন। [ইসাবা : ৪/২২৯]

হযরত আসমা বিনতে উমাইস রা.

হযরত আসমা বিনতে উমাইস রা. একজন প্রখ্যাত সাহাবী। তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমূনা রা. -এর বৈপিত্রেয় বোন। তিনিও সর্বাগ্রে

ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। হযরত জা'ফর তাইয়ার রা.-এর সহধর্মিনী ছিলেন। হযরত জা'ফর তাইয়ার রা. যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সপ্তম হিজরিতে আবিসিনিয়া থেকে ফিরে স্বামীর সঙ্গে মদিনা মুনাওয়ারায় চলে আসেন। হযরত জা'ফর রা. মুতার যুদ্ধে শহীদ হন। তখন নবী করীম সা. তাঁকে হযরত আবূ বকর রা.-এর সাথে বিয়ে দেন। বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে যখন নবী করীম সা. -এর সঙ্গে হজ আদায়ের জন্য তিনি মদিনা মুনাওয়ারার থেকে রওয়ানা হন, তখন যুল হুলাইফা নামক স্থানে তাঁর এক সন্তান ভূমিষ্ট হয়। সেই সন্তান হলেন হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর। তা সত্ত্বেও তিনি এহরাম বেঁধে হজের সফর অব্যাহত রাখেন। হযরত ফাতেমা রা. -এর মৃত্যুর সময় শয্যাকালীন সময়ে হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. -এর পক্ষ থেকে তিনিই সেবা শুশ্রূষা করে যান। হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.-এর ইন্তেকালের পর তিনি হযরত আলী রা.-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই ঘরে তাঁর দু'টি সন্তান হয়।

এক দিনের ঘটনা, তার দু'টি সন্তান মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর এবং মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর নিজেদের মাঝে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর বলে, আমার পিতা আবূ বকর রা. সর্বশ্রেষ্ঠ। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর বলে, আমার পিতা জা'ফর রা. সর্বশ্রেষ্ঠ। তখন হযরত আলী রা. হযরত আসমান বিনতে উমাইস রা. কে বললেন, তুমিই এর সিদ্ধান্ত দাও!

হযরত আসমা রা. বলেন, আমি জা'ফরের চেয়ে উত্তম কোনো আরব যুবক দেখি নি। আর আবূ বকরের চেয়ে উত্তম কোনো বৃদ্ধ পাই নি।

হযতর আলী রা. বললেন, তুমি দেখি আমাদের জন্য কোনো কিছুই রাখো নি? কিন্তু তুমি যে উত্তর দিয়েছো, যদি এর বাইরে অন্য কোনো উত্তর দিতে, তাহলে আমি অসন্তুষ্ট হতাম।

তখন আসমা রা. বলেন, এই তিন ব্যক্তি, যাদের মধ্যে আপনি সবচেয়ে পিছিয়ে। সবাই খুব সজ্জন। [তবাকাতে ইবনে সা'দ : ৮/২৮৫, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২/২৮৭]

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রা.

হযরত উম্মে হাবীবা রা. -এর আসল নাম ছিলো 'রমলা'। তিনি নবী করীম সা.-এর পূণ্যবতী স্ত্রীদের অন্যতম। নবীজীর সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন হযরত আবূ সুফিয়ান রা.-এর কন্যা। হযরত আবূ সুফিয়ান রা. মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি ছিলেন নবী সা. -এর শত্রু।

বদর যুদ্ধে আবূ জাহল সহ অন্যান্য নেতার নিহত হওয়ার পর মক্কার নেতৃত্ব তাঁর হাতেই চলে যায়। এ কারণে ওহুদ, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধে তিনিই ছিলেন নবী করীম সা.-এর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ।

সেই আবূ সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন হযরত উম্মে হাবীবা রা.। আবূ সুফিয়ান তাকে ওবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সঙ্গে বিয়ে দেন। আবূ সুফিয়ানের ঘরে দিন-রাত মুসলমানদের প্রতিহত করা নিয়ে আলোচনা করা হতো। কিন্তু সত্যধর্ম ইসলামের প্রতি তাঁর এতটাই আকর্ষণ ছিলো যে, এমন শত্রুতাভাবাপন্ন ঘরের মেয়ে ও জামাতা দু'জনই মুসলমান হয়ে যায়। সে দুঃসময়ে ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ হলো, নিজের উপর সকল প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়নকে নিয়ন্ত্রণ করা। সে সময় যে ঘরে মুসলমানদের নিধনের বিভিন্ন পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়- সে ঘরের কোনো সদস্যের ইসলাম গ্রহণ করা তো আরো বেশি মারাত্মক অপরাধ।

যার কারণে নিরুপায় হয়ে হযরত উম্মে হাবীবা রা. ও তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ উভয়ে মক্কা ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সময় অনেক মুসলমান হিজরত করে আবেসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। এই মুসলমান দম্পতিও আবিসিনিয়ায় চলে গেলেন। এখানে বসবাসকালীন সময়েই তাদের ঘর আলোকিত করে কন্যা হাবীবা জন্মগ্রহণ করে। এই কন্যার দিকে যুক্ত করে তাকে 'উম্মে হাবীবা' বলা হয়।

এক রাতে হযরত উম্মে হাবীবা রা. ঘুমিয়ে ছিলেন। স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। তিনি ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর আশংকা হলো, হয়তো ওবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশের জীবনে কোনো বিকার এসেছে। স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। স্বামী বলছে, আমি

সবগুলো ধর্ম ভেবে দেখেছি। পরিণতিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, খ্রিষ্টধর্মের চেয়ে ভালো কোনো ধর্ম নেই। কাজেই আমি খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছি।

একটু কল্পনা করে দেখুন! এই কথাগুলো শুনে হযরত উম্মে হাবীবা রা. কিরূপে প্রতারিত হতে পারতেন! কিন্তু তিনি প্রতারিত হন নি। তৎক্ষণাৎ ওবায়দুল্লাহকে রাতে দেখা স্বপ্ন শুনিয়ে ধমত্যাগ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হতভাগার কপালে হেদায়েত ছিলো না। সে স্বপ্নের কথা উড়িয়ে দিলো। মদের নেশায় মত্ত হয়ে গেলো। যার পরিণতিতে এক সময় চরম দুর্ভাগ্য নিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হলো।

এ সময় হযরত উম্মে হাবীবা রা. কী পরিমাণ অসহায়ত্ব ও চরম দুঃসময়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইসলাম গ্রহণের কারণে ইতোপূর্বে পিতা, মাতা, ভাই, বোন –গোটা পরিবার হারাতে হয়েছিল। মাতৃভূমিকে বিদায় জানাতে হয়েছিল। সর্বহারা এই নারীর দূর প্রবাস জীবনে সহমর্মী ও চেনামুখ বলতে ওই স্বামী। কিন্তু সেও আজ ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। কায়েকদিনের মধ্যে মারাও গেছে। এখন অসহায়ত্বের এই অকূল সাগরে একাকী ভেসে বেড়াচ্ছেন।

এভাবে তিনি অসহায় জীবন কাটাচ্ছিলেন। এক রাতে শুয়েছিলেন। স্বপ্নে দেখতে পেলেন, কেউ তাকে 'উম্মুল মুমিনীন' বলে ডাকছে। তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বুঝে ফেললেন, শীঘ্রই তিনি নবী পত্নি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন।

স্বপ্ন দেখার ক'দিন পরেই একদিন তাঁর কুঁড়েঘরের ফটকে কোনো আগন্তুক এসে কড়া নাড়লো। ফটক খুলতেই দেখতে পেলেন, আবিসিনিয়ায় বাদশাহ নাজাশীর এক বাঁদি (নাম তার আবরাহা) বাদশাহর বার্তা নিয়ে এসেছে। বাঁদি বললো, 'আমাকে বাদশাহ পাঠিয়েছেন; তিনি আমাকে বলেছেন যে, তাঁর কাছে রাসূল সা.-এর একটি চিঠি এসেছে। সেই পত্রে রাসূল সা. তাঁকে একটি দায়িত্ব দিয়েছেন। দায়িত্বটি হলো, রাসূলের সঙ্গে আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য আপনি কাউকে আপনার উকিল বানিয়ে দিন। যাতে করে সে আপনার বিয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে।

এ সংবাদ শুনে হযরত উম্মে হাবীবা রা. খুবই খুশি হলেন। খুশির অতিশয্যে তিনি দেহে যত অলংকার পরে ছিলেন, সবগুলো খুলে বাঁদির হাতে দিলেন। হযরত খালেদ ইবনে সায়ীদ ইবনে আস রা. -এর কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তাঁকে তাঁর উকিল নিযুক্ত করলেন। বাদশাহ নাজাশী নবীজীর চাচাতো ভাই হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালেবসহ অন্যান্য মুসলমানদেরকে একত্রিত করলেন। সবাই উপস্থিত হওয়ার পর তিনি খুতবা পাঠ করলেন। এরপর নবী সা.-এর পক্ষ থেকে উম্মে হাবীবা রা. -এর দেনমোহর চারশ স্বর্ণমুদ্রা নির্ধারণ করে তৎক্ষণাৎ হযরত খালেদ ইবনে সায়ীদ রা.-এর হাতে অর্পণ করে দিলেন। হযরত খালেদ রা. উকিল হিসবে বিয়ের প্রস্তাবে কবুল জানালেন। বিয়ের কার্যকম সম্পন্ন হওয়ার পর সবাই যখন চলে যেতে উদ্যত হলেন, তখন নাজাশী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। নবীগণের সুন্নাত হলো, তারা বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর অলিমা করতেন। অলিমায় খাবার পরিবেশন করা হলো। খাবার গ্রহণ শেষে সবাই বিদায় নিলেন।

হযরত উম্মে হাবীবা রা. বলেন, আমাকে মোহর হিসেবে যে চারশ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয়, আমি সেখান থেকে একশ স্বর্ণমুদ্রা আবরাহা বাঁদিকে অতিরিক্ত পুরস্কাররূপে দেওয়ার মনস্থ করলাম। কিন্তু সেই বাঁদি আমাকে বলল, বাদশাহ আমাকে আপনার কাছ থেকে কোনো কিছু নিতে বারণ করেছেন। আপনি আমাকে যে অলংকার দিয়েছেন, সেগুলোও আপনাকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর পরিবর্তে তিনি আমাকে নিজের পক্ষ থেকে অনেক পুরস্কার দিয়েছেন।

বাদশাহ নাজাশী এরপর হযরত উম্মে হাবীবা রা. -এর কাছে অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সেগুলোর মাঝে রাজকীয় সুগন্ধিও ছিলো। এরপর তিনি সসম্মানে মদিনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার বন্দোবস্তও করে দিলেন। যখন হযরত উম্মে হাবীবা রা. নবী কারীম সা.-এর কাছে মদিনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন বাঁদি আবরাহা এসে জানালো, 'আমিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমার পক্ষ থেকে নবীজীর কাছে সালাম পৌঁছে দিবেন।' হযরত উম্মে হাবীবা রা. সালাম পৌঁছানোর ওয়াদা করে বিদায় নিলেন। মদিনা মুনাওয়ারা পৌঁছে তিনি ওয়াদা অনুযায়ী

নবীজীর কাছে আবরাহার সালাম নিবেদন করেন। নবীজী পূর্ণ ঘটনা শুনে মুচকি হাসলেন এবং আবরাহার জন্য দু'আ করলেন।

এই ঘটনার পর হযরত উম্মে হাবীবা রা. নবী করীম সা.-এর সহধর্মিনী হন। অপর দিকে তাঁর জনক আবূ সুফিয়ান পূর্বের মত মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে তার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলো। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যুদ্ধ বন্ধের যে অঙ্গীকার হয়েছিল, খোদ মক্কার কাফেররা তার বিরুদ্ধাচরণ করে ভেঙ্গে ফেলে। সন্ধিচুক্তির মৃত্যু ঘটে। আবূ সুফিয়ান তখন বুঝতে পারেন যে, এখন নবী সা. যে কোনো মুহূর্তে মক্কার উপর আক্রমণ করতে পারেন। এ জন্য সে যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ সাম্প্রসারিত করার নিয়তে নবী করীম সা.-এর খেদমতে মদিনায় উপস্থিত হন। নবী সা. তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

এ সময় তিনি ভাবলেন, আমার মেয়ে (হযরত উম্মে হাবীবা)-র কাছে গিয়ে তাঁর মাধ্যমে সুপারিশ করানো যেতে পারে। পৃথিবীর সাধারণ রীতি অনুযায়ী তাঁর এই আশা অবাস্তব ছিলো না যে, মেয়ে অবশ্যই তাঁর স্বামী সা.-এর কাছে সুপারিশ করবে। সে মতে হযরত আবূ সুফিয়ান হযরত উম্মে হাবীবা রা. -এর ঘরে গেলেন। প্রাথমিক সাক্ষাতের পর যখন তিনি বিছানায় বসতে গেলেন, তখন হযরত উম্মে হাবীবা দ্রুত এগিয়ে এসে বিছানা গুটিয়ে নিলেন। আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বিছানা আমর যোগ্য নয়, না আমি এই বিছানার যোগ্য নই?'

হযরত উম্মে হাবীবা রা. উত্তর দিলেন, এটি আল্লাহর রাসূল সা.-এর বিছানা। আর আপনি এখনো কুফরি ও শিরকির অপ্রবিত্রতায় বিজড়িত।

আবূ সুফিয়ান নিজের মেয়ের মুখ থেকে এ কথা শুনে হতচকিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর তোমার মাঝে কতো পরিবর্তন এসে গেছে'।

এই ছিলেন হযরত উম্মে হাবীবা রা.। নবী সা.-এর তিরোধানের পর তিনি আরো ত্রিশ-চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া রা. ছিলেন তাঁর সহোদর। এ কারণে তিনি "خال المؤمنين" (মুমিনদের মামা) উপাধি পেয়ে যান। যখন তিনি খালিফা হন, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্য

হযরত উম্মে হাবীবা রা. দামেস্কে যান। হযরত মু'আবিয়া রা. তাঁর কাছ থেকে ফেকাহ বিষয়ক অনেকগুলো মাসআলা জেনে নেন। বেশ কিছু হাদীস অর্জন করেন। এতটুকু তথ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলিতে প্রমাণিত। কিন্তু এরপর কারো অভিমত হলো, হযরত উম্মে হাবীবা রা. দামেস্কেই বসবাস করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে এখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। আল-বাবুস সগীর-এর এই কবরস্থা তাঁকে সমাধীস্থ করা হয়। হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. আল-বাবুস সগীর-এর সমাহিতদের তালিকায় তাঁর নামও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাফেজ যাহাবী রা. তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর কবর দামেস্কে নয়, মদিনা মুনাওয়ারায়। মহান আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবিহিত।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. শৈশবেই পিতৃহারা হয়ে পড়েন। তখন তাঁর পিতার জনৈক ব্যবসায়ী বন্ধু তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা এই আশ্রয়হীন শিশুকে তাঁর প্রিয় বন্ধু সা.-এর সুন্নাতের হেফাজত ও তাঁর প্রচার-প্রসারের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তিনি যখন নিজেকে জ্ঞান চর্চায় ব্যাপৃত করেন, তখন খোদা প্রদত্ত মেধা ও তুখোড় ধী-শক্তি এবং অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তির বদৌলতে তিনি তাঁর সকল সাথিকে পেছনে ফেলে যোজন যোজন এগিয়ে গিয়েছিলেন। হাদিসশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ উস্তাদ ছিলেন হাফেজ যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ.। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আমার শিষ্যদের মধ্যে হাদীস শাস্ত্রে ইবনে হাজারের চেয়ে বড়ো কোনো আলেম নেই।'

যখন হাফেজ ইবনে হাজার রা. মক্কা মুকাররামায় উপস্থিত হন, তখন তিনি যমযমের পানি পান করার সময় এ দু'আ করেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে হাফেজ যাহাবী র.-এর মত মেধাশক্তি দাও।' মহান আল্লাহ তাঁর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। বিশ বছর পর তিনি আবার যখন উপস্থিত হন, তখন এ দু'আ করেন, "আমাকে তাঁর চেয়েও বেশি মেধা দাও।" পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো, মহান আল্লাহ তাঁকে হাফেজ যাহাবী রহ.-এর উপরেও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন।

আমলী যিন্দেগীতে তিনি সুন্নতের অনুসরণের উপর এতে বেশি গুরুত্ব দিতেন যে, লোকেরা পানাহার চলাফেরায় তাঁর ভঙ্গি দেখে দেখে সুন্নাত শিখতো। একবার তিনি সন্দেহ যুক্ত খাবার খেয়ে ফেলেছিলেন। এরপর যখন তিনি জেনে যান, সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি পাত্র নিয়ে আসতে বলেন। তখন তিনি বলেন, আজ আমি সে কাজেই করবো; যা সিদ্দীকে আকবার রা. করেছিলেন। এ কথা বলে তিনি সমস্ত খাবার বমি করে ফেলে দেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সময়ানুবর্তী ছিলেন। তাঁর প্রতিটি কাজের জন্য সময় নির্ধারিত ছিলো। প্রতিটি মুহূর্ত মেপে মেপে ব্যয় করতেন। এমন কি লেখার সময় যদি কলমের পরিচর্যার প্রয়োজন পড়তো, তখন সেই স্বল্প সময়ও বৃথা নষ্ট করতেন না। এই বিরতির ভেতরেও আল্লাহর যিকিরে মগ্ন হয়ে যেতেন। সময়ের মূল্যায়নের চেতনার বরকতে মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে এতো বেশি কাজ নিয়েছেন যে, আজ যদি কেউ তার সমস্ত রচনার শুধু অনুলিপি তৈরি করতে চায়, সমস্ত জীবন দিয়ে ফেললেও অনুলিপি তৈরির কাজ শেষ হবে না। তাঁর রচনাবলিও সাধারণ কোনো রচনা নয়। সেগুলো এতটাই দালিলিক ও বিশ্লেষণধর্মী যে, তার কলম থেকে যাই বের হয়েছে, সেটিই সনদ হয়ে গেছে। এমনকি কোনো হাদীস বলার পর হাফেজ ইবনে হাজার রহ. যদি কোনো মন্তব্য না করে শুধু চুপ থাকেন (ফাতহুল বারী, তালখীস ইত্যাদি গ্রন্থে) তাহলে তাঁর এই মৌনতাকেই অনেক আলেম বিশুদ্ধতার মাপকাঠি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী রহ.

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী রহ. ছিলেন হিজরি নবম শতকের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদবিদ, ফেকাহ বিশ্লেষক ও মহান বুযুর্গ। তাঁকে তাঁর সময়ের মুজাদ্দিদ মনে করা হতো। তিনি হাফেজ ইবনে হাজার ও ইবনে ইমাম রা.-এর শিষ্য ছিলেন। অপরদিকে আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী রা. ও শায়েখ আবদুল ওয়াহহাব শারানী রহ.-এর মত ব্যক্তিত্বদের উস্তাদ ছিলেন। যে সব ক্ষণজন্মা ব্যক্তিদের নিয়ে মিসরবাসী গৌরব বোধ করে, তিনি ছিলেন তাদের একজন।

তিনি মিশরে চরম দারিদ্রের মধ্য দিয়ে ইলম অর্জন করেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি যখন আল-আযহারে পড়াশোনা করতাম, তখন অনেক সময় প্রচণ্ড অভাবের কারণে এমন অবস্থাও হয়ে যেত যে, এক মুঠো খাবার পর্যন্ত পেতাম না। তখন আমি অযুখানার কাছে পড়ে থাকা তরমুজের বাকলগুলো তুলে নিতাম। সেগুলোকে ভালভাবে ধুয়ে নিতাম। সেগুলো খেয়ে আমার পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতাম। এরপর আল্লাহর এক অলির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যিনি স্থানীয় একটি আঁটা পেষার কাজ করতেন। তিনি আমার দেশাশোনার দায়িত্বভার তুলে নেন। তিনি আমার পানহারের ব্যবস্থা করেন। সে সময় তিনি আমাকে একদিন এ সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তুমি- আল্লাহ চাহে তো অনেক দিন জীবিত থাকবে। এক সময় তুমি শায়খুল ইসলাম হবে। তোমার জীবদ্দশাতেই তোমার শিষ্যও "শায়খুল ইসলাম"-এর আসনে সমাসীন হবে। [আল কাওয়াকিবুস সায়েরা : ১/১৯৬-১৯৭]

বুযুর্গের সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিলো। মহান আল্লাহ তাঁকে পরবর্তী কালে মহান মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। দীনের খেদমতের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে শায়খুল ইসলাম রহ. অবদান রাখেন নি। এতো বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছিলেন যে, প্রতিদিন তাঁর আয় ছিলো তিন হাজার রৌপ্যমুদ্রা। সে যুগে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মাজার সংলগ্ন মাদরাসায় অধ্যাপনার দায়িত্বকে জ্ঞানী মহলের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় পদ মনে করা হতো। শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী রহ. দীর্ঘদিন সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালীন সময়ে মিশরের প্রশাসক ছিলেন মালিক আশরাফ কাতিবায়ী। তিনিও তাঁর অনেক বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শায়খুল ইসলাম রহ. প্রথম পর্যায়ে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে আসম্মতি জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু কাতিবায়ী নাছোড়বান্দা হয়ে ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকেন। এমনকি এক পর্যায়ে তিনি বলেন, তাহলে আমি আপনার সামনে পায়ে হেঁটে এসে আপনার খচ্চর হাঁকিয়ে আপনার ঘর পর্যন্ত আনা-নেওয়া করবো। তাঁর এই ক্রমাগত জোরাজুরির কারণে অবশেষে তিনি এই পদ গ্রহণ করেন। এরপর সুদীর্ঘ কাল তিনি এই দায়িত্ব পালন করে যান।

এ সময়কালে তিনি কাতিবায়ীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করতেন। ব্যক্তিগত মজলিসেও যেমন সমালোচনা করেছেন, তেমনি জনসম্মুখেও তিনি কাতিবায়ীকে তুলোধুনো করতে ছাড়তেন না। তার উপস্থিতিতে জুমার খুৎবাতেও তিনি তার সমালোচনা করেছেন। তিনি নিজেই বলেন, অনেক সময় খুৎবার মাঝে আমার সমালোচনা এতটাই ঝাঁঝালো হয়ে পড়তো যে, আমার আশংকা হতো, সম্ভবত কাতিবায়ী এখন আমার সাথে কথা বলবে না। কিন্তু নামাযের পর সর্বপ্রথম সে আমার সঙ্গে মিলিত হতো। আমার হাতে চুমু খেতো। বলতো, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

একদিন আমি তাকে বেশ কিছু কঠিন কথা বলি। ফলে তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। তখন আমি তাঁকে বলি—

والله يا مولانا! إنما افعل ذلك معك شفقةً عليك، وسوف تشكرني عن ربك، وإني والله لا احب أن يكون جسمك هذا فحمة من فحم الفار.

"হে বন্ধু! আল্লাহর শপথ! আমি আপনার সঙ্গে যা করছি তা আপনাকে ভালোবাসি বলেই করছি। আপনি যখন আপনার প্রতিপালকের কাছে উপাস্থত হবেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি আমার কৃতজ্ঞতা পালন করবেন। কারণ, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনার দেহ জাহান্নামের কয়লা হোক, এটা আমি কিছুতেই চাই না।" [তবাকাতে কুবরা, শা'রানী : ২/১১২]

কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে কোনো বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা করলে তিনি বলতেন, জলদি করো, তুমি তো এক যমানা নষ্ট করে দিচ্ছো। আল্লামা শারানী রহ. বলতেন, যখন আমি হযরতের কাছে কোনো কিতাব পড়তাম, অনেক সময় কিতাবের মাঝখানে কোনো শব্দ ঠিক করে নেওয়ার জন্য সামান্য বিরতি হতো। তিনি বিরতির এই সামান্য সময়টুকুও নষ্ট করতেন না। তখন তিনি নিচুস্বরে "আল্লাহ আল্লাহ" যিকিরে মগ্ন হয়ে যেতেন।

কবরের আযাবের দু'টি কারণ

একবার মহানবী সা. সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। তখন রাস্তার পাশে দু'টি কবর দেখতে পেলেন। কবর দু'টির কাছে পৌছে তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, إنهما ليعذبان "এ দু'টি কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে।" (আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সা.-কে আজাব দেখিয়ে দিয়েছিলেন। হাদীস শরীফে এসেছে, কবরের আযাব চলাকালে তার ভয়ংকর আওয়াজ আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদের থেকে গোপন রাখেন। কারণ, ঐ আযাব মানুষ যদি শুনতো, তাহলে কেউ জীবিত থাকতে পারতো না। কেউ কোনো কাজ করতে পারতো না। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আওয়াজ গোপন রেখেছেন। অবশ্য কোনো কোনো সময় মানুষের শিক্ষার জন্য প্রকাশ করে থাকেন।)

অতঃপর মহানবী সা. সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জানো কি, এ আযাব কেন হচ্ছে? তারপর নিজেই উত্তর দিলেন, দু'টি কারণে এদের উপর আজাব হচ্ছে– ১. একজন পেশাবের ছিটা থেকে নিজের কাপড় ও শরীরকে বাঁচাতো না। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময়ের মানুষের উট ছাগল চড়ানোর অভ্যাস ছিল। তারা উট ছাগলের পাশে থাকত। অনেক সময় ওদের পেশাবের ছিটা থেকে শরীর ও কাপড় রক্ষা করা যেতো না। তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা ও সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে আজাব হচ্ছে। কারণ, ইচ্ছা করলে এবং সতর্ক থাকলে এর থেকে বেঁচে থাকা কঠিন কিছু ছিল না। যেমন নরম স্থানে পেশাব করলে পেশাবের ছিটা থেকে সহজেই বাচা যায়।

আলহামদুলিল্লাহ! পবিত্রতার শিষ্টাচার ইসলামে সবিস্তারে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার অশুভ ডাকুটে মানুষ বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা তো মোটমুটি শিখে, কিন্তু শরয়ী পবিত্রতার কিছুই শিখে না। বাথরূম এমন ভাবে বানানো হয়, ইচ্ছা করলেও পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচা মুশকিল হয়ে যায়। অথচ রাসূল সা. বলেছেন,

استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه

"পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। কারণ কবরের অধিকাংশ আযাব পেশাবের কারণে হয়ে থাকে।" [দারাকুতনী : ১/১২৮]

পেশাবের ছিটা শরীর বা কাপড়ে লেগে গেলে কবরে আজাব হয়। সুতরাং এ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

২. হাদীস শরীফে বর্ণিত অপর ব্যক্তির আজাব হচ্ছিল, যেহেতু সে অন্যের চোগলখুরী করে বেড়াত।

বুঝা গেল, চোগলখুরীর করণে আযাব হয়। চোখলখুরী তো গীবতের চেয়েও জঘন্য। যেহেতু এর মধ্যে অপর মুসলমানের ক্ষতি করাও নিয়ত থাকে।

ইমাম গাযালী রহ. ইয়াহইয়াউল উলূম গ্রন্থে লিখেছেন, কারো গোপন কথা বা তথ্য ফাঁস করে দেওয়াও চোগলখুরীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন কারো এমন কোনো কথা আছে, অথবা এমন কোনো বিষয় আছে, ভাল কিংবা মন্দ, যার সে প্রকাশ চায় না। যেমন– একজনের ধন-সম্পদ আছে, মানুষ জেনে ফেলুক এটা সে চায় না। অথচ আপনি বলে বেড়ালেন, অমুকের এই সম্পদ আছে, তাহলে এটাও চোগলখুরি। যেটা সম্পূর্ণ হারাম। অথবা কেউ কোনো পরিবারিক পরিকল্পনা করেছে, তুমি কোনো ভাবে সেটা জেনে ফেলেছো। আর তা বলে বেড়াচ্ছো। তাহলে এটাও চোগলখুরির শামিল। [মুসনাদে আহমদ : ৫/৪৯]

গীবতের বিষ

একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. নবীজী সা.-এর নিকট বসে আলোচনা করছিলেন। কথায় কথায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া রা. -এর কথা উঠলো। সতীনদের মাঝে পারস্পরিক একটু টানাপোড়েন থাকা যেহেতু অস্বাভাবিক নয়, তাই হযরত আয়েশা রা.ও এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাই তিনি হযরত সাফিয়া রা.-এর কথা আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষভঙ্গিতে ইশারা করলেন। এর দ্বারা হযরত আয়েশা রা. ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বেঁটে। মুখে বলেন নি, কিন্তু ইশারায় বলেছেন। এরই প্রেক্ষিতে নবীজী সা. আয়েশা রা. কে সম্বোধন করে বললেন, হে আয়েশা! আজ তুমি এমন একটি অন্যায় করেছো, যার দুর্গন্ধযুক্ত বিষ কোনো সাগরে নিক্ষেপ করা হলে, গীবতের সমস্ত সাগর দুর্গন্ধে ভরে যাবে।

ভেবে দেখুন! নবীজী ইঙ্গিতমূলক গীবতের ভয়াবহতা কীভাবে তুলে ধরলেন। অতপর তিনি বলেছেন, কেউ যদি আমাকে সারা দুনিয়ার ধন সম্পদ দিয়ে দেয় এবং এর বিনিময়ে কারো প্রতি বিদ্রূপ করে তার নকল করতে বলে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ঐ ব্যক্তির বিদ্রূপ ও বদনাম ছড়ানো, তথাপি আমি ঐ কাজটি করতে প্রস্তুত নই। -তিরমিযি শরীফ; অধ্যায় : সিফাতুল কেয়ামাহ, হাদীস : ২৬২৪

হযরত জিবরাঈল আ.-এর বদ দু'আ

একবারের ঘটনা। রাসূল সা. মসজিদে নববীতে খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসলেন। মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বলে উঠলেন, আমীন। দ্বিতীয় সিড়িতে পা রাখার সময়ও বললেন, আমীন। তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন, তখনও বললেন আমীন। খুতবা শেষে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। রাসূল সা. উত্তর দিলেন, আমি যেই মাত্র মিম্বরে পা রেখেছি, তখনই জিবরাইল আ. আসলেন। তিনটি দু'আ করলেন। প্রতিটি দু'আর পর আমি আমীন বলেছি। মূলত এগুলো দু'আ ছিল না। ছিল বদ দু'আ।

একটু ভাবুন! মসজিদে নববীর মত পবিত্র স্থানে সম্ভবত জুমার দিনে, যে দিনটি হলো, দু'আ কবুলের দিন দু'আ করলেন জিবরাইল আ., আর আমীন বললেন, স্বয়ং রাসূল সা.। এতগুলো বিষয় যেখানে পাওয়া গিয়েছে, সেখানে দু'আ কবুল যে হয়েছে, এর মধ্যে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে?

তারপর রাসূল সা. বললেন, প্রথম দু'আটি ছিলো এই, ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো; অথচ খেদমত করে গুনাহ মাফ ও জান্নাত লাভে ধন্য হতে পারলনা।

দ্বিতীয় বদ দু'আ ছিল, ঐ ব্যক্তি ধবংস হোক, যে পূর্ণ একটি রমযান অতিবাহিত করল, অথচ গুনাহ মাফ করাতে পারল না। যেহেতু রমযান মাসে মহান আল্লাহ নানা বাহানায় গুনাহ মাফ করেন।

তৃতীয় বদ দু'আ হলো, ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে আমার নাম শুনেছে, অথচ আমার উপর দরূদ পাঠ করল না।

এ হলো দরূদ শরীফ পাঠ না করার পরিণতি। তাই নবীজী সা.-এর নাম আসার সঙ্গে সঙ্গে দরূদ পড়ে নিবেন। -তাখীরুল কাবীর : ৭/২২০

হযরত উকবা ইবনে নাফে' -এর বিজয়াভিযান

হযরত উকবা ইবনে নাফে' রহ. যদিও সাহাবী ছিলেন না, কিন্তু নবী করীম সা.-এর শুভজন্মের এক বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মিসর বিজয়াভিযানে হযরত আমর ইবনে আস রা.-এর সঙ্গে ছিলেন। পরবর্তীকালে হযরত মু'আবিয়া রা. তাঁর শাসনামলে তাঁকে উত্তর আফ্রিকার অবশিষ্ট অঞ্চল বিজয়ের এই গুরুভার অর্পণ করেন। তিনি ১০ হাজার জানবাযের একটি বাহিনী নিয়ে মিসর থেকে যাত্রা শুরু করেন। পথে পথে বিজয়ের উন্নত কেতন উড়িয়ে তিউনিসিয়া পৌঁছেন। এখানে কায়রোয়ান নামের একটি বিখ্যাত নগরীর গোড়াপ্তন করেন। এর ইতিহাস হলো, আজ যেখানে কায়রোয়ান নগরী অবস্থিত, এই জায়গাটি সে সময় হিংস্র জন্তুতে ভরা ঘণ জঙ্গল ছিলো।

হযরত উকবা ইবনে নাফে' রহ. আফ্রিকার স্থানীয় বরবর জাতির লোকদের এলাকায় না থেকে মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই জায়গাটি নির্বাচন করেন। উদ্দেশ্য ছিল যেন মুসলমানরা এখানে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। সাথী-সঙ্গীরা পরামর্শ দিলো, এটি তো হিংস্র জন্তু, পোকা-মাকর আর কীট-প্রতঙ্গে ভরা একটি জঙ্গল। কিন্তু হযরত উকবা রহ.-এর কাছ একটি নতুন জনপদের গোড়াপত্তনের জন্য এরচে যুৎসই আর কোনো স্থান ছিলো না। এজন্য তিনি নিজের সিদ্ধান্ত বদলালেন না। গোটা বাহিনীর মধ্যে যে কজন সাহাবী ছিলেন, তাদের একত্র করলেন। আঠারো জন সাহাবী ছিলেন। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হযরত উকবা রহ. দু'আ করলেন। এরপর তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন–

أيتها السباع والحشرات! نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ارحلوا عنا، فإنّا نازلون، فمن وجدناه بعد قتلناه.

"হে হিংস্র জন্তু ও কীট-পতঙ্গের দল! আমরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গী। আমরা এখানে অবতরণ করতে চাচ্ছি। কাজেই তোমরা

এখান থেকে চলে যাও। এই ঘোষণার পর যদি আমরা তোমাদের কাউকে পাই তাহলে হত্যা করে ফেলবো।" [তারীখে তাবারী : ৪/১৭৮]

এই ঘোষণার পর কী হলো? ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহ. লিখেন–

فلم يبق منها شيئ إلَّا خرج هاربًا، حتى ان السباع تحمل اولادها.

"তখন সেখানে যতগুলো হিংস্র প্রাণী ছিল, তার সব গুলোই পালিয়ে গেলো। এমনকি হিংস্র জন্তুগুলো নিজেদের শাবকগুলোকে মুখে তুলে চলে যাচ্ছিলো।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভূগোল শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ আল্লামা যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ কাযবীনী রহ. [ইন্তিকাল : ৬৮২ হি.] লিখেন–

فرأى الناسُ ذلك اليوم عجبًا لم يروه قبل ذلك، وكان السبع يحمل أشباله، والذئب أجراءه والحية أولادها، وفى خارجة سربًا سربًا فحمل ذلك كثيرًا من البربر علي الاسلام.

"সেদিন লোকেরা সেখানে এমন কিছু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে দেখলো, যা তারা এতোপূর্বে কখনো দেখেনি। হিংস্রজন্তুগুলো নিজেদের ছানাগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। বাঘ তার শাবককে কামড়ে ধরে পালিয়ে যাচ্ছিলো। বিষধর সাপগুলো বাচ্চাসহ চলে যাচ্ছিলো। দলে দলে পালে পালে সেগুলো বের হয়ে যাচ্ছিলো। এ দৃশ্য থেকে স্থানীয় বারবার সম্প্রদায়ের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। [আসারুল বিলাদ, কাযবীনী : ২৪২]

এরপর হযরত ইকবা ইবনে নাফে' রহ. তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে এখানে "কায়রোয়ান" নগরী স্থাপন করে। একটি জামে' মসজিদ নির্মাণ করেন। এভাবে তিনি এই স্থানটিকে উত্তর আফ্রিকায় তাঁর আবস্থানস্থল বানিয়ে নেন। হযরত মু'আবিয়া রা.-এর শাসনামলেই তাঁকে আফ্রিকার গভর্নরের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখন তিনি সিরিয়া চলে যান। অবশেষে হযরত মু'আবিয়া রা. তাঁকে দ্বিতীয়বার আফ্রিকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। পরবর্তী কালে

যখন ক্ষমতার মসনদে ইয়াযিদ অধিষ্ঠিত হয়, তখন সে তাঁকে দ্বিতীয়বারের মত আফ্রিকার গভর্নর মনোনীত করেন। হযরত উকবা রা. আফ্রিকায় আগমন করেন। এবার তিনি কায়রোয়ান থেকে পশ্চিম দিকে তাঁর সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর ছেলেদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

اني قد بعتُ نفسي من الله عز وجل، فلَا أزال أجاهد من كفر بالله.

"আমি আমার প্রাণ আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। কাজেই এখন আমি (অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত) যারা কুফরি করবে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবো।"

আরো কিছু অসিয়ত করে তিনি রওয়ানা হন। এ সময় তিনি আলজেরিয়ার বিভিন্ন এলাকা যথা– তালমিসান ইত্যাদি জয় করেন। বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে উড়িয়ে তিনি মরক্কোয় প্রবেশ করেন এবং সেখানকার অনেক এলাকায় তাওহীদের বিজয় কেতন উড্ডীন করেন। দিগ্বিজয়ী এই মহাবীর সবশেষে আফ্রিকার সর্বশেষ সামুদ্রিক তীরবর্তী এলাকা "আসফা"-এ কদম ফেলেন। এখন সামনে আটলান্টিক মহাসাগরের অথৈ জলরাশি ছাড়া আর কিছুই নেই। এ বিশাল সমুদ্রের পাড়ে এসে হযরত উকবা রা. তাঁর সে ঐতিহাসিক বাক্য বলেন–

يا رب لولَا هذا البحر لمضيت فى البلاد مجاهدًا فى سبيلك.

"হে আমার প্রতিপালক! যদি এই সমুদ্র প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়াত, তবে আমি আপনার পথে জিহাদ করে যাওয়ার এই সফর অব্যাহত রাখতাম।"

তিনি আরো বলেন–

اللهم أشهد انى قد بلغت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت فى البلاد اقاتل من كفربك، حتى لا يعبد أحد دونك.

"হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো! আমার সর্বশেষ চেষ্টাটুকুও ব্যয় করেছি। যদি এই সমুদ্র বাঁধা হয়ে না দাঁড়াতো, তাহলে যারা আপনার একত্ববাদকে অস্বীকার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমি

লড়াই করে সামনে এগিয়ে যেতাম, যতক্ষণ না মাটির উপর আপনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না হয়।"

এরপর তিনি আটলান্টিক মহাসাগরে বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ে নিজের ঘোড়ার পা নামিয়ে দিলেন। সাথিদেরকে কাছে ডাকলেন। তাদেরকে বললেন, হাত ওঠাও। সাথিরা হাত ওঠালো। তখন হযরত উকবা রা. তাঁর সেই মর্মস্পর্শী মুনাজাত করলেন,

اللهم إنى لم أخرج بطرًا، ولا أشرًا وانك تعلم إنما نظلب السبب الذى طلبه عبدك ذو القرنين، وهو أن تعبد ولا يشرك بك شيئ، اللهم إنّا مَدافعون عن دين الإسلام، فكن لنا ولا تكن علينا ياذا الجلال والإكرام.

"হে আল্লাহ! আমি কোনো অহংকার বা দম্ভে তাড়িত হয়ে বের হয় নি। তুমি তো জানো যে, আমি সেই যুদ্ধ যাত্রার পথ অবলম্বন করে চলেছি, যা তোমার বান্দা যুল কারনাইন অবলম্বন করেছিলো। আর তা হলো, এই পৃথিবীর বুকে যেন একমাত্র তোমারই ইবাদত হয়, তোমার সাথে যেন কাউকে শরীক করা না হয়। হে আল্লাহ! আমরা তোমার ইসলামের পক্ষে লড়ছি। কাজেই তুমি আমাদের পক্ষের হয়ে যাও। আমাদের বিপক্ষে যেয়ো না। হে মহা ক্ষমতাধর! হে মহা সম্মানের আধিকারী!

আটলান্টিকের তীর থেকে ফিরে হযরত উকবা রহ. কায়রোয়ান নগরীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে এমন একটি অঞ্চল সামনে পড়লো, যেখানে দূর দূরান্ত পর্যন্ত পানির নাম গন্ধ পর্যন্তও নেই। সমস্ত বাহিনী প্রচণ্ড তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে পড়লো। হযরত উকবা রা. দুই রাকাত নামায পড়ে দু'আ করলেন। দু'আ শেষ করতেই তার ঘোড়া পায়ের খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পরেই শুস্ক মাটি চিরে একটি পাথর দেখা দিলো। সেই পাথর থেকে মিষ্টি পানির ফোয়ারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কবির ভাষায়–

ہزار چشمہ ترے سنگ راہ سے پھوٹے
خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر

"তোমরা পথের পাথর চিড়ে বেরিয়ে এলো ঝরনা হাজার
নিজের মাঝে ডুব দিয়ে আজ সৃষ্টি কর চেতনা মূসার।"

এখান থেকে অগ্রসর হওয়ার পর হযরত উকবা রা. -এর মনে আশংকা দানা বাঁধলো। তিনি বুঝে ফেললেন যে, সামনের পথে হাজারো বিপদ হানা দেবে। তাই তিনি তাঁর দলের সিংহভাগ সৈন্যকে অতিদ্রুত কায়রোয়ান পৌছার জন্য আগে ভাগে পাঠিয়ে দিলেন। আর নিজে কয়েকশ অশ্বারোহী সংগে নিয়ে পথিমধ্যে 'তুহযা' নামক কেল্লায় আক্রমণ করার জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এই স্বল্প সেনাই সেই কেল্লা জয় করতে যথেষ্ট হবে। কিন্তু বাস্তবে সেই কেল্লার মাঝে অসংখ্য সেনাদল ছিলো। মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে আরেকটি বিপদ দেখা দিল। সেটি হলো, হযরত উকবা রা.-এর সেনাদলের মাঝে 'কাসিলা' নামক এক ব্যক্তি ছিলো। লোকটি মূলত 'বারবার' সম্প্রদায়ের লোক। বাহ্যিকভাবে যদিও সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো; কিন্তু বাস্তবে ছিল হযরত উকবা রা.-এর জানের দুশমন। লোকটি গোপনে শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলো। সে মুসলিম সেনাবাহিনীর ভেতরের অবস্থা শত্রুদের কাছে ফাঁস করে দিলো। যার ফলে শত্রুরা এসে চার দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেললো। এই ঘটনার সময় হযরত উকবা রহ.-এর এক সাথি কোনো কারণবশত বন্দি ছিলো। তার নাম আবুল মুহাজির। তিনি তাকে মুক্ত করে দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে এখন মুক্ত করে দিচ্ছি। তুমি অগ্রবর্তী মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হও। তাদের নেতৃত্ব দাও। কেননা আমি শাহাদাতের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো সুযোগ পাবো না।

আবুল মুহাজির বললেন, 'আমিও আমার মনে শাহাদাতের প্রবল আকাঙ্খা লালন করছি।'

অবশেষে তারা দু'জন সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। তীব্র লড়াই শেষে তারাও শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হন। [ইবনে আসীর রচিত কামিল : ৪/৪৩]

আলজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে হযরত উকবা ইবনে নাফে' রা.-এর কবর অবস্থিত। তার নামের দিকে যুক্ত হয়েই সেই এলাকাটি 'সাইয়েদ উকবা' নামে পরিচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই উপত্যকার পাড় দিয়ে আজ থেকে প্রায় সাড়ে তেরশ বছর পূর্বে হযরত উকবা ইবনে নাফে' রহ.-এর নেতৃত্বে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর কাফেলা অতিবাহিত হয়েছিল।

এই মুজাহিদগণ ঘোড়া ও উটের উপর সফর করে মিশর, লিবিয়া ও তিউনিসিয়া পাড়ি দিয়ে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁরাই মরক্কের শেষ সীমানা পর্যন্ত ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন।

আলজেরিয়ায় অবস্থানরত আমার এক বন্ধু বলেন যে, আমি একবার প্রাইভেট গাড়িতে করে কায়রো পর্যন্ত গিয়েছিলাম। প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটারের এই সফরে আমি বিভিন্ন শহরে বিলাশবহুল হোটেলে অবস্থান করে ছিলাম। কিন্তু যখন কায়রো পৌছলাম, দূর্বলতার কারণে জীবন যায় যায় অবস্থা হয়েছিল। আর এই মুজাহিদ বাহিনী ঘোড়া, উট ইত্যাদির উপর আরোহণ করে, এমনকি মাঝে মাঝে পায়দল সফর করে এই উঁচু নিচু মরুভূমি ও কাটাদার বৃক্ষে ভরা এ সকল জঙ্গল অতিক্রম করে মাঝে মাঝে শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা করে এ পর্যন্ত পৌছেছেন। উত্তর আফ্রিকার আকাশে বাতাসে সেই আল্লাহ ওয়ালা দুঃসাহসীদের অবিচলতা ও সাহসিকতার কত যে অজানা উপ্যাখ্যান লুকিয়ে আছে! আল্লাহু আকবার!

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা. -এর বিনয়

একবার হযরত ওমর রা. মসজিদে নববীতে আগমন করলেন, তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি লক্ষ্য করলেন, কারো বাড়ির একটি পরনালার পানি মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় এসে পড়ছে। তিনি বললেন, বাড়ির পরনালার পানি মসজিদে পড়া উচিত নয়। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, পরনালাটি কার? লোকেরা জানালো, এটি আব্বাস রা. -এর, যিনি হুযূর সা.-এর চাচা। তিনি বললেন, "এটা ঠিক নয়। মসজিদ কারো বক্তিগত জমি নয়, এবং মসজিদের দিকে পরনালা বের করা জায়েয নয়।" এ বলে তিনি পরনালাটি ভেঙ্গে ফেলেন। এরপর হযরত আব্বাস রা. আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আমীরুল মুমেনীন! আপনি পরনালাটি কেন ভেঙ্গেছেন? ওমর রা. উত্তর দিলেন, মসজিদে নববী ওয়াক্ফকৃত, এটি

আল্লাহর ঘর। আর এই পরনালা তোমার ব্যক্তিগত। আর এই পরনালা যেহেতু মসজিদের সীমানায় এসে পৌছেছে, তাই আমি তা ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছি। হযরত আব্বাস রা. বলেন, পরনালাটি তো আমি রাসূল সা. -এর অনুমতি নিয়েই লাগিয়েছি। এ কথা শুনে হযরত ওমর রা. বিচলিত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্বাস! বাস্তবেই রাসূল সা. কি এই পরনালা লাগানোর অনুমতি দিয়েছন? হযরত আব্বাস রা. বললেন, হ্যাঁ। হুযূর সা. অনুমতি দিয়েছিলেন। হযরত ওমর রা. বলেন, আমি তোমার হাত ধরে বলছি, আল্লাহর ওয়াস্তে এই কাজ করবে যে, আমি তোমার সামনে ঝুঁকে থাকবো আর তুমি আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে পরনালাটি পুনরায় লাগিয়ে নেবে। কারণ, রাসূল সা.-এর অনুমতি নিয়ে লাগানো পরনালা ভেঙে ফেলার অধিকার আমার নেই।

হযরত আব্বাস রা. বললেন, থাক, আমি নিজেই লাগিয়ে নেব। আপনি অনুমতি দিয়েছেন, এতটুকুই যথেষ্ট।

হযতর ওমর রা. বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পিঠে কেউ দাঁড়িয়ে পরনালাটি না লাগাবে, ততক্ষণ আমার মনে শান্তি আসবে না। অবেশেষে হযরত আব্বাস রা. বাধ্য হয়েই ওমর রা.-এর পিঠে দাঁড়িয়ে পারনালাটি আবার লাগিয়ে নেন।

হযরত ওমর রা. ও সংযমী গোস্বা

একবার হযরত ওমর রা. রাসূল সা. -এর খেদমতে থাকা শুরু করলেন, ফলে ওমর রা. -এর গোস্বা এতটাই পরিশীলিত হয়ে ওঠলো যে, পরবর্তীকালে যখন তিনি খলিফা নির্বাচিত হলেন, তখন একদিন মসজিদে নববীতে জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন, তাঁর সামনে ছিল গণমানুষের বিশাল জামাত। এই মহা সমাবেশের মধ্য হতে এক গ্রাম্যলোক উঠে দাঁড়ালো এবং জবাবদিহিদার ভঙ্গিতে বলে উঠলো, হে ওমর! যদি তুমি বাঁকা পথে চলো, তাহলে আমার তরবারি দ্বারা তোমাকে সোজা করে দেবো। এত বড় কথাটি কাকে বলা হচ্ছে? তথাটি বলা হচ্ছে তাঁকে, যিনি অর্ধ পৃথিবীর শাসক। কারণ, ওমর রা.-এর শাসনাধীন ভূখণ্ডে উপর বর্তমানে পঞ্চাশটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই গ্রাম্য লোকের কথায় হযরত ওমর রা.

একটুও রাগ করলেন না। উপরন্তু তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার শোকর আদায় করছি। কারণ, আপনি এই উম্মতের মাঝে এমন লোকও রেখেছেন, যে আমাকে সোজা করতে পারে।

সারকথা হলো, জাহেলিয়াত যুগের প্রবাদতুল্য গোস্বা রাসূল সা.-এর শিক্ষা ও সোহবতের বরকতে সম্পূর্ণ সংযমী ও পবিত্র হয়ে উঠেছিলো।

সংখ্যাধিক্য উম্মত দেখে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনন্দিত হওয়া

এক বর্ণনায় বিস্তারিত বিবরণ এসেছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর সম্মুখে পূর্ববর্তী উম্মতদের পেশ করা হলো, তখন দেখা গেলো, তারা ছোট ছোট দল। কোনো নবীর সঙ্গে দু-চারজন, কোনো নবীর সঙ্গে দশ বারজন, কোনো নবীর সঙ্গে শ'খানেক, আবার কোনো নবীর সঙ্গে হাজারের মত লোক রয়েছে। কারণ, অন্যান্য নবীর উপর ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা ছিল একেবারেই কম। তাই তাদেরকে সে হিসেবেই দেখানো হলো। এরপর যখন একজন নবীকে উম্মতসহ দেখানো হলো, তখন রাসূল সা. একট বড় দলকে দেখেতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? উত্তর দেওয়া হলো, এরা মূসা আ.-এর উম্মত। কেননা সংখ্যার দিক থেকে মূসা আ.-এর উম্মত অনেক ছিলো।

এরপর রাসূল সা.-এর সামনে একটি বিশাল দল পেশ করা হলো, যারা গোটা ময়দানময় বিস্তৃত ছিলো। এমনকি তাদের উপচানো ভিড়ে পাহাড়গুলো ভরে গেলো। রাসূল সা. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এদের পরিচয় কী? উত্তরে আমাকে বলা হলো, এরা আপনার উম্মত। তারপর আমার কাছে প্রশ্ন করা হলো, يا محمد! أرضيت؟ (মুহাম্মাদ! আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি?) অর্থাৎ আপনার উম্মতের সংখ্যা সব উম্মতের চাইতে বেশি। এই চোখ জুড়ানো দৃশ্য দেখে আপনি খুশি হয়েছেন কি? আমি উত্তর দিলাম, نعم يا ربي (হ্যাঁ! আমার প্রতিপালক! আমি খুশি হয়েছি।) আমার উম্মত আলহামদুলিল্লাহ! এতো বেশি যে, এ জন্য আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি।

এরপর রাসূল সা. সুসংবাদ শুনালেন–

أن مع هولاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب

"আমার সামনে উপস্থিত আমার উম্মতের বিশাল দলের মধ্যে সত্তর হাজার লোক এমন আছে, যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" -সহীহ বুখারী, কিতাবুত তিব

তারপর রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরামকে এই সত্তর হাজারের গুণাবলির ব্যাখ্যা দিলেন যে, এদের চারটি গুণ থাকবে–

১. প্রথম গুণটি হলো এই, هم الذين لا يسترقون অর্থাৎ এরা ঐ সকল লোক, যারা নিজেদের ঝাঁরফুক করায় না।

২. দ্বিতীয় গুণ হলো, যারা নিজেদের দাগ লাগিয়ে রোগের চিকিৎসা করে না। আরবদের রীতি ছিল, যখন অন্য চিকিৎসায় কাজ হতো না, তখন লোহা গরম করে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে দাগানো হতো।

৩. তৃতীয় গুণটি হলো, এরা কুলক্ষণ বলে কিছু মানে না।

৪. চতুর্থ গুণটি হলো, এরা এ সবের পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে। যাদের কাছে এই চারটি গুণ থাকবে, তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশকারী উক্ত সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, এরা বস্তবেই সত্তর হাজার হবে। কারো কারো মতে এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশ হিসেবে সত্তর হাজার বলা হয় নি; বরং আধিক্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে সত্তর হাজার বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের অসংখ্য লোককে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কতেক আলেমের মতে, উক্ত সত্তর হাজারের প্রতি জনের সাথে আরো সত্তর হাজার লোক এমন হবে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিসাব ছাড়াই জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদেরও এদের অন্তর্ভুক্ত করুন -আমীন।

যখন রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরামকে উক্ত সুসংবাদটি শুনালেন, তখন উক্কাশা রা. দাঁড়িয়ে বললেন,

يا رسول الله! فادع الله أن يجعلني منهم

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।"

তদনুযায়ী রাসূল সা. উক্কাশা রা. -এর জন্য দু'আ করলেন। উকাশা রা. প্রথম ধাপেই সুযোগ লুফে নিলেন। তাঁর এই সাফল্য দেখে অপর এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্যও দু'আ করুন! উত্তরে রাসূল সা. বললেন, سبقك بها عكاشة "এ ব্যাপারে উক্কাশা রা. তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে।" অর্থাৎ এ ব্যাপারে উক্কাশা প্রথম দু'আ চেয়েছে। তাই তাঁর জন্য দু'আ করা হয়েছে। এ ধারা এখানেই শেষ। এখন আল্লাহ যাকে চান, তাঁকেই এ দলের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

মাতা-পিতার খেদমত

হাদীস শরীফে এসেছে, এক সাহাবী নবী সা.-এর দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আন্তরিক ইচ্ছা হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবো। উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সওয়াব প্রাপ্তি। শুধু এই উদ্দেশ্যে আমি জিহাদে যেতে চাই। রাসূল সা. বললেন, তুমি কি সত্যিই সওয়াবের নিয়তে জিহাদে যেতে চাও? সাহাবী উত্তর দিলেন, জি! আল্লাহর রাসূল! কেবল এটাই আমার উদ্দেশ্য। রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা কি বেঁচে আছেন? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ! তারা জীবিত আছেন। রাসূল সা. বললেন, যাও! বাড়িতে ফিরে যাও। মাতা-পিতার খেদমত করো। তুমি মাতা-পিতার খেদমতে যে সওয়াব পাবে, জিহাদ করে সে সওয়াব পাবে না। এক বর্ণনায় এসেছে,

ففيهما فجاهد

"যাও! তাদের খেদমতে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে জিহাদ করো।"

এই হাদীসে মাতা-পিতার খেদমতকে জিহাদের চেয়েও অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। -বুখারী শরীফ, বাব : ১৩৬ হাদীস : ২৮৪২

হায়! আমি অনেক কিরাত খুইয়ে ফেলেছি

একবারের ঘটনা, হযরত আবূ হুরায়রা রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর সামনে একটি হাদীস পড়লেন যে, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি

কোনো মুসলমান ভাইয়ের জানাযায় শরিক হবে, সে এক কিরাত সওয়াবের অধিকারী হবে। যে ব্যক্তি জানাযার নামাযের পর জানাযায় পিছনে পিছনে যাবে, সেই দুই কিরাত ছওয়াব লাভ করবে। আর যে দাফনে অংশগ্রহণ করবে। সে তিন কিরাত সওয়াব পাবে। কিরাত সে যুগের একটি পরিমাপক। অন্য এক হাদীসে এসেছে, এক কিরাত ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও পরিমাণে বেশি।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. -এর মুখে হাদীসটি যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. শুনলেন, তিনি আফসোস করে ওঠলেন, হায়! আমি ইতিপূর্বে হাদীসটি শুনি নি। আমার অনেক কিরাত সওয়াব ছুটে গেছে। অর্থাৎ আমার জানা ছিল না, জানাযার নামাযের শরিক হলে, জানাযার পিছনে পিছনে গেলে এবং দাফনে অংশ গ্রহণ করলে এতে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। আমার জানা না থাকার কারণে আমি বহু কিরাত সওয়াব থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. ছিলেন একজন সাহাবী, যার জীবনে একমাত্র কর্মসূচী ছিলো, সুন্নাতের উপর আমল করা এবং রাসূল সা.-এর আদেশ মোতাবেক চলা। যার আমলনামায় নেকের পাহাড়, তবুও তিনি একটি নতুন আমলের খোঁজ পেয়ে আফসোসে ফেটে পড়েন। হায়! আমি কেন এ পর্যন্ত আমলটি করি নি .... কেন এর যথাযথ গুরুত্ব দেই নি।

এমনই ছিলেন রাসূল সা.-এর সকল সাহাবা। যাঁদের কাজই ছিলো নবীজীর সুন্নাতের উপর আমল করা। যাঁদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফিরে বেড়াতো নেক আমলের সন্ধানে। নেকের প্রবৃদ্ধি এবং আল্লাহ তা'আলার রাজি-খুশি ছিলো যাঁদের সার্বক্ষণিক-ফিকির।

বান্দার হক আদায়ের পথ

এ সম্পর্কে হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. ও আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর চিঠি প্রণিধানযোগ্য। চিঠিতে লেখা ছিল, জীবনে আপনার বহু হক নষ্ট করেছি। কত অন্যায় আপনার সঙ্গে করেছি। সামগ্রিকভাবে আমার এ অসংখ্য অপরাধের ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন। এ জাতীয় চিঠি তাদের

নিকটবর্তী সকল লোকদের নিকট পাঠিয়েছেন। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। অন্যের হক নষ্ট করার গুণাহ থেকে মুক্তি দান করেছেন।

পক্ষান্তরে যদি এমন লোকের হক নষ্ট করা হয়, যার নিকট ক্ষমা চাওয়া সম্ভব নয়, কারণ হয়ত সে মারা গেছে অথবা এমন কোথাও চলে গেছে, যেখানের ঠিকানা জানা নাই এবং জানা সম্ভবও নয়; এরূপ অবস্থার নিরসনে হযরত হাসান বসরী রহ. বলেছেন, যার গীবত করছো কিংবা হক নষ্ট করছো, তার জন্য বেশি বেশি দু'আ করতে থাকো। দু'আ করো, হে আল্লাহ! আমি অমুকের গীবত করেছি, অমুকের হক নষ্ট করেছি, আপনি আমার উপর রহম করুন! আমার এ অন্যায় তাদের জন্য মর্যাদার কারণে পরিণত করুন। সাথে সাথে তাদের জন্য অধিক পরিমাণে তওবা ও ইস্তেগফার করবে। এটাও গুনাহ ও শাস্তি থেকে বাঁচার একটি পন্থা।

আমরা যদি বুযুর্গদের মতো চিঠি লেখি, তাহলে আমাদের কি নাম কাটা যাবে? নাকি আমাদের মর্যাদা হানী হবে? হিম্মতকরে যদি আমরা এরূপ করতে পারি, হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

এটি ইসলামী শিষ্টাচার

হযরত একরাশ ইবনে যাবীর রা. বলেন, আমি একবার হুযূর সা.-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। খাবার সামনে আসলে আমি পাত্রের চারদিক হতে বাড়িয়ে খাচ্ছিলাম। রাসূল সা. আমার হাত ধরে বললেন, একরাশ! এক জায়গা থেকে খাও। কেননা, খাবার তো এক রকমই। এদিক সেদিক থেকে খাওয়াটা শিষ্টাচার বহির্ভুত আচরণও। তাই এক জায়গা থেকে খাও। হযরত একরাশ রা. বলেন, আমি এক জায়গা থেকে শুরু করলাম। খাবার শেষে একটি বড় থালা আনা হলো। যাতে বিভিন্ন প্রকারের খেজুর ভরপুর ছিলো। যেহেতু হুযূর সা. আমাকে বলেছিলেন, এক জায়গা থেকে খাবে। তাই আমি এসব খেজুরের বেলায় এক জায়গা থেকে শুরু করলাম। আর হুযূর সা. কখনো এদিক থেকে ,আবার কখনো ওদিক থেকে শুরু করলেন। আমাকে এক দিক থেকে খেতে দেখে বললন, হে একরাশ! যে দিক থেকে মন চায় খাও। কেননা এখানে বিভিন্ন পদের খেজুর রয়েছে। - মেশকাত পৃ : ৩৬৭

এ হাদীসে রাসূল সা. এ আদব শিক্ষা দিলেন যে, খাবার এক ধরনের হলে সামনে থেকে খাবে। বিভিন্ন ধরনের খাবার হলে পাত্রের যেখান থেকে ইচ্ছা খেতে পারবে।

নিজের সন্তান ও নিজের সাহাবীদের এ ধরনের ক্ষুদ্র বিষয়েও রাসূল সা.-এর খেয়াল ছিল। এ সব নিজেও শিখা উচিত, ঘরবাসীকেও শিখানো উচিত। এগুলো ইসলামী শিষ্টাচার। এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী জীবন-যাপন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়।

এগুলো আমাদের খাদ্য নয়

হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী রা.-এর সন্তান হাসান বসরী রা. শিশুকালে একবার সদকার একটি খেজুর মুখে রাখলেন। হুযূর সা. এ অবস্থা দেখে বললেন, 'বাখ বাখ'। আমাদের ভাষায় থু!থু! শব্দটি তেমন অর্থবহ। অর্থাৎ বাচ্চা যদি মুখে কিছু দিয়ে বসে আর নিন্দার সাথে তা বের করা উদ্দেশ্য হয়, তখন এ শব্দ বলা হয়। যাই হোক, হুযূর সা. বললেন, কাখ কাখ। তথা তা মুখ থেকে বের করে ফেলে দাও! তুমি কি জানো যে, আমরা বনূ হাশেম গোত্রের লোকেরা সদকার মাল ভক্ষণ করি না।

হযরত হাসান রা. রাসূল সা.-এর দৌহিত্র ছিলেন। এত প্রিয় দৌহিত্র যে, একবার হুযূর সা. মসজিদে নববীতে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান রা. মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে হুযূর সা. মিম্বর থেকে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে কোলে তুলে নেন। আবার কখনো কখনো এমনও হতো যে, হুযূর সা. নামাযরত অবস্থায় হাসন রা. তাঁর কাঁধে উঠে বসেন। হুযুর সা. যখন সেজদা শুরু করেন, তাকে হাত দিয়ে ধরে নিচে নামিয়ে দেন। আবার কখনো এমন হতো যে, রাসূল সা. তাঁকে কোলে নিয়ে বলতেন, مَبْخَلَةٌ وَمَجْبَنَةٌ তথা সন্তান মানুষকে কৃপণ বানিয়ে দেয় এবং ভীরু বানিয়ে দেয়। কারণ, মানুষ সন্তানের কারণে কখনো কৃপণ আবার কখনো ভীরু হয়ে যায়।

একদিকে যেমন হাসান রা. ছিলেন হুযূর সা.-এর প্রিয়পাত্র। অন্যদিকে তিনি না বুঝে সদকার খেজুর খেতে নিলে রাসূল সা. তা সহ্য করেন নি যে, সে সদকার খেজুর খাবে। বাল্যকাল থেকেই তাঁকে শিক্ষা দিতে হবে বলে তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ থেকে বের করান এবং বলেন, সদকা আমাদের খাদ্য নয়। -জামেউল উসূল : ৪/৬৫৭, হাদীস : ২৭৪৮

কিছুটা বদদীন হয়ে গেছে

আমাদের পরিচিত এক ব্যক্তি উচ্চ শিক্ষিত। দীনদার ও তাহাজ্জুদ গোজার। তার ছেলে জাগতিক শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেছে। তারপর ভালো একটি চাকরিও পেয়েছে। একদিন তার বাবা খুবই আনন্দিত হয়ে বললেন, মা-শা-আল্লাহ! আমার ছেলে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেছে, ভালো চাকরিও পেয়েছে। এখন সমাজে সে মাথা উঁচু করে অবস্থান করছে। তবে কিছুটা বদদীন হয়ে গেছে!

বাবার কথার ভঙ্গিতে বোঝা যায, একটু বদদীন হওয়া তেমন কিছু নয়। এটা সাধারণ বিষয়। অথচ ভদ্রলোক বড় দীনদার! নিয়মিত তাহাজ্জুদও পড়েন।

আব্বাজান মুফতী শফী রহ. একটা ঘটনা বলতেন, এক লোক মারা গেছে। লোকেরা জীবিত মনে করে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেন এই লোকের কী হয়েছে? সে নড়া চড়া করে না কেন? ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন, লোকটি সম্পূর্ণ ঠিক আছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গই ঠিক আছে। তবে শুধু রূহটা নেই। রূহ টা বের হয়ে গেছে।

তেমনিভাবে ভদ্রলোক নিজের ছেলের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, মা-শা-আল্লাহ! সে অনেক বড় হয়েছে। কিন্তু শুধু একটু বদদীন হয়ে গেছে। যেন বদদীন হওয়ার তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। এর দ্বারা বড় কোনো ক্ষতি হবে এমন কোনো বিষয় নয়।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর অভ্যাস

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. -এর অভ্যাস ছিল, তিনি সারা দিন তা'লীম-তারবিয়াতের কাজে প্রচুর পরিশ্রম করার

পরও রাত দু'টোর দিকে ঘুম থেকে জেগে যেতেন এবং ফজর নামায পর্যন্ত নফল নামায ও যিকিরের মাঝে ডুবে থাকতেন। রমযান মাসে সারা রাত জাগার অভ্যাস ছিল। হযরতের এখানে সেহরীর পূর্ব পর্যন্ত তারাবীহর নামায আদায় করা হতো। একাধিক হাফেজে কুরআন পারা পারা করে শোনাতেন। এভাবে নামায পড়তে পড়তে হযরতের কদমদ্বয় ফুলে যেত। حتى تورمت قدماه (নবী করীম সা. এভাবে রাতভর তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন যে, তার পদযুগল ফুলে যেত) -এর সুন্নতের উপর আমল করতেন।

এভাবে কম খাওয়া, কম ঘুমানো এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে হযরত খুবই দূর্বল হয়ে পড়তেন। তারপরও তিনি তারাবীহর উক্ত আমল পরিত্যাগ করতেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ঘরের মহিলারা তারাবীহর নামাযের ইমাম মোলভী কেফায়াতুল্লাহ সাহেবকে ডেকে বললেন, আজ আপনি কিছুক্ষণ নামায পড়ানোর পর আপনার স্বাস্থের দূর্বলতার বাহানা দেখিয়ে নামায শেষ করে দিবেন। এদিকে হযরতের নীতি ছিল, তিনি সব সময় অন্যের আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এ জন্য যখন ইমাম সাহেব তার দূর্বলতার কথা জানালেন, হযরত সাথে সাথে মেনে নিলেন এবং হাফেজ সাহেব ভেতরে ঘুমিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হাফেজ সাহেব অনুধাবন করলেন, কে যেন খুব ধীরে ধীরে তার পা টিপে দিচ্ছে। তিনি একটু খেয়াল করতেই দেখতে পেলেন, স্বয়ং হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. তার পা টিপে দিচ্ছে। তখন তাকে সীমাহীন লজ্জা ও পেরেশানি পেয়ে বসল। সাথে সাথে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু হযরত বললেন, না ভাই, কিসের অসুবিধা? তোমার স্বাস্থ্য ভালো নেই। কিছুটা তো শান্তি আসবে। -হায়াতে শায়খুল হিন্দ, রচনা মাওলানা সাইয়েদ আসগার হুসাইন রহ. পৃ : ১৮৯

আমিও ধনীর দুলাল

দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহ. -এর শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মাওলানা মাহমূদ সাহেব রামপুরী রহ. রামপুরের অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী এক আভিজাত

বংশের সন্তান ছিলেন। দেওবন্দী বুযুর্গদের সাথে তাঁর প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিলো। তিনি যখন ইলম অর্জনের জন্য দেওবন্দে আসেন, তখন তিনি একটি ছোট মসজিদের সংলগ্ন একটি কামরায় থাকতেন। মসজিদটি এখনো "ছোট মসজিদ" নামেই প্রসিদ্ধ। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. দারুল উলূম যাতায়াতকালে এ মসজিদের পাশ দিয়ে যেতেন। একদিন সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় মাওলানা মাহমূদ সাহেবকে দাঁড়ানো দেখতে পান। তাঁর এখানে আসার কথা শায়খুল হিন্দ রহ. জানতেন না। তাই তিনি আগমনের হেতু জিজ্ঞেস করলে রামপূরী সাহেব সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে বললেন, বর্তমানে এ মসজিদের কামরায় থাকছি।" হযরত কামরার ভেতরে এসে থাকার জায়গা দেখলেন। সেখানে শোয়ার জন্য মাটির উপর একটি বিছানা পাতা ছিল। হযরত এ দেখে চলে আসেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভাবছিলেন, রামপুরী সাহেব সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তাঁর হয়তো মাটিতে শোয়ার অভ্যাস নেই। সম্ভবত তাঁর কষ্ট হচ্ছে। তাই হযরত ঘরে গিয়ে একটি চৌকি উঠিয়ে তা নিয়ে মসজিদের দিকে চললেন। যদিও দূরত্ব অল্পই ছিল, কিন্তু হযরত এ অবস্থায় অলি-গলি বাজার অতিক্রম করে ছোট মসজিদে এসে পৌছলেন। সে সময় মাওলানা মাহমূদ সাহেব মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। এখানে এসে হযরতের মনে হলো, সে আমাকে চৌকি নিয়ে আসতে দেখলে ভীষণ লজ্জা পাবে। ভাববে, আমার জন্য শায়খুল হিন্দ এতো কষ্ট করছেন। তাই তাঁকে দেখেই হযরত চৌকি নিচে রেখে বললেন, "নাও মিয়া! চৌকি ভেতরে নিয়ে যাও। আমিও ধনীর দুলাল, কারো চাকর নই।"

ইয়াউমুশ শকের রোযা

যদি শা'বান মাসের ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে ৩০ শে শা'বানকে ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় "ইয়াউমুশ শক" নামে অভিহিত করা হয়। হানাফী ওলামায়ে কেরামের মতে এদিন রোযা রাখা সর্ব সাধারণের জন্য মাকরূহ। তবে বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের জন্য অন্তরের মাঝে রমযানের সতর্কতার সন্দেহ প্রশ্রয় না দিয়ে নফলের নিয়তে রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে। শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা

শুনিয়েছেন। একবার 'ইয়াউমুশ শকে' হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. পান খেতে খেতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। উপস্থিত একজন বলে উঠলো, হযরত! আজ তো 'ইয়াউমুশ শক'। এ দিনে তো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রোযা রাখতে বারণ নেই। হযরত প্রথমে বললেন, হ্যাঁ! বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সেই সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমি কোত্থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি হলাম? এরপর কিছুক্ষণ দেরি করে বললেন, হাদীসের শেষাংশ "فقد عصى أبا القاسم" -এর ভয় হচ্ছে।

হযরত একথা বলে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. -এর সূত্রে নবী করীম সা. হতে বর্ণিত সেই হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন–

ومن صام يوك الشك فقد عصى أبا القاسم

'যে ব্যক্তি ইয়াউমুশ শকে রোযা রাখলো, সে আমি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধাচরণ করলো।'

হযরতের একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদিও হানাফী ওলামায়ে কেরাম এ হাদীস সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এবং বিশিষ্ট দীনী ব্যক্তিদেরকে উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত অভিহিত করেছেন। কিন্তু বাহ্যিকভাবে হাদীসটি ব্যাপক। অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়তে পারেন। এ জন্যই সেই বিরুদ্ধাচরণের ভয় হচ্ছে।

হযরত ওমর রা. ও শয়তান

একবার কোনো এক ব্যক্তি হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-কে প্রশ্ন করল, হুজুরে পাক সা. এরশাদ করেছেন, ওমর রা. যে পথ দিয়ে যায়, শয়তান সে পথের ত্রিসীমানায়ও ঘেষে না। হুযূর সা. বা হযরত আবূ বকর রা.; কারো সম্পর্কই এ ধরনের কোনো বলা হয় নি যে, শয়তান তাদের সাথে রাস্তা অতিক্রম করে না। প্রশ্ন হলো, শয়তান হযরত ওমর রা.-কেই ভয় পায়, যখন নিশ্চিতরূপে হুযূর সা. ও সিদ্দীকে আকবার রা. তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন? তাদেরকে তো শয়তানের আরো বেশি ভয় পাওয়া উচিত ছিলো।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. বলেন, হযরত শায়খুল হিন্দের অভ্যাস ছিল, কেউ তাঁকে ইলমী [জ্ঞানগর্ভ] প্রশ্ন করলে প্রথমে তিনি প্রজ্ঞাসূলভ ইলযামী তথা নিরুত্তর করার মত উত্তর দিতেন। তারপর তাহকীকী তথা বিশ্লেষণমূলক সঠিক উত্তর প্রদান করতেন। তেমনি এই প্রশ্নের জবাবে তিনি প্রথমে বললেন, এতো শয়তানের নির্বুদ্ধিতা। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো! সে কেন হযরত ওমর রা. কে এতো ভয় পায়? আর হুযূর সা. ও সিদ্দীকে আকবার রা.-কে ততোটা ভয় পায় না।

অতঃপর তিনি বিশ্লেষণ করে বলেন, মৌলিকভাবে কারো শ্রেষ্ঠ হওয়া এক জিনিস, আর অন্তরে কারো দাপট অনুভব করা আরেক জিনিস? শ্রেষ্ঠ হলে অন্যদের চেয়ে বেশি দাপটের অধিকারী হতে হবে, এমন কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। ঘটনা হলো হযরত ওমর রা.-এর রক্তের মাঝে শানে জালালত অর্থাৎ তেজ দৃপ্ততার প্রভাব ছিল বেশি। যার কারণে সবার মাঝে তাঁর দাপট গাঁথা ছিল। পক্ষান্তরে হুযুর সা.ও সিদ্দীকে আকবার রা. -এর মাঝে শানে জামাল তথা স্নিগ্ধ-সৌন্দর্যের কমনীয় দীপ্তির অত্যাধিক প্রাবল্য ছিল। সেহেতু হযরত ওমর রা.-এর ভীতি অন্যদের চেয়ে বেশি অনুভুত হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

মুদাররিস ও সওয়াব

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সহূল ওসমানী রহ. ছিলেন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর অন্যতম প্রিয় শিষ্য। তিনি দারুল উলূমের সে সকল সর্বজন স্বীকৃত মুদাররিসদের অন্যতম ছিলেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা একই সময় হাদীস ও ফিকাহ; উভয়টির ক্ষেত্রে সমান যোগ্যতা দিয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. বলতেন, একবার তিনি হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা দীনি ইলম পড়াই আবার তার জন্য বেতনও নেই, তারপরও কি এ ধরনের মুদাররিসি করে সওয়াব পাওয়া যাবে?

হযরত বলেন, মৌলভী সাহেব! সওয়াবের কথা বলছেন, মুদাররিসি করতে গিয়ে আমরা যে ভুল ত্রুটি করি, তার জন্য যদি জবাবদেহি করতে না হয়, তাহলে তাকে গনীমত মনে করো।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. এই ঘটনা বলার পর তার ব্যাখ্যা করে বলেন, হযরতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, বেতন নিলে আর সওয়াবের আশা করা

যাবে না। কেননা, নিয়ত ঠিক থাকলে অবশ্যই সওয়াবের আশা করা যাবে। তবে এটি তখন, যখন বেতনের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করা হবে। কিন্তু যদি নির্ধারিত সময় থেকে কম পড়ানো হয় বা অনুপস্থিত থাকে অথবা আবশ্যিক মেহনত ও অধ্যায়ন ছাড়াই পড়ায়, তাহলে বেতন হালাল হবে কিনা সন্দেহ আছে! হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

উম্মতের পতনের কারণ

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. প্রায় সময়ই হযরত খাইখুল হিন্দ রহ.-এর একটি কথা নকল করতেন এবং তিনি তাঁর লেখা একটি রচনায়ও উল্লেখ করেছেন। আমি তা স্বয়ং আব্বাজানের শব্দেই নিচে পেশ করছি–

"শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ. মাল্টায় চার বছরের বন্দি জীবন শেষে মুক্তি পাওয়ার পর দারুল উলূম দেওবন্দে চলে আসেন। তখন ওলামায়ে কেরামের এক মজলিসে তিনি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা ব্যক্ত করেছিলেন। হযরত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তি মাত্রই অবহিত যে, হযরতের এই কারারুদ্ধ জীবন সাধারণ কোনো রাজনীতিবিদদের ন্যায় কারাবরণ ছিলো না। এ দরবেশের স্বাধীনতা আন্দোলন-কেন্দ্রিক প্রতিটি পদক্ষেপ একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এ উম্মতে মুহাম্মাদীর মঙ্গল ও কল্যাণ কামনার্থেই নিবেদিত ছিল। প্রচণ্ড অসহায়ত্বের এই দূর দেশের বন্দি-জীবন শেষে তাঁর পবিত্র জবানে যে বাক্য ফুটেছিল, তা হযরতের দৃঢ় সংকল্প ও সদিচ্ছার যথার্থ পরিচয় বহন করে। তিনি বলেছিলেন–

الحمد للہ بمصیبتے گرفتارم نہ بمعصیتے

"আলহামদুলিল্লাহ! অপরাধ করে নয়, মছিবতের কারণে বন্দি হয়েছি।"

জেলের নিঃসঙ্গ দিনগুলির কোনো এক মুহূর্তে সাথিসঙ্গীরা হযরতকে চিন্তিত দেখে সান্তনাসূচক দু'চার কথা বলতে উদ্যত হল। তখন তিনি বললেন, এই সব কষ্টের জন্য কেন চিন্তা করবো? এগুলোতো একদিন শেষ হয়ে যাবে। চিন্তার বিষয় হলো, এই শ্রম এই কষ্ট আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কি না?

মাল্টার কারাগার থেকে ফিরে আসার পর একরাতে হযরত এশার নামায শেষে দারুল উলূমে এলেন। সেখানে তিনি ওলামায়ে কেরামের এক সম্মেলনে কিছু কথা বলেন। তখন তিনি তাঁর ভাষণে বলেন,

ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں دو سبق سیکھے ہیں

"আমি মাল্টার বন্দি জীবনে দু'টি শিক্ষা পেয়েছি।" এ কথা শুনে উপস্থিত সকলেই বেশি সচকিত কর্ণে উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল যে, এই উস্তাযুল আসাতেযা দরবেশ আশি বছরের অধ্যাপনা করে জীবনসায়াহ্নে এসে সে শিক্ষা পেয়েছেন, তা কি?

হযরত বলেন, আমি কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যতবারেই ভেবেছি যে, দিন দুনিয়ার সব ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের মুসলমান কেন আজ ধ্বংসের সম্মুখীন? সে সময় দু'টি কারণে আমার মাথায় এসেছে–

১. কুরআনে কারীম ছেড়ে দেওয়া

২. পারস্পরিক মতনৈক্য ও গৃহযুদ্ধ।

তাই আমি সেখান থেকেই এই সংকল্প করে এসেছি যে, আমি আমার বাকিটা জীবন কুরআনে কারীমের খেদমতে কাটিয় দেব। চেষ্টা করবো তাকে শাব্দিক ও আর্থিক উভয় ভাবে ব্যাপক করতে। শিশুদের জন্য কুরআনে কারীমের আক্ষরিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রতিটি এলাকায় মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হবে। বড়দের জন্যও সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে কুরআনে কারীমের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য জানানোর ব্যবস্থা করা হবে এবং সকলকে কুরআনে কারীমের আদর্শের উপর আমল করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়া ফ্যাসাদ কোনোমতেই সহ্য করা হবে না।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. আরো লিখেছেন, উম্মতের এই চিকিৎসক স্বজাতির ব্যাধি নিরূপন করে তার জন্য যে ঔষধের প্রস্তাব পেশ করেছন, তার প্রয়োগের জন্য জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা এবং নানাবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও বিরামহীন ভাবে শ্রম ব্যয় করে গেছেন। নিজেই কুরআনে কারীমের দরস দিতে শুরু করে গেছেন। যেখানে সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. ও মাওলানা শিব্বীর আহমদ

ওসমানী রহ.সহ স্থানীয় সকল ওলামায়ে কেরাম ও সর্বসাধারণ অংশগ্রহণ করতেন। অধমেরও সেই দরসে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু এ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর হযরত হাতে গোনা অল্প কদিন বেঁচে ছিলেন। কবির ভাষায়-

آں مدح بشکست واں ساقی نہ ماند

"সেই মদীরা পাত্রও ভেঙ্গে গেছে,
আর সে্সি শুরা পরিবেশনকারীরা আজ নেই।"

-ওয়াহদাতে উম্মত পৃ : ৫০-৫১

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কুরআন তেলাওয়াত

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. বলেন, একদিন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. বুখারীর দরসে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ফাতেহা পাঠ সংশ্লিষ্ট মাসআলা বিশদাকারে ব্যাখ্যা করেন এবং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাযহাবের সমর্থনে এতটা সুস্পষ্ট ও জোরালো প্রমাণাদি পেশ করেন যে, শ্রোতামণ্ডলীর প্রাণ ভরে যায়। দরস শেষে এক শাগরেদ হযরতের দরবারে আরজ করল যে, হযরত! আজ তো আপনি এই মাসআলায় এত যুক্তিসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন যে, যদি ইমাম শাফেয়ী রহ. বেঁচে থাকতেন, তাহলে সম্ভবত নিজের মাসলাক থেকে রুজু' করতেন। হযরত এক কথা শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন যে, তোমরা ইমাম শাফেয়ী রহ. কে কী মনে কর? আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তাহলে সম্ভবত তাঁর তাকলীদ করা ছাড়া আমার কোনো উপায় থাকতো না।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর জিহাদী উদ্দীপনা

আল্লাহ তা'আলা হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-কে জিহাদের যে স্পৃহা দিয়েছেন, সে সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান প্রায়-সময়ই অশ্রু স্বজল চোখে ভরাট কণ্ঠে এ ঘটনা শুনাতেন- 'হযরত একবার ইন্তেকালের বেশ কিছুদিন পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় বিষন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হযরতের এ অবস্থা দেখে তখন তার জনৈক খাদেমের মনে হলো যে, হয়তো জীবন থেকে নিরাশ হয়ে মন খারাপ করে আছেন। তখন সে সান্তনাসূচক দু'কথা বলতে চাইলে

হযরত বললেন, আরে মরণ নিয়ে কিসের শোক! দুঃখতো এজন্য যে, বিছানায় মরছি। নয়তো হৃদয়ের আকাঙ্খা হলো, কোনো যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো। মাথা একদিকে আর হাত-পা আরেক দিকে থাকবে।'

খেলাফত আন্দোলনে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.

এক. শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. প্রায় সময় বলতেন, খেলাফত আন্দোলনের সময় সর্ব সাধারণের মাঝে যে রকম প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, পরবর্তী অন্য কোনো আন্দোলনে সে ধরনের স্পৃহা পরিলক্ষিত হয় নি। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ছিলেন সে আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। তাঁর একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা, প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের বরকতে এ আন্দোলন ভারতবর্ষের প্রতিটি জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও এ আন্দোলনের পতাকা মুসলমানরা বহন করেছিল, কিন্তু ইংরেজ সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিন্দুরাও মুসলমানদের পিছনে কাতার বন্দি হয়েছিল। আন্দোলনের মূল বুনিয়াদ যেহেতু মুসলমানদের হাতে ছিল, তাই হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. হিন্দুদের সাথে জোট বাঁধতে দ্বিধা করেন নি। তারপরও হযরতের মস্তিষ্কে সারাক্ষণ এ চিন্তা ঘুরপাক খেতো যে, না জানি হিন্দুদের সাথে সম্মিলিত এ যৌথ আন্দোলন মুসলমানদের স্বতন্ত্র জীবন পদ্ধতি ও ইসলামের মৌল বুনিয়াদের মাঝে কোনোভাবে প্রভাব ফেলে কি না? সে সময় কোথাও কোথাও হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত সমাবেশে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে, হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের সৌভ্রাতৃত্ব প্রদর্শনার্থে এ বছর ঈদুল আযহায় গরু কুরবানি করা হবে না। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এ সংবাদ শুনে অস্থির হয়ে ওঠেন। তাদের এই সিদ্ধান্তের তিনি শুধু মৌখিক প্রতিবাদই করেন নি; বরং আমলের মাধ্যমেও তার প্রকাশ্য বিরোধীতা করেছেন এভাবে যে, হযরত সাধারণত বকরি কুরবানি দিতেন, কিন্তু সে বছর অন্যত্র গাভী খুঁজে আনেন এবং প্রকাশ্যে গাভী কুরবানি দেন।

দুই. খেলাফত আন্দোলন নিয়ে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ও তাঁর প্রিয় শিষ্য হযরত থানভী রহ.-এর মধ্যকার মতভেদের কথা কম-বেশ সবাই

জানেন। এ ধরনের আন্দোলন মুসলমানদের উপকারে অবদান রাখবে না, এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হযরত থানভী রহ. নিজেকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেন নি। উস্তাদ ও শাগরেদ প্রত্যেকেই আপন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বস্থানে অটল থাকা সত্ত্বেও তাদের এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো যে, এটি দিয়ানত তথা সুবিবেচনার মতভেদ মাত্র।

উদাহরণ স্বরূপ, একবার এ আন্দোলনের কিছু কর্মী থানাভবনে সমাবেশ করার পদক্ষেপ গ্রহন করে হযরত শায়খুল হিন্দের সমীপে সে সমাবেশে সভাপতিত্বের পদ অলংকৃত করার দরখাস্ত পেশ করেন। শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. বলেন, যখন হযরতের সামনে এ আরজ রাখা হয়, তখন তিনি তা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দিয়ে বলেন, এ কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যদি থানাভবনে সমাবেশ করি, তাহলে তা মৌলভী আশরাফ আলীর জন্য মনবেদনার কারণ হবে। আমি থানাভবনে বক্তৃতা দিবো, আর সেখানে সে উপস্থিত থকতে পারবে না, এটি নিশ্চয়ই তাঁর ভালো লাগবে না। আর যদি সে অংশগ্রহণ করে, তাহলে তা তার সুবিবেচনার পরিপন্থি হবে। কাজেই আমি এ কাজ করতে পারবো না। অতঃপর তাই হলো, আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় হযরত হিন্দুস্থানের অসংখ্য স্থানে শুভাগমন করেছিলেন। কিন্তু থানাভবনে কোনো সমাবেশই করেন নি।

সঙ্গীদের সম্মানের প্রতি হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সতর্ক দৃষ্টি

হযরত আব্বাজন রহ. এই ঘটনা শুনিয়েছেন যে, দেওবন্দের কোনো এক ব্যক্তির বিবাহ অনুষ্ঠানে বেশ বড় আয়োজন করা হয়। সেখানে দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদদেরকেও দাওয়াত দেওয়া হয়। দারুল উলূমের তৎকালীন মুহতামিম হযরত মাও. হাফেজ মুহাম্মাদ আহমদ সাহেবসহ হযরত শায়খুল হিন্দু রহ.ও সেখানে আগমন করেন। হযরত বিনাদ্বিধায় সাধারণ মানুষদের কাতারে বসে যান। ঘটনাচক্রে আয়োজন স্থলে শরিয়ত বিরাধী কিছু কর্মকাণ্ড ঘটে। তখন দারুল উলূমের বেশ কজন উস্তাদ এসে হযরতকে বলেন, হযরত! আপনি গৃহকর্তাকে বুঝান। তিনি যেন এ ধরনের কার্যকলাপ পরিহার করেন। হযরত তখন আশ্চর্যের সাথে মুহতামিম সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, অদ্ভূত ব্যাপার! গুরুজন থাকতে

আপনারা কেন আমার কাছে এলেন? মুরব্বীদের উপস্থিতিতে আমার কিছু বলা অভদ্রতা হবে।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজন রহ. বলেন, হযরত আহমদ সাহেব প্রায় হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সমবয়সী ছিলেন। কিন্তু হযরতকে আল্লাহ তা'আলা বাস্তবিক অর্থেই বিনম্রতার যে শীর্ষস্থানে উন্নীত করেছিলেন, তার ভিত্তিতে হযরত শুধু নিজের পায়ের নিচের মটির প্রতিই লক্ষ্য রাখতেন যে, নিজের সাথীদেরকেও নিজের থেকে বড় মনে করতেন।

বড় মৌলভী সাহেব

আব্বাজান রহ. প্রায়শই বলতেন, যে পরিবেশে আমরা চোখ খুলেছি, সেখানে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ইলমী-আমলী শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ সবার অন্তরে অংকিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যুগে তাঁর নামের আগে-পরে বড় বড় উপাধি সংযুক্তির প্রচলন ছিল না। খোদ "শায়খুল হিন্দ" রহ. উপাধি পরবর্তী যুগে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। সে সময় হযরতকে সাধারণতঃ সবই "বড় মৌলভী সাহেব" বলে ডাকতেন। হযরত এতটা সরল ও বিনম্র ছিলেন যে, তিনি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্টের কারণে চাইতেন যে, তাঁকে যেন এ নামেও ডাকা না হয়।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. বলতেন, আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান মাওলানা ইয়াসিন সাহেব হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর শাগরেদ ছিলেন। তিনি ছোট খাট প্রয়োজন পড়লেও আমাদের বাসায় চলে আসতেন। দরজায় কড়া নাড়তেন। ভেতর থেকে প্রশ্ন আসতো, কে? তখন তিনি উত্তরে বলতেন, بندہ محمود آیا ہے "বান্দা মাহমূদ এসেছে।"

রেশমী রুমাল আন্দোলন

দারুল উলূম দেওবন্দের চাটাইয়ে বসে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. কর্তৃক পরিচালিত ঐতিহাসিক রেশমী রুমাল আন্দোলনের কথা নিশ্চয়ই কারো অজানা নয়। এ আন্দোলন নিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের পরিচালনা পরিষদের ভেতর আদর্শিক মতভেদ দেখা দিয়েছিল। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমদ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব

রহ. সহ দারুল উলূমের ব্যবস্থাপনা পরিষদের বেশ ক'জন দায়িত্বশীলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, দারুল উলূম দেওবন্দ সমকালীন প্রেক্ষাপটে উম্মতে মুসলিমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। সেহেতু তার চতুর্সীমার মাঝে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হবে না, যা উম্মতে মুসলিমার সুবিশাল এই দীনী কেন্দ্রকে কোনো ধরনের বিপত্তির মুখে ঠেলে দেবে।

অন্যদিকে হযরত শায়খুল হিন্দের চেতনা জুড়ে ছিল প্রচণ্ড জিহাদী স্পৃহা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে চরম উদ্বেগ। সেহেতু সে সকল বুযুর্গরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য নির্জনে বসতেন। শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. বলেন, একবার তারা কোনো এক কামরায় গোপন পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেখানে অন্য কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না। আমি তখন ছোট থাকায় কিভাবে যেন ভেতরে ঢুকে গেলাম। আমার দেহ ছোট হওয়ায় কারো চোখে পড়িনি। দেখলাম, কোনো একটি বিষয় নিয়ে তাদের মাঝে বেশ জোরে কথা হচ্ছে। ছেলেবেলার কথা তো, তাই আমার পুরোপুরি মনে নেই, কথাগুলো কী ছিল? কিন্তু এতটুকু বুঝেছিলাম যে, মাদরাসাকে স্বাধীনতা আন্দোলনে কতটুকু শামিল করা যায়? তারা তা নিয়ে কথা বলছেন। আনেক্ষণ পর তারা বাইরে বেরিয়ে এলেন।

দৃষ্টিভঙ্গির অনৈক্য সত্ত্বেও তারা দু'জন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. কে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। হযরত পদে পদেও তার খেয়াল রাখতেন। কিন্তু যখন হযরত হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সফরে বের হন এবং বন্দি হয়ে মাল্টার নির্বাসনে যান, তখন কিছু কুচক্রী এ গুজব রটিয়ে দিল, হযরতের সাথে মুহতামিমদ্বয়ের মতনৈক্য ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। বিধায় হযরত মাদরাসার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন।

মাল্টা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর হযরত যখন এ ধরনের রটানো গুজব শুনতে পান, তখন খুবই আহত হন। যখন তিনি দেওবন্দে শুভাগমন করেন, তখন শুধু দারুল উলূম দেওবন্দ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গই নয়; বরং শহরের অর্ধেক লোকই হযরতকে অভ্যার্থনা জানাতে রেল-ষ্টেশনে চলে আসেন। হযরতের এ মুহূর্তে সোজা ঘরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল এবং সে ধরনের বন্দোবস্তই করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু স্টেশনে নেমেই হযরত

বললেন, ঘরে নয়, আমি সোজা মাদরাসায় যাবো এবং সেখানেই সবার সাথে সাক্ষাৎ করবো। হযরতের এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কুচক্রীদের সকল ষড়যন্ত্র ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়।

তাবলীগের আবশ্যিক দায়িত্ব ও বর্তমান যুগ

এক প্রসিদ্ধ হাদীসে দো'জাহানের সরদার হযরত রাসূলে আকরাম সা. এরশাদ করেন, যখন চারটি আলামত দেখবে তখন সবার সংশোধনের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করবে। আলামত চারটি হলো–

"اذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيًا موثرةً وإعجاب كل ذى رأيٍ برأيه"

১. অনুভূতি কার্পণ্যের অনুগামী হবে।
২. আত্মপ্রবৃত্তি অনুকরণ করা হবে।
৩. আখেরাতের উপর দুনিয়া প্রাধান্য দেওয়া হবে।
৪. প্রত্যেকেই নিজের রায়ের উপর অনড় থাকবে।

আব্বাজান রহ. বলেন, কোনো এক ব্যক্তি হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত বর্তমান যুগে তো উক্ত চারটি আলামতই বাহ্যিকভাবে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি এ যুগে তাবলীগে দীনের এ ফরজ দায়িত্ব রহিত হয়ে গেছে?

হযরত জবাব দিলেন, না! এখনও সেই সময় আসেনি।

আব্বাজান শুধু এতটুকু ঘটনাই শুনিয়েছিলেন। আর কোনো বৃত্তান্তই প্রদান করেন নি। তখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছি, হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর যুগে না হোক, এই যুগে তো প্রকাশ্যে চারটি আলামতই দেখা যাচ্ছে। কাজেই বর্তমান সময়ে তাবলীগ রহিত না হওয়ার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে, একমাত্র একজন মুজতাহিদের অন্তর্দৃষ্টি-ই বলতে পারবে, সে সময় ঘনিয়ে এসেছে কি না? তা আমি কি করে বলবো? তখন আমার খুব পীড়াপীড়ির কারণে আব্বাজান যে শব্দে তার অভিমত জানিয়েছিলেন, তা অবশ্য আমার মনে নেই। কিন্তু হৃদয়ের মাঝে তার যে প্রতিক্রিয়া এখনো আছে, তা হলো,

উক্ত চারটি আলামত বলে এমন যুগের কথা বলা হয়েছে, যেখানে তাবলীগের কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না। এমনকি জনগণের সংশোধনের চিন্তা করতে গেলে নিজের দীনী হালতই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভবনা দেখা দিবে। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে এখন পর্যন্ত পরিবেশ ততটা খারাপ হয় নি। যদি নিখাদ সহমর্মিতা ও সঠিক পদ্ধতিতে তাবলীগ করা হয়, তাহলে অবশ্যই তা প্রভাব ফেলবে। তাবলীগের যথাযোগ্য কর্তব্য আদায় না করার কারণে আমরা আজ দূষিত পরিস্থিতি দেখছি। অথবা আমরা সঠিক পদ্ধতিতে তাবলীগ না করার কারণে এমন হয়েছে। আমরা যদি এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি, তাহলে অবস্থা ঠিক হয়ে আসবে। এ আশা সুদূর পরাহত নয়।

এমন লখলাস হওয়া উচিত

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. যখন কানপুরের এক মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন, তখন তিনি সেই মাদরাসর মাহফিলে নিজ উস্তাদ হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-কেও দাওয়াত করলেন। সেখানকার বেশ ক'জন আলেমের যুক্তিশাস্ত্রের পারদর্শিতা প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের কেউ কেউ ছিল বেদাতী। এদিকে ওলামায়ে দেওবন্দ খালেস দীনী শিক্ষার মাঝে মনোযোগী থাকার কারণে তাদের ধারণা ছিল, দেওবন্দী আলেমদের যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। সে সময় হযরত থানবী রহ. ছিলেন যুবক। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-কে দাওয়াত দেওয়ার পিছনে তাঁর অন্তরে এই আকাঙ্খা কাজ করছিলো যে, এখানে হযরতের বয়ান হলে কানপুরের আলেম সমাজ টের পাবে, দেওবন্দী আলেমদের ইলমী মাকাম কোথায়? "মা'কুলাত ও মানকুলাত" (যুক্তিবিদ্যা ও আসমানী বিদ্যা) উভয় শাস্ত্রে তাঁরা কতটা বিদগ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী?

অতঃপর সভা শুরু হলো, হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. বয়ান শুরু করলেন। বক্তব্যের মাঝপথে যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত একটি বিষয়ের আলোচনা এসে যায়। ঘটনাচক্রে থানবী রহ. যে সকল আলেমদেরকে হযরতের বয়ান শুনাতে চাচ্ছিলেন, তারা এখনো এসে পৌছায় নি। বয়ানের শেষ প্রান্তে হযরত যখন প্রচণ্ড দক্ষতার সাথে জোড়ালো যুক্তি দিয়ে বিষয়টি খুলে খুলে

বলছিলেন, ঠিক সে সময় সে সকল আলেম সভাস্থলের দিকে আসতে লাগলেন, হযরত থানবী রহ. যাদের অপেক্ষায় ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বেশ প্রফুল্লবোধ করছিলেন যে, এখন ওরা বুঝবে, হযরত কোন মাকামের লোক? কিন্তু হলো কি? হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. তাদেরকে দেখে হঠাৎ বয়ান সংক্ষিপ্ত করে শেষ করে দিয়ে বসে গেলেন। সে সময় হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী রহ. উপস্থিত ছিলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত ! এখনই তো বয়ানের আসল সময়, আপনি বসে গেলেন কেন? হযরত বললেন, এ ধরনের খেয়াল আমার মাথায়ও এসেছিল।

হযরত আলী রা. -এর একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ। তাঁর সামনে একবার কোনো এক ইহুদী নবী করীম সা. -এর শানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করে বসে। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী রা. লোকটির উপর ঝাপিয়ে পড়েন। তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চড়ে বসেন। ইহুদি লোকটি কোনো উপায় না পেয়ে ক্রোধোম্মত্ত হয়ে হযরত আলী রা.-এর মোবারক চেহারায় থু থু নিক্ষেপ করলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ, যারা দৃশ্যটি দেখছিলেন, তারা দেখতে পেলেন, হযরত আলী রা. সাথে সাথে লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে গেছেন। তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি হযরতকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, প্রথমে আমি তার উপর আক্রমণ করেছিলাম নবীজীর ভালবাসায়। কিন্তু তার থু থু নিক্ষেপের পর যদি তাকে কোনো কিছু করতে যেতাম, তাহলে সেটা হতো আমার নিজের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. তাঁর এই কর্মের মাধ্যমে হযরত আলী রা.-এর একটি সুন্নত যিন্দা করলেন। হযরতের উদ্দেশ্য ছিল, এতক্ষণ পর্যন্ত বয়ান নেক নিয়তে খালেস আল্লাহর জন্য হচ্ছিল। কিন্তু উক্ত ধারণা আসার পর বয়ান নিজের বড়ত্ব প্রদর্শনের দিকে মোড় নিচ্ছিলো। এ কারণে আমি তাঁর ইতি টেনেছি।

উল্লেখিত বৃত্তান্তসহ ঘটনাটি আমি নিজে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. থেকে শুনেছি। তিনি শুনেছেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. থেকে। -হায়াতে হযরত শায়খুল হিন্দ পৃ : ১৩

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর মেহমানদারি

মাওলানা মাহমূদ সাহেব রায়পুরী রহ. বলেন, একবার আমি আর আমাদের এলাকার এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি দেওবন্দের তাহসীল অফিসে কোনো এক কাজ করতে আসি। তখন আমি হযরত শায়খুল হিন্দের বাসায় মেহমান হই। ঐ হিন্দু ব্যক্তিও তার ভাইদের বাড়িতে খাবার খেয়ে আমার কাছে চলে আসে। সেও আমার সাথে এখানেই থাকবে। তাকে একটি চৌকি দেওয়া হয়। যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আমি গভীর রাতে হযরতকে অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। আমি এ কথা ভেবে শুয়ে থাকলাম, যদি হযরত কোনো কষ্টকর কাজ করেন, তাহলে আমিও হযরতকে সহায়তা করবো। নয়তো অহেতুক নিজের জাগ্রতভাব প্রকাশ করে হযরতকে পেরেশান করবো না। আমি দেখলাম, হযরত সেই হিন্দু লোকটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার চৌকিতে বসে তার পা টিপে দিতে লাগলেন আর সে আরামে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। মাওলানা মাহমূদ সাহেব বললেন, আমি ওঠে গেলাম এবং হযরতের কাছে অনুরোধ পেশ করে বললাম, হযরত! আপনি কষ্ট করবেন না। আমি টিপে দিচ্ছি। হযরত বললেন, তুমি গিয়ে ঘুমাও। এ লোক আমার মেহমান। তার খেদমত আমিই করবো। কাজেই বাধ্য হয়ে চুপ হয়ে গেলাম। আর হযরত তার পা টিপতে থাকলেন। -আরওয়াহে ছালাছা পৃ : ২৮৫,৪৩২

যাকে মৃত্যুই তাঁর হাত থেকে ছুটিয়ে নেয়

হযরত মুফতি আযীযুর রহমান রহ.-এর উচ্চাঙ্গের ইলমী গভীরতা শুধু একথার দ্বারাই বুঝে আসবে যে, তিনি সেই যুগে দারুল উলূম দেওবন্দে 'সদরে মুফতি'-এর পদ অলংকৃত করেছিলেন, যে যুগে সেখানে ইলমের আকাশের সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররা শিক্ষকতা করতেন।

হযরত মুফতি সাহেব একাধারে ৩৫ বছরের-ও অধিক বছর যাবত ফাতাওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন কালে হাজারেরও অধিক ফাতাওয়া লিখেছেন। যার সম্মিলিত সংখ্যা লক্ষাধিক হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তা সামগ্রিক সংকলনাকারে প্রকাশিত হয় নি। সর্বপ্রথম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. দারুল উলূমের ফাতাওয়ার রেজিস্ট্রি খাতা থেকে বাছাই করে হযরত

প্রদত্ত ফাতাওয়া সমূহ "আযীযুল ফাতাওয়া" নামে সংকলন করেন। এ ফাতাওয়াগুলো শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের সম্পাদনায় দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত "মাসিক আল-মুফতি" -এর মাঝে প্রকাশিত হয়েছে। পরে সেগুলো একটি পূর্ণ ভলিয়ম আকারে বের হয়। কিছু দিন ধরে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রদত্ত ফাতাওয়াসমূহ সুবিন্যস্ত আকারে বিষয়ভিত্তিক রূপে "ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম" নামে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংকলনগ্রন্থের মাঝে সর্বপ্রথম হযরত মুফতি সাহেবের দেওয়া ফাতাওয়াগুলো একত্র করা হয়। ইতিমধ্যে যার ৯ম খণ্ড আলোর মুখ দেখেছে এবং সম্ভবত তার ধারাবাহিকতা এখন তালাক পর্যন্ত পৌছে গেছে। হযরত মাওলানা যফীরুদ্দীন সাহেব অসম্ভব ঘাম ঝরিয়ে এর বিন্যাসের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা এই সুবিশাল কীর্তিতে তার মাধ্যমে সুচারু রূপে পরিপূর্ণ হওয়ার তাওফীক দান করুন। ইনশাআল্লাহ! ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ফেকহী পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এটি অভূতপূর্ণ পূঁজি হবে।

ফাতাওয়ার প্রতি হযরত মুফতি সাহেবের ভালবাসা ইতিহাস হয়ে থাকবে। শ্রদ্ধেয় আব্বাজান লিখেন-

> "অনেক সুহৃদ আমাকে জানিয়েছেন, ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তেও হযরতের হাতে একটি ফাতাওয়া ছিল, যাকে মৃত্যুই তাঁর হাত থেকে ছুটিয়ে বুকের উপর রেখে দিয়েছেন। আমাদের ও সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে আল্লাহ হযরতকে উত্তম প্রতিদান দিন।" -মুকাদ্দামায়ে ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম : ১/৪৮

হযরত আবূ ছা'লাবা আল খুশানী রহ.

হযরত আবূ সুলাইমান দারানী রহ.-এর কবর থেকে স্বল্প দূরত্বে ছোট্ট একটি কবরস্থান রয়েছে। সেখানে দশ-বারটি কবর রয়েছে। তাঁরই একটি হলো বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ ছা'লাবা খুশানী রা. -এর কবর। তিনি বনূ খুশায়ন বংশের লোক ছিলেন। নবী করীম সা. যখন খায়বর যুদ্ধে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি নবীজীর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। খায়বর যুদ্ধে যোগদান করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির

প্রাক্কালে তিনি বাইআতে রিদওয়ানেও অংশগ্রহণ করেন। হযরত আলী রা. ও হযরত মু'আবিয়া রা.-এর পারস্পরিক সংঘাতের সময় তিনি তাদের কাউকেই সঙ্গ দেন নি। নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী কালে দারিয়ায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। শেষ বয়সে তিনি বলতেন, আমি মহান আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, মৃত্যুর সময় অন্যদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে কষ্ট হয়, তা আমার হবে না। সে মতে একদিন তিনি শেষরাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করছিলেন। তখন সেজদার অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এক মেয়ে তখন ঘুমিয়ে ছিল। স্বপ্নে দেখল, তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেছেন। সে ভয় পেয়ে জেগে উঠলো। জিজ্ঞেস করল, আমার আব্বাজান কোথায়? কেউ উত্তর দিল, নামায পড়ছেন। সে তখন তাঁকে ডাকল। কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ এলো না। তাঁর কামরায় উঁকি মেরে দেখল যে, তিনি সেজদায় আছেন। নাড়া দিতেই তিনি সেজদা থেকে পড়ে গেলেন। তখন বুঝলেন যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। -আল ইসাবা : ৪/৩০

হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী রহ.

হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী রহ. -এর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ ইবনে ছাওব রহ.। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদির এমনই একজন অতিমহান উম্মত, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঠিক তেমনভাবে আগুন নিষ্ক্রিয় করে দেন, যেভাবে হযরত ইবরাহীম আ.-এর জন্য নমরূদের আগুন ফুল বাগিচা-বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিলো ইয়ামানে। নবী করীম সা.-এর যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নবীজীর খেদমতে হাজির হতে পারেন নি। নবী করীম সা. -এর পবিত্র জীবনের শেষ দিকে ইয়ামানে এক ভণ্ড নবী দেখা দিয়েছিলো। নাম আসওয়াদ আনাসী। সে লোকদেরকে তাঁর মিথ্যা নবুওয়াতের উপর ঈমান আনতে বাধ্য করতো।

তখন সে হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী রহ.-কে বার্তা পাঠিয়ে ডেকে আনে। প্রথমে তার উপর ঈমান আনতে বলে। হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী রহ. অস্বীকৃতি জানান। তখন সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি মুহাম্মাদ সা. -এর উপর ঈমান রাখো? হযরত আবূ মুসলিম রহ. বললেন, আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি।

এ কথা শুনতেই আসওয়াদ আনাসী প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সে একটি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে। হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী রহ.-কে সেই আগুনে নিক্ষেপ করে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর জন্য আগুনকে নিষ্ক্রিয় করে দেন। তিনি সেখান থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসেন। ঘটনাটি এতটাই বিস্ময়কর ছিলো যে, আসওয়াদ আনাসী ও তার সাথী সঙ্গীরা প্রচণ্ড রকম ভয় পেয়ে যায়। তখন আসওয়াদের দোসররা তাঁকে পরামর্শ দেয় যে, তাঁকে এখনই দেশ থেকে বের করে দাও। নয়তো তার কারণে তোমার অনুসারীদের বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে। তখন সে হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী রহ.-কে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে।

ইয়ামানের বাইরে তাঁর আশ্রয় ছিলো একটাই। মদিনা মুনাওয়ারা। সেমতে তিনি নবী করীম সা. -এর খেদমতে হাজির হওয়ার নিয়তে রওয়ানা হন। কিন্তু যতক্ষণে তিনি মদিনার দোরগড়ায় পৌছেন, ততক্ষণে নবুওয়তের দেদীপ্যমান সূর্য দিগন্তের ওপারে চলে যায়। নবী করীম সা. আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। খেলাফতের মসনদে আসীন হয়েছেন হযরত সিদ্দীকে আকবার রা.। মদিনায় প্রবেশ করে হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী রহ. মসজিদে নববীর ফটকের কাছে তাঁর উষ্ট্রী বসালেন। মসজিদে প্রবেশ করলেন। একটি স্তম্ভের পেছনে নামায আদায় করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। যেখানে তখন হযরত ওমর রা. উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন মুসাফিরকে নামায পড়তে দেখে এগিয়ে এলেন। নামায শেষ করতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

'ইয়ামান থেকে' হযরত আবূ মুসলিম রহ. উত্তর দিলেন। হযরত ওমর রা. সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর দুশমন (আসওয়াদ আনাসী) আমাদের এক বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিলো। কিন্তু আগুন তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারে নি। পরবর্তী সময়ে আসওয়াদ আনাসী তাঁর কী ক্ষতি করেছে?

হযরত আবূ মুসলিম রহ. বললেন, তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনে সাওব।

ততোক্ষণে হযরত ওমর রা.-এর দূরদৃষ্টি কাজ করতে শুরু করেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আমি আপনাকে কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি সেই ব্যক্তি?

হযরত আবূ মুসলিম রহ. উত্তর দিলেন, জি হ্যাঁ।

হযরত ওমর রা. এ কথা শুনতেই আনন্দ ও খুশির অতিশয্যে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলেন। সঙ্গে করে হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.-এর খেদমতে নিয়ে গেলেন। তাঁকে সিদ্দিকে আকবার রা.ও নিজের মাঝখানে বসালেন। বললেন, 'শুকর আল্লাহর।' যিনি আমাকে মৃত্যুর আগেই উম্মতে মুহাম্মাদীর ওই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন, যার সঙ্গে তিনি ইবরাহীম আ. -এর মতো আচরণ করেছেন।

হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী রহ. ইবাদত ও দুনিয়া বিমুখতার ক্ষেত্রে অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, "যদি আমি আমার চর্ম চোখে জান্নাত দেখে ফেলি, তখনো আমার কাছে বর্তমানের চেয়ে আরো বেশি করার মতো কোনো আমল নেই। তদ্রুপ আমি যদি আমার খোলা চোখে জাহান্নামও দেখে ফেলি, তখনও আমার কাছে এর চেয়ে বেশি আমল নেই।"

হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী রহ. জিহাদের প্রচণ্ড স্পৃহা বোধ করতেন। কিন্তু জিহাদের সফরেও তিনি রোজা রাখতেন। জনৈক ব্যক্তি একদিন বললো, সফর অবস্থায় রোজা রাখার কারণে আপনি তো অনেক দুর্বল হয়ে পড়বেন। উত্তরে তিনি বললেন, ওই ঘোড়াই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, যা চলতে চলতে হাড্ডিসার হয়ে যায়।'

একবার তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! একমাত্র প্রাকৃতি চাহিদা পূরণ ও স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া; এ দু'কাজের বাইরে এমন কোনো কাজ নেই, যার ব্যাপারে আমাকে আশংকা করতে হবে যে, কেউ দেখে ফেলছে কি না?

হযরত আবূ মূসলিম খাওলানী রহ. খুব বেশি গোলাম আজাদ করতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে একটি বাঁদিই রয়ে গেলো। একদিন তিনি দেখলেন, সেই বাঁদিটি কাঁদছে। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলেন, বাঁদি বললো, আপনার ছেলে আমাকে মেরেছে। তিনি ছেলেকে ডেকে তার সামনে বাঁদিকে জিজ্ঞেস করলেন, ও তোমাকে কীভাবে মেরেছে? বাঁদি বলল, থাপ্পর মেরেছে। তিনি বললেন, তুমিও ওকে থাপ্পর মারো। বাঁদি বলল, 'আমি আমার মুনিবের গায়ে হাত তলেতে পারি না।' হযরত আবূ মুসলিম খাওলানি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছো?

বাঁদি বললো, জি হ্যাঁ! তিনি বললেন, দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও নিজের অধিকার চাইবে না তো? বাঁদি অস্বীকার করল। হযরত আবূ মুসলিম রহ. বললেন, দু'জন স্বাক্ষীর সামনে স্বীকারোক্তি দিতে হবে।

যখন তিনি দু'জন স্বাক্ষী নিয়ে এলেন এবং তাদের সামনে ঐ বাঁদি স্বীকারোক্তি দিল, তখন তিনি তাদের বললেন, আমিও এই স্বাক্ষীদের সামনে স্বীকারোক্তি দিচ্ছি যে, এই বাঁদিকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির আশায় মুক্ত করে দিলাম। লোকেরা বলল, আপনি মাত্র এক থাপ্পরের কারণে বাঁদি আজাদ করে দিচ্ছেন, অথচ আপনার হাতের কাছে সেবা করার মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তিনি বললেন, আরে! ছেড়ে দাও! হতে পারে, হিসেব নিকেশ সমান সমান হয়ে যাবে। আমাদের উপর কারো কোনো হক থাকবে না এবং কারো উপর আমাদেরও কোনো অধিকার থাকবে না।

শেষ বয়সে তিনি সিরিয়ায় চলে আসেন। এখানকার এই "দরিয়া" এলাকাতেই বসবাস করতেন। তবে প্রায়শই জামে মসজিদের সওয়াব হাসিল করার জন্য দামেস্কে চলে যেতেন। তখন ছিলো হযরত মু'আবিয়া রা.-এর শাসনামল। তিনি প্রায় সময় তাঁর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে নসিহত দান করতেন। এমনকি কখনো কখনো তিনি শক্ত ভাষায় সতর্ক করতেন। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া রা. তাঁর প্রতিটি কথার মূল্যায়ন করতেন। লোকদেরকে বলতেন, তিনি কিছু বলতে চাইলে কখনো বাঁধা দেবে না।

হযরত হিযকীল আ.

ঐতিহাসিক বর্ণনামতে হযরত হিযকীল আ. ছিলেন হযরত মূসা আ.-এর তৃতীয় খলীফা। প্রথম খলিফা হচ্ছেন হযরত ইউশা আ.। দ্বিতীয় খলিফা হযরত কালিব ইবনে ইউহান্না আ.। আর তৃতীয় খলীফা হযরত হিযকীল আ.। বর্তমান বাইবেলের পুরাতন বিধান (Old testamend) -এর একটি সাহীফা তাঁর প্রতিই সম্পৃক্ত। কুরআনে কারীমের কোথাও তাঁর নাম উল্লেখ করা হয় নি। তবে কুরআনে কারীমের সূরা বাকারায় একটি ঘটনা নকল করা হয়েছে, যার ব্যাপারে বিভিন্ন ইসরাঈলী তাফসীরী বর্ণনার আলোকে অনুমেয় হয় যে, সেই ঘটনাটি হযরত হিযকীল আ.-এর ঘটনা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সহ অন্যান্য কয়েকজন থেকে বর্ণিত যে, একবার হযরত হিযকীল আ. বনী ইসরাঈলের একটি দলকে বললেন, অমুক শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে যাও! তখন মৃত্যুর ভয়ে ঐ লোকেরা পালিয়ে বেশ দূরের একটি উপত্যকায় এ কথা মনে করে থিতু হয়ে গেলো যে, এখন আমরা মৃত্যু হতে নিরাপদ হয়ে গেছি।

তাদের এই আচরণ আল্লাহ তাআলার পছন্দ হলো না। তিনি তাদের জান কবজ করার নির্দেশ দিলেন। তারা সবাই তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। সপ্তাহ খানেক পর হযরত হিযকীল আ. তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের এ অবস্থা দেখে তাঁর খুব আফসোস হলো। তিনি দু'আ করলেন, হে উভয় জাহানের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে মৃত্যুর আজাব থেকে পরিত্রাণ দিন। যাতে তাদের জীবন খোদ তাদের জন্য এবং অন্যদের জন্য উচিত শিক্ষা হতে পারে। আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করলেন। তারা নতুন করে জীবন ফিরে পেল। তাদের সেই নবজীবন সকলের জন্য হলো শিক্ষাপ্রদ। কুরআনুল কারীম সেই ঘটনার বর্ণনা এভাবে দিয়েছে–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

"আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো; অথচ তারা ছিলো হাজার সংখ্যক? তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, মরে যাও। এরপর তিনি তাদেরকে নবজীবন দান করলেন। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ লোকসকলের উপর দয়াপ্রবণ। অথচ অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।" -সূরা বাকারা : ২৪৩

নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ.

নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ. ইসলামের ইতিহাসের সেই কতিপয় শাসকবর্গের একজন, যিনি তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা, প্রজাবাৎসল্য, শৌর্য-বীরত্ব ও সুব্যবস্থাপনা দিয়ে খুলাফায়ে রাশেদার হারিয়ে যাওয়া সময়ের কথা

নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। আতাবুকি পরিবারের এই দৃঢ়চেতা মুজাহিদের গোটা যিন্দেগী ক্রসেডারদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে কেটে গিয়েছিলো। তিনি তার জীবনপণ সংগ্রামের মাধ্যমে কত বার যে জার্মানী, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য শক্তিগুলোর যাবতীয় আক্রমণ নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। এটি সেই সময়কার কথা, যখন সালজুকি শাসনের পতনযুগ সূচিত হচ্ছিলো। আব্বাসী খেলফত ও অভ্যন্তরীণ নানাবিধ বিশৃংখলার শিকার ছিলো। মুসলমানদের এই দূর্বলতা কাজে লাগিয়ে ইউরোপের বিধর্মী শক্তিগুলো মুসলিম জাহান গ্রাস করতে উদগ্রীব ছিলো। এমন চরম দুঃসময়ে সর্বপ্রথম নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ.-এর পিতা ইমামুদীন জঙ্গী রহ. এবং তার পর নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ. মুসলিম উম্মাহর মাঝে এক নতুন জাগরণ সৃষ্টি করেন। তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধের কাছে ইউরোপীয়দের সকল চক্রান্ত নিষ্ফল হয়।

নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ. -এর বিজয়াভিযান ও তাঁর অনন্য কৃতিত্ব সবিস্তারে বলতে গেলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হয়ে যাবে। এখানে সেই বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। তবে নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ.-এর সমসাময়িক বিগদ্ধ ঐতিহাসিক ও গুণী হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবনে আসীর জাযারী রহ. তাঁর লেখা ইতিহাস গ্রন্থ নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ.-এর শাসনামল সম্পর্কে যে সামষ্টিক পর্যালোচনা করেছেন, তা এখানে তুলে না ধরে পারছি না। আল্লামা ইবনে আছীর রহ. বলেন, আমি ইসলামী যুগের প্রথম যুগের শাসকবর্গ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল বাদশাহর ইতিহাস অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু একমাত্র খোলাফায়ে রাশেদীন ও হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. ছাড়া নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ. ছাড়া উত্তম কোনো শাসক অন্তত আমার চোখে পড়ে নি। তিনি ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতার বিস্তৃতি, জিহাদ, জুলুম ও অত্যাচারের মূল্যোৎপটন এবং ইবাদত, সাধনা, একান্ত খোদামুখিতা ও বদান্যতাকে জীবনের প্রতিপাদ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। দিন-রাত একাকার করে তিনি তাই নিয়ে পড়ে থাকতেন। যদি কোনো জাতির ইতিহাসে তিনি ও তাঁর জনকের মতো কেবল দু'জন শাসকই থেকে থাকেন, তাহলে সেই জাতির গৌরব করার জন্য তারাই যথেষ্ট। শুধু এটই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা এক ঘরানায় দু'জন সৃষ্টি করেছিলেন। তারা তাদের শাসিত

এলাকাগুলো থেকে সব ধরনের অবৈধ ট্যাক্স উঠিয়ে দিয়েছিলেন। একজন অত্যাচারিত ব্যক্তি সমাজের যে শ্রেণীরই হোক না কেন, তারা তার উপর পূর্ণ ইনসাফ করতেন। সরাসরি অত্যাচারিতের কাছ থেকে তার অভিযোগের কথা শুনতেন।

একবার জনৈক ব্যক্তি এসে কোনো এক জমিনের উপর মামলা দায়ের করলো। আদালতের সমন নিয়ে বার্তাবাহক এমন সময় সুলতানের কক্ষে এসে হাজির হন, যখন তিনি তার জনৈক সাথির সঙ্গে পোলে খেলছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান পিত্তনের সঙ্গে আদালতে হাজির হয়ে যান। অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, ওই জমিন এই বাদীপক্ষের নয়; বরং তার প্রকৃত মালিক সুলতান নিজেই। এ জন্য বিচারপতি সুলতানের পক্ষে রায় জানিয়ে দেন। রায়ের পর নূরুদ্দীন সেই বিতর্কিত স্থাবর সম্পত্তি নিজের পক্ষ থেকে বাদীকে দান করে দেন।

দেশ শাসনের সিংহাসনে হাজারো মানুষ বসেছে এবং এক সময় বিদায় নিয়েছে। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম হবে, যারা এই সিংহাসন নিজের পরকাল প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে এবং নিজের কৃতকর্মের ভিত্তিতে অমরত্ব লাভ করেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা নূরুদ্দীন রহ. -এর বিদেহী আত্মার উপর তাঁর সীমাহীন রহমত বর্ষণ করুন। তাঁর মাজারে হাজির হওয়ার সময় বুকের ভেতর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার যে ঝড় উঠেছিলো, তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

তাবুক যুদ্ধ

নবী করীম সা. তাঁর গোটা জীবনে যতগুলো সফর করেছিলেন; সেগুলোর মধ্যে সম্ভবত তাবুকের সফরটিই ছিলো সবচেয়ে বেশি কষ্টকর ও পীড়াদায়ক। এই যুদ্ধ সংঘঠিত হওয়ার কারণ হলো, ৯ম হিজরিতে আরবের স্থানীয় খ্রিস্টানরা রোমের বাদশাহ হেরাক্লিয়াসের কাছে এই মর্মে চিঠি লিখলো যে, মুহাম্মাদ ইন্তেকাল করেছেন (আল্লাহ ক্ষমা করুন)। সারা দেশে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। অনাহারে অর্ধাহারে ওখানকার লোকেরা চরম মানবেতন জীবন অতিবাহিত করছে। কাজেই আরবের উপর আক্রমণ করার জন্য এটাই মোক্ষম সময়।

পত্র হাতে পেয়েই হেরাক্লিয়াস রণ প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ দিলো। মহারাজার নির্দেশ পেয়ে চল্লিশ হাজার সেনা-সদস্যের একটি চৌকস যুদ্ধবাজ সেনাদল মহাসমারোহে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল।

অন্যদিকে সিরিয়ার নিবতি বংশের কিছু ব্যবসায়ী যয়তুন বিক্রি করার জন্য প্রায় সময় মদিনা মুনাওয়ারা যাতায়াত করতো। তাঁরা মুসলমানদের কাছে এই সংবাদ ফাঁস করে দিল যে, তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য হেরাক্লিয়াস একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করছে। তাদের অগ্রবর্তী দল ইতোমধ্যে বালকা নগরীতে পৌঁছে গেছে। হেরাক্লিয়াস তার সৈন্য দলকে এক বছরের অগ্রীম ভাতাও বণ্টন করে দিয়েছে। নবী সা. উক্ত সংবাদ পাওয়ার পর নিজে তাবুকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ জানিয়ে দেন।

সময়টি ছিলো সাহাবায়ে কেরামের জন্য কঠিন পরীক্ষার চরম মুহূর্ত। একদিকে রোমের মত তৎকালীন সময়ের বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। দ্বিতীয়ত এ সময় আরবের প্রান্তগুলো মারাত্মক আকারে তেতে থাকে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হতো যে, আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি ঝরছে আর জমিন আগুন উৎপাদন করছে। সেই প্রচণ্ড তাপদাহের মধ্য দিয়ে আট শো কিলোমিটারের দীঘ পাতা-লতাহীন রুক্ষ প্রান্তর পাড়ি দিতে হবে। অথচ বাহনের তীব্র সংকট চলছে। লোকজনের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো নয়। অন্যদিকে মদিনা মুনাওয়ারার খেজুর গাছগুলোতে ফল পাকতে শুরু করেছে। গোটা এক বছরের পরিশ্রমের ফলন হিসেবে খেজুর গাছ থেকে খেজুর আহরণের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আগামী এক বছরের জীবিকা এই ফলগুলোর উপর নির্ভর করছে। এরূপ পরিস্থিতিতে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে সফরে বেরিয়ে পড়ার অর্থ হলো, পূর্বের অর্থনৈতিক সংকটকে আরো তীব্র করে তোলা। কিন্তু নবী করীম সা. ও তাঁর সহচরবৃন্দের ঈমানী স্পৃহা এতটাই হিমালয়চুম্বী ছিলো যে, এ ধরনের নানাবিধ সংকটের ভেতর দিয়ে চরম বিপদসংকুল পথে পা নামিয়ে দিলেন। এ সফরে নবী করীম সা.-এর অনেকগুলো মু'জেযা প্রকাশ পেয়েছিল। অবশেষে তারা তাবুকে এসে তাঁবু ফেলেন।

নবী করীম সা. তাবুকে বিশ দিন অবস্থান করেন। কিন্তু হেরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে লড়াই করার জন্য কারো টিকি পর্যন্ত দেখা গেলো না। বাহ্যত যদিও

যুদ্ধ হয় নি; তবে রাসুল সা.-এর এতো ত্যাগ স্বীকার করে এখানে আসার মাধ্যমে ইসলামের বিজয়াভিযানের একটি নতুন দিগন্ত খুলে গেলো। শত্রুদের উপর মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণে বেড়ে গেলো। এখন আশপাশের বংশগুলোর নিজেরাই দলে দলে এসে ধরণা দিতে শুরু করল। স্বপ্রণোদিত হয়ে নবীজীর আনুগত্য স্বীকার করতে লাগলো, রোমের নিকটবর্তী এই সিরিয় ভূখণ্ডের "জারইয়া", "ইযরা" ও "ইলা" নগরগুলোর গভর্নরেরা সন্ধির প্রস্তবনা নিয়ে নবীজীর দরবারে হাজির হতে শুরু করলো। তারা স্বেচ্ছায় জিযইয়া প্রদানে সম্মত হলো। তখন নবীজী তাদেরকে সন্ধিনামা লিখে দিলেন।

এখান থেকে নবী করীম সা. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে চার শো সেনাদলের একটি বাহিনীসহ দুমাতুল জান্দাল অভিমুখে প্রেরণ করলেন। তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নর উকায়ডির এলাকাটি শাসন করতো। নবী করীম সা. হযরত খালেদকে পাঠানোর সময় নিদের্শনা দিয়ে বলেছিলেন, তুমি যখন দুমাতুল জান্দাল পৌছবে, তখন সেখানকার গভর্ণর উকায়ডিরকে শিকার করা অবস্থায় পাবে। তোমরা তাকে হত্যা না করে বন্দি করে আমার কাছে নিয়ে আসবে। সেমতে হযরত খালেদ রা. যখন দুমাতুল জান্দালের কেল্লার কাছাকাছি পৌছেন, সে সময় উকায়ডির গ্রীস্মের পূর্ণিমা রাতে কেল্লার প্রাচীরের উপর স্ত্রীকে নিয়ে গান শুনছিলো।

হঠাৎ সে দেখতে পেলো যে, একটি নীলগাভী কেল্লার ফটকের সঙ্গে অনবরত শিং দিয়ে আঘাত হানছে। উকায়ডির তৎক্ষণাৎ তার ভাই ও সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে শিকার করার জন্য কেল্লা থেকে নেমে এলো। একটি ঘোড়ার উপর চড়ে সেই নীল গাভীর পেছনে ছুটলো। ওদিকে হযরত খালেদ রা. এসে পড়লেন। ধস্তাধস্তির সময় তার ভাই হিসান মারা গেলো। হযরত খালেদ রা. উকায়ডির-কে গ্রেফতার করে রাসূল সা. -এর কাছে নিয়ে এলেন। উকায়ডির নবী করীম সা. -এর সঙ্গে দুই হাজার উট, আটশ ঘোড়া, চারশ লোহবর্ম ও চারশ বর্শা দেওয়ার অঙ্গীকার করে সন্ধি করলো। এভাবে সে জিযইয়া আদায় করে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করলো।

মুতা যুদ্ধ

অষ্টম হিজরিতে মুতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনা হলো, নবী করীম সা. তাঁর সহচর হযরত হারেস ইবনে উমায়ের আযাদী রা.-কে বসরা (শাম) -এর রাজার নিকট ইসলামের আহ্বান সম্বলিত একটি চিঠি দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বসরা পৌছানোর পূর্বেই রাস্তা থেকে শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী তাঁকে গ্রেফতার করে বসরার গভর্নরের সামনে উপস্থিত করে এবং অন্যায়ভাবে সে তাঁকে হত্যা করে। নবী করীম সা.-এর একমাত্র দূত, যাকে এভাবে শহীদ করা হয়।

নবী করীশ সা. যখন এই দুর্ঘটনার সংবাদ পান, খুবই মর্মাহত হন। সে যুগেই দূত হত্যা করাকে আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মানবতা বিরোধী ও নিকৃষ্টতম বিশ্বাস ঘাতকতা মনে করা হতো। এবং এটাকে যুদ্ধ ঘোষণার সর্বনিম্ন পদ্ধতি মনে করা হতো। যদিও তখন মুসলমানগণ নানাবিধ সমস্যা জর্জরিত ছিল। এখনো মক্কা মুকাররামা বিজিত হয় নি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সিরিয়া ও রোমের মত দু'টি বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়ে নতুন একটি বিপদজনক যুদ্ধ ক্ষেত্র সূচিত করা কোনো ভাবেই সহজ ছিলো না। কিন্তু একজন সাহাবী তাও আবার দূত, তাকে এমনভাবে বিনা কারণে শহীদ করে দেওয়া হবে, আর নবীজী নির্বিকার বসে থাকবেন, তা কোনো ভাবেই সম্ভব ছিলো না। নবীজী সা. সে প্রেক্ষাপট সামনে রেখে সাহাবায়ে কেরামকে একত্র করে তাদেরকে সেই দুঃসংবাদ জানিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করে তাঁর নেতৃত্ব প্রিয় পালকপুত্র হযরত যায়দ ইবনে হারেসা রা.-এর হাতে ন্যস্ত করেন। যুগপৎ এ নির্দেশনাও জানিয়ে দেন যে, যদি যায়দ ইবনে হারেসা রা. শহীদ হয়ে যান, তাহলে নবীজীর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবূ তালেব রা. কে আমীর মেনে নেবে। যদি সেও শাহাদাতা বরণ করেন, তাহলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-কে সেনাপ্রধান ঘোষণা করে দেবে। যদি সেও শহীদ হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানরা নিজেরা পরামর্শ করে যাকে ইচ্ছা আমীর নিযুক্ত করবে।

নবী করীম সা.-এর এক জনের পর এক জন করে এক সঙ্গে তিন আমীরের নাম জানিয়ে দেওয়া ছিলো একটি অস্বাভাবিক বিষয়। বাহাত

এর মাধ্যমে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই তিন মহান ব্যক্তিত্বকে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করতে হবে। বর্ণিত আছে, তখন এক ইহুদি কান পেতে নবীজী সা.-এর কথা শুনছিলো। সে হযরত যায়দ ইবনে হারেসা রা.-কে বললো, আমাদের বনী ইসরাঈলের বংশে এ কথাটি প্রসিদ্ধ যে, যখন কোনো নবী কোনো অভিযানে পাঠানোর সময় একজনের পর একজন করে করে কয়েকজনের নাম চূড়ান্ত করে বলেন যে, যদি অমুক শহীদ হয়, তবে এমনটা করবে, তাহলে তিনি নিশ্চিত শহীদ হবেন। কাজেই হে যায়দ! যদি মুহাম্মাদ সা. বাস্তবেই নবী হয়ে থাকেন, তাহলে আর তিনি তার কাছে ফিরে আসবে না।

ইহুদি মনে করছিলো, তার এ কথা শুনে হযরত যায়দ সম্ভবত ভয় পেয়ে যাবেন। কিন্তু হযরত যায়দ রা. দৃঢ়তার সাথে বললেন, তুমি শুনে নাও। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি সত্য ও পূত পবিত্র নবী।

নবী করীম সা. নিজ হাতে হযরত যায়দ ইবনে হারেসা রা.-এর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিলেন। তিন হাজার সাহাবায়ে কেরামের এই কাফেলা মদিনা হতে যাত্রা শুরু করল। নবী করীম সা. নিজেই মদিনা মুনাওয়ারার স্থানীয় লোকদের বেশ বড় একটি দল সঙ্গে তিনি তাদেরকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে "সানিয়াতুল বিদা" পর্যন্ত গেলেন। সেখান থেকে কাফেলা যখন রওয়ানা হলো, তখন তারা দু'আ করল–

"صحبكم الله ودفع عنكم، ورد عنكم الينا صالحين غانمين"

"আল্লাহ তোমাদের সাথি হন। তিনি তোমাদের সব বিপদাপদ দূর করে দেন। তিনি তোমাদেরকে নিরাপদে সফল করে ফিরিয়ে আনুন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী কবি ছিলেন। তিনি নবীজী সা.-এর কণ্ঠে উক্ত বাক্য শুনে তৎক্ষণাৎ এ কবিতা রচনা করেন,

لكني أسأل الرحمن مغفرةً ÷ وضربة ذات فزع تقذف الزبدا

أوطعنة بيدي حران مجهزة ÷ بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا

حتى يقولوا اذا مرو على جثي ÷ أرشده الله من غازٍ وقد رشدا

আমি তো চাইবো খোদার কাছে অমির এমন হাত
চিরে যাবে আমার দেহের ভেতর উথলে রক্তপাত"
কিবা এসে কোনো উগ্র কাফের ছুঁড়বে সূচালো বর্শা
কলিজা-আঁতড়ি সব হবে পার, ছুটবে খুনের বর্ষা"
মৃত্যুর পর আসবে লোকেরা আমার গোরের কাছে
বলবে তখন এই সে গাজি, মঞ্জিলে পৌছে গেছে।

এভাবে মনের ভেতর শাহাদাতের তীব্র স্পৃহা লালন করে পূণ্য পথে যাত্রী দল সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তারা মনে করছিলেন, সংঘাত হবে বসরার গভর্নরের সঙ্গে। বাহ্যত এমন কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না যে, মাত্র তিন হাজার সদস্যের এই প্রতিশোধমূলক হামলাকে রোমের মত সুপার পাওয়ার শক্তি পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে গোটা বাহিনীকে ময়দানে নামিয়ে দিবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন জর্ডানের "মাআন" নামক এলাকায় পৌছেন, তখন তারা সংবাদ পান যে, রোমের রাজা হেরাক্লিয়াস এক লাখ সৈন্যের বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে নিজেই রওয়ানা হয়েছে এবং বর্তমানে "মা'আন" নামক স্থানে এসে পৌছে গেছে। এ ছাড়াও লাকহাম, জুযাম, কায়ন ও বাহরা ইত্যাদি বংশের লোকেরা আরো এক লাখ সদস্য তাদের সহযোগীতার জন্য সরবরাহ করেছে। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদের সারাংশ হলো, এমন তিন হাজার সদস্যের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাফেলাকে দুই লাখ স্বশস্ত্র সৈন্যের মোকাবেলা করতে হবে।

প্রতিকূল পরিস্থিতি তাঁদের নতুন করে পরমার্শ ও চিন্তা করার প্রয়োজন পড়লো। সাহাবায়ে কেরাম সেই মা'আন নগরীতে অবস্থান করে একটু পরমার্শ সভার আয়োজন করলেন। অনেকেই পরামর্শ দিলেন যে, যেহেতু উদ্ভূত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমাদের করোরই এমন ধারণা ছিল না, কাজেই এ মুহূর্তে নবীজী সা.-কে বর্তমান পরিস্থিতি জানানো দরকার। হতে পারে এ সংবাদ শুনে তিনি আমাদের সহযোগিতার জন্য অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করবেন অথবা অন্য কোনো নির্দেশনা জারি করবেন।

বাহ্যত তাদের এই অভিমত যৌক্তিক। বাহ্যিক সরঞ্জামনির্ভর রণকৌশলের বিচারে এ অভিমত শতভাগ বিবেচ্য। অনেক সাহাবায়ে কেরাম এই রায়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। কিন্তু ততক্ষণে সেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

রাওয়াহা রা. দাঁড়িয়ে সেই জ্বালাময়ী ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যা ইতিহাসের পাতায় সোনালী বর্ণে চিরকাল লেখা থাকবে। তিনি বলেন, "হে আমার জাতি! আজ তোমরা যা দেখে ঘাবড়ে গেছো, খোদার কসম! এটি তো সেই জিনিস, যার সন্ধানে তোমরা মাতৃভূমি থেকে বেরিয়ে ছিলে। আর সেটি হলো শাহাদত। স্মরণ রেখো! আমরা যখনই কোনো যুদ্ধে লড়েছি, কোনো সংখ্যাধিক্যের উপর লড়িনি। অস্ত্র বা ঘোড়ার শক্তিতে বালিয়ান হয়ে লড়িনি। আমি বদর প্রান্তরে লড়েছি। খোদার কসম! আমাদের কাছে তখন মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। আমি ওহুদ যুদ্ধেও লড়েছি। আমাদের কাছে তখন একটি মাত্র ঘোড়া ছিল। হ্যাঁ, আমরা সবসময় যে ভিত্তির ওপর লড়েছি, সেটি হলো, আমাদের এই দীন, আল্লাহ যা দিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন। কাজেই আমি তোমাদের কাছে আবেদন করবো, আগে বলো, দুই সৌভাগ্যের মধ্য হতে একটি সৌভাগ্য তো অবশ্যই তোমাদের ভাগ্যে ধরা হবে। হয়তো তোমারা শত্রুদের উপর বিজয়ী হবে। যার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার পূরণ করবেন। যা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। অথবা তোমরা শহীদ হয়ে জান্নাতের বাগ-বাগিচায় তোমাদের ভাইদের সঙ্গে মিলিত হবে।

এরপর আর কি চাই? সকল সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাতের উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হলেন। 'মা'আন" থেকে রওয়ানা হয়ে প্রথমে 'মাশারিফ' এবং এরপর 'মুতা'-এ পৌছুলেন। এই মুতা প্রান্তরেই সেই তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের মাঝপথে হযরত যায়দ ইবনে হারেসা রা. শাহাদত বরণ করেন। তখন নবী করীম সা. -এর নির্দেশনা অনুযায়ী হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালেব রা. ঝাণ্ডা তুলে ধরেন। প্রচণ্ড আক্রমণ হিসেবে চারদিক থেকে বৃষ্টির মত বর্ষা ও তীর এসে পড়ছিল। হযরত জা'ফর রা.-এর পক্ষে ঘোড়ার উপর বসে থাকা কঠিন হয়ে পড়ল। যার কারণে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পদব্রজে দুশমনদের কাতারের ভেতরে ঢুকে গেলেন। তিনি ডান হাত দিয়ে ঝাণ্ডা তুলে ধরে রেখেছিলেন। শত্রু পক্ষের একজন ডান হাতের উপর আক্রমণ করে বসল। শরীর থেকে ডান হাত কেটে মাটিতে পড়ে গেল। হযরত জা'ফর রা. বাম হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে নিলেন। আরেকজন

এসে সেই বাম হাতের উপর আক্রমণ করলো। এই হাতও কেটে মাটিতে পড়ে গেল। শরীরে প্রাণ থাকতে সেই ঝাণ্ডা মাটিতে পড়ে যাবে, হযরত জা'ফর রা. -এর কাছে তা ছিল অসম্ভব। তিনি সেইস কেটে যাওয়া বাহু দিয়ে চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর উপর তৃতীয় আক্রমণ তাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, আমরা যখন যুদ্ধ শেষে তাঁর লাশ উঠিয়ে দেখি, তখন তাঁর দেহে বর্ষা ও তরবারির ৫০টি আঘাত গণনা করি। একটি আঘাতও তাঁর পিঠে পড়েনি। মহান আল্লাহ আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকেও তুষ্ট করে দিন।

নবী করীম সা. নির্দেশিত বিন্যাস অনুযায়ী এখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এর পালা। তিনি এসে পতাকা তুলে নিলেন। এগিয়ে গেলেন শত্রুদের দিকে। অনেকদিন যাবত তাঁর পেটে কোনো দানা পানি পড়ছিলো না। যার কারণে প্রচণ্ড ক্ষুধার ফলে চেহারার উপর দুর্বলতার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। তাঁর জনৈক চাচাত ভাই তাঁর এই অবস্থা দেখে কয়েক টুকরো গোশত জোগাড় করে এসে পেশ করে বললেন, অনেকদিন যাবত আপনার উপর সাংঘাতিক ধকল যাচ্ছে। কাজেই এগুলো খেয়ে নিন। যাতে কমপক্ষে আপনি আপনার পেট সোজা রাখতে পারেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. তাঁর হাত থেকে গোশত নিয়ে সবেমাত্র খেতে শুরু করেছেন। হঠাৎ রণাঙ্গনের এক প্রান্ত থেকে মুসলমানদের উপর কঠিন আক্রমণের শব্দ ভেসে আসল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, এ অবস্থায় তুমি দুনিয়ার কাজে লেগে আছো? এ কথা বলে তিনি গোশত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তরবারি হাতে তুলে নিয়ে দুশমনদের সারিতে ঢুকে পড়লেন। মৃত্যুর ভয় উপেক্ষা করে ক্রমাগত লড়ে অবশেষে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। হে আল্লাহ! আপনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করে দিন।

এই তিন সেনাপতির পর কী হবে? নবী করীম সা. তার ব্যাপারে কোনো কিছু বলেন নি বরং মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন হযরত সাবেত ইবনে আকরাম রা. মাটি থেকে ঝাণ্ডা তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা

সর্বসম্মতিতে কাউকে আমীর বানিয়ে নাও! লোকেরা বললো, পরামর্শের কী প্রয়োজন? আপনিই আমীর হয়ে যান। হযরত সাবেত ইবনে আকরাম রা. তাদের কথায় সায় দিলেন না। অবশেষে মুসলমানগণ সর্বসম্মত হয়ে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. কে আমীর মেনে নিলেন। হযরত সাবেত রা. তাঁর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিলেন। হযরত খালেদ রা. জীবনের মায়া ভূলে মরণপণ আক্রমণ করলেন। ইতিহাসে পাওয়া যায় ,এ দিন তাঁর হাতে ৯টি তরবারি ভেঙ্গে যায়। অবশেষে মহান আল্লাহর রহমতে বিজয় এসে মুসলমানদের পদতলে ধরা দেয়। হযরত খালেদ রা. মুসলমান বাহিনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালেব রা. -এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমাউস রা. বলেন, যুদ্ধের দিনগুলোতে আমি বাড়িতে ছিলাম। আমি আমার সন্তানদেরকে ভালোভাবে গোসল করিয়ে প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। ইত্যবসরে নবী করীম সা. আমার ঘরে এলেন। তিনি বাচ্চাদেরকে ডাকলেন। ওদেরকে গলায় জড়িয়ে আদর সোহাগ করতে লাগলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, নবীজী সা.-এর দু'চোখে অশ্রু চিকচিক করছে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনি কাঁদছেন কেন? জাফর ও তাঁর সাথীদের ব্যাপারে কোনো সংবাদ এসেছে কি? নবীজী সা. বললেন, আজ সে শাহাদত বরণ করেছে।

হযরত আসমা রা. বলেন, সে কথা শুনে আমার মুখ দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে এলো। মহিলারা আমার চার পাশে একত্র হতে লাগল। নবী করীম সা. বাইরে বেরিয়ে গেলেন। নিজ গৃহে গিয়ে বললেন, জা'ফরের ঘরের লোকদের জন্য খাবার বানিয়ে পাঠিয়ে দাও।

নবী করীম সা. সে সময় এ সংবাদও দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে জা'ফরকে তাঁর দু'হাতের এমন বাহু দান করেছেন, যা দিয়ে সে যেখানে ইচ্ছে উড়ে যেতে পারে। তখন থেকে হযরত জা'ফর রা. -এর উপাধি হয়ে যায় 'তাইয়ার' (উড়ন্ত)। পরবর্তীতে তিনি সেই উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

হযরত জা'ফর তাইয়ার রা.

হযরত জা'ফর রা. হযরত আলী রা.-এর বড় ভাই ছিলেন। বয়সে তিনি ১০ বছর বড় ছিলেন। গঠন আকৃতিতে নবী সা. -এর সাথে তাঁর খুব সাদৃশ্য ছিল। একবার হুযূর সা. তাঁকে সম্বোধন করে বললেন–

أشبهت خلقي و خلقي

"চেহারা-চরিত্র উভয় দিক থেকে আমার সাথে তোমার মিল রয়েছে।" [বুখারী, মুসলিম]

হযরত জা'ফর রা. গরীব লোকদের খুব ভালোবাসতেন। গরীব অসহায় লোকদের খুব সহযোগিতা করতেন। তাঁই তাঁর উপাধি أبو المساكين (আবুল মাসাকিন) প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলতেন, রাসূল সা.-এর পর হযরত জা'ফর রা. সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন এবং তিনিই বাদশা নাজাশীর দরবারে সেই ঐতিহাসিক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে বাদশা নাজাশী মুসলমান হয়ে ছিল। পরবর্তীতে যখন তিনি আবিসিনিয়া থেকে যখন খায়বর যুদ্ধে আগমন করেন, তখন রাসূল সা. বাইরে এসে তাঁকে সংবর্ধনা জানান, এবং কপালে চুমু দেন। এটি ৭ম হিজরির ঘটনা। পরবর্তী বছরই 'মুতা' যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যে যুদ্ধে তাঁর আত্মবিসর্জন মূলক বীরত্ব ও শাহাদাতের বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে।

আলেকজেন্দ্রিয়ার বিজয়

মৌলিকভাবে আজ যেখানে কায়রো নগরী অবস্থিত, ইতিহাসের ধারাবাবাহিকতায় এখানে তিন তিনটি জনপদ গড়ে ওঠেছিল। হযরত মূসা আ.-এর যুগে বর্তমান কায়রোর পশ্চিম এলাকাটি ফারাও সম্রাটদের রাজধানী ছিলো। সে সময় শহরটিকে "মানফু" বলা হতো। নীল নদের পশ্চিম প্রান্তে সেই জনপদ আবাদ ছিলো। সেই জায়গাটিকে এখন "জিযাহ" বলা হয়। মিশরের পিরামিটগুলো এখানেই অবস্থিত। মানফুর সেই নগরীটি কয়েকশ বছর আবাদ ছিলো। পরবর্তীকালে বুখতে নছরের নেতৃত্বে এখানে ব্যাপক লুটতরাজ ও ধ্বংসজ্ঞ চালানো হয়। যার ফরে সেটি জনমানব শূন্য বিরান হয়ে যায়।

পরবর্তী কালে যখন সিকেন্দার মাকদুনী মিশর জয় করেন, তখন তিনি এই এলাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে রোম সাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় স্থানান্তর করেন। সেখানে তিনি একটি নতুন নগরী গড়ে তুলেন। তার দিকে সম্বন্বিত করে এখনো সেই নগরীটিকে আলেকজান্দ্রিয়া বলা হয়। এই আলেকজান্দ্রিয়া নগরীও কয়েকশ বছর মিশরের রাজধানী ছিল। যখন হযরত ওমর ফারুক রা.-এর শাসনামলে হযরত আমর ইবনে আস রা. মিশরে আক্রমণ করেন, তখনও মুকাওকিসের রাজধানী এ আলেকজান্দ্রিয়াতেই ছিল। আজ যেখানে কায়রো শহর অবস্থিত, সেখানে কোনো বড় শহর ছিল না। এটি ছিল একটি সেনা কেল্লা। বহিরাগত আক্রমণকারীদের আগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য সেই কেল্লাটি নির্মাণ করা হয়েছিল। হযরত আমর ইবনে আস রা. ও তাঁর সহযোদ্ধাগণ মিশরের কয়েকটি প্রাথমিক এলাকা জয় করার পর সেই কেল্লা অবরোধ করেন। ছয় মাস পর্যন্ত তারা কেল্লা অবরোধ করে রাখেন। এই দীর্ঘ সময় তারা কেল্লার উপর উঠার কোনো পথ খুঁজে পান নি। অবশেষে ছয় মাস কেঁটে যাওয়ার পর হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা. কেল্লার একাংশে পা রাখার মত সামান্য ফোকর খুঁজে বের করেন। তখন তিনি কেল্লার সেই অংশে একটি মই স্থাপন করে সাথীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

"إني أهب نفسي لله عز وجل

فمن شاء أن يتبعني فليفعل"

"আমি আমার প্রাণ আল্লাহকে উপহার দিচ্ছি। তোমাদের কেউ আমার পিছনে আসতে চাইলে আসতে পারে।"

এ কথা বলে হযরত যুবায়ের রা. মই দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করলেন। তখন তাঁর পিছনে আরো অনেকে মই দিয়ে চড়তে লাগল। এক পর্যায়ে হযরত যুবাইর রা. সবার আগে কেল্লার প্রাচীরের উপরে পৌছে যান। তখন অন্যদেরও মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারাও আরো অনেকগুলো মই স্থাপন করে উপরে ওঠতে শুরু করেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয় দান করেন।

রাজা মুকাওকিস তখন পালিয়ে জাযিরার কেল্লায় আশ্রয় নেয়। আল্লামা হামাভী রহ. লিখেন, হযরত যুবায়ের রা. কেল্লায় ওঠার জন্য যে মই

ব্যবহার করেছিলেন, সেটি ৩৯০ হিজরি পর্যন্ত ওরদান বাজারের একটি ঘরে সংরক্ষিত ছিলো। পরবর্তীকালে একটি অগ্নিকাণ্ডে সেটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। -[মু'জামুল বুলদান লিল হামাভী : ১৪/২৬২ দ্রষ্টব্য : কুসতাত]

আলেকজেন্দ্রিয়া বিজয় করতে ছয় মাস লেগে গেল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করলেন। হযরত আমর ইবনে আস রা. আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে অবস্থান করতে চাইলেন। খালিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুক রা. -এর কাছে অনুমতি চাইলেন। হযরত ওমর রা. তাঁর উত্তরে লিখলেন, মুসলমানগণ! তোমরা এমন কোনো স্থানকে অবস্থানস্থল বানিয়ো না, যেখানে আমার ও তোমাদের মাঝখানে কোনো নদী বা সাগর আড়াল হবে। হযরত আমর রা. দেখলেন, আলেকজেন্দ্রিয়াকে অবস্থাল বানালে সেই সমস্যা হবে, মাঝখানে জলজ আড়াল হবে। এ জন্য তিনি সহযোদ্ধাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, আমরা আমাদের অবস্থানের জন্য কোনো জায়গা নির্বাচন করবো? তখন কেই কেউ পরামর্শ দিলেন–

ترجع ايها الأمير إلى فسطاطك، فتكون على ماء وصحرًا

> "মহান আমীর! আমাদের সেই স্থানে ফেরা উচিত যেখানে আপনি আপনার ফুসতাত (তাঁবু) গেড়েছিলেন। সেখানে (নীল নদের) পানি আমাদের নাগালেই থাকবে এবং আমাদের অবস্থানও হবে প্রান্তরে।"

হযরত আমর ইবনে আস রা. সেই পরমার্শ গ্রহণ করলেন। তাঁবু স্থাপনের জায়গাটিতে ফিরে এলেন। তিনি মুসলমানদের জন্য এখানে একটি নগরীর গোড়াপত্তন করেন। সে সময় পর্যন্ত এই নগরীটির কোনো নাম রাখা হয় নি। যার কারণে কয়েকদিন পর্যন্ত ঠিকানা বলার জন্য লোকেরা সেই তাঁবুর উদ্ধৃতি দিত যে, আমার অবস্থানস্থল তাবুর ডান দিকে। কেউ বলত, আমি থাকি ফুসতাতের (তাবুর) ডাক দিকে। কেউ বলত, আমি থাকি (ফুসতাতের) তাবুর বাম দিকে। এভাবে চলতে চলতে জায়গাটি এক সময় ফুসতাত নামেই প্রসিদ্ধি পেয়ে যায়। এভাবে এই ফুসতাত নগরীটি মুসলমানদের রাজধানী হয়ে যায় এবং কয়েক শো শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম

সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্ররূপে ফুসতাত নগরী আলো ছড়াতে থাকে। এই নগরীটি নীল নদের পূর্ব দিকে আবাদ ছিলো।

হযরত থানবী রহ. ও হযরত মাদানী রহ.

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. বলেন, যদিও রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে হযরত থানবী রহ. -এর সাথে হযরত মাদানী রহ. -এর মতভেদ ছিল। কিন্তু হযরতের অন্তরে থানবী রহ.-এর প্রতি সম্মানবোধের মাঝে কোনো রকম ঘাটতি ছিল না। অধিকন্তু তিনি তাঁর সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। এক সময়ের কথা আমার খুব মনে পড়ছে, যখন উভয়ের মাঝে চরম মতভেদ চলছিল, তখন হযরত মাদানী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের কয়েকজন উস্তাদকে বললেন, অনেকদিন ধরে আমাদের থানা ভবন যাওয়া হচ্ছে না। হযরতের যিয়ারত করতে মন খুব চাইছে। সে মতে হযরত মাদানী রহ. দেওবন্দের কয়েকজন উস্তাদকে সাথে নিয়ে (যাদের মাঝে শায়খুল আদব হযরত ই'জায আলী সাহেব রহ.-এর নাম আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। অন্যদের নাম মনে পড়ছে না) থানাভবন রওয়ানা হলেন। ঘটনাক্রমে থানাভবন পৌছতে বেশ রাত হয়ে যায়। তারা যতক্ষণে খানকার গেটে পৌছলেন, ততক্ষণে খানকা বন্ধ হয়ে গেছে। যেহেতু তাদের জানা ছিল যে, হযরত থানবী রহ. খানকায় সময়ানুবর্তিতার পূর্ণ অনুসরণ করেন, এ জন্য তারা ভাবলেন, এ শৃংখলা ভঙ্গ করা ঠিক হবে না এবং হযরত থানবী রহ.-এর কাছে রাতে হাজির হয়ে তাঁকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা হযরত মাদানী রহ. কে পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ত্যাগ তিতিক্ষার জীবন যাপনে অভ্যস্ত বানিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যস! তিনি সাথিদেরকে সাথে নিয়ে খানকার গেটের সামনে চত্বরে শুয়ে পড়লেন।

হযরত থানবী রহ. ফজরের আজানেরর সময় যখন নিজ বাস ভবন থেকে খানকার দিকে আসছিলেন। তখন তিনি দেখলেন, কিছুলোক বাইরের চত্বরে ঘুমিয়ে আছে। অন্ধকারের কারণে তিনি তাদের চেহারা দেখতে পাচ্ছিলেন না। চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করলে সেও নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করে। তখন তিনি নিজেই কাছে গিয়ে দেখলেন, হযরত মাদানী রহ. ও হযরত শায়খুল আদব রহ.এর মত ব্যক্তিত্বরা মাটিতে শুয়ে আছে।

অকস্মাৎ তাঁদেরকে দেখতে পেয়ে হযরত থানবী রহ. তো খুশি হন, কিন্তু এমন অবস্থায় তাদের রাত্রি যাপন করতে দেখে যারপরনেই দুঃখ বোধ করেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! আপনারা কেন এখানে এভাবে শুয়ে গেলেন?

হযরত মাদানী রহ. বললেন, আমরা জানি, আপনার এখানে সবকিছুই নিয়মমাফিক চলে। খানকা তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। পরে তা খোলা হয় না।

হযরত থানবী রহ. বললেন, নিঃসন্দেহে খানকার নিয়ম এটাই। কিন্তু আমার গরীবখানা তো ছিল। আবার আপনাদের মত ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রে কিসের নিয়মাবর্তিতা।

হযরত মাদানী রহ. বললেন, আমরা আপনাকে এই রাত্রে কষ্ট দেয়া উচিত মনে করি নি।

অতঃপর তারা থানাভবনে এক দুই দিন থেকে ফিরে আসেন।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান এই ঘটনা শুনিয়ে বলতেন, এমন চরম মতনৈক্যের মুহূর্তেও এই সব বুযুর্গানে দীন কীভাবে সরলতা, আন্তরিকতা ও অকপটকতার সাথে একজন অপরজনের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। আল্লাহু আকবার! এমন লিল্লাহিয়াত এমন বিনম্রতার দৃষ্টান্ত কে দেখতে পারে?

ইংরেজিপড়ুয়াদের প্রতি ঘৃণা

হযরত থানবী রহ. সম্ভব একবার শিমলার কোনো এক কলেজে বয়ান করছিলেন। সেখানে তিনি তার আলোচনার ভেতরে একথাও বলেন, আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের অন্তরে যে সকল সংশয় সৃষ্টি হয়, তার কারণ শুধুমাত্র পাঠ্যসূচীর দুবর্লতাই নয়; বরং তার অনেক বড় এক কারণ হলো, সেই বেদীন পরিবশে; যার মাঝে আমাদের নতুন প্রজন্ম প্রতিপালিত হচ্ছে ও বেড়ে ওঠছে। এর চিকিৎসা হলো, বুযুর্গ ওলামা ও সালেহীনদের মজলিসসমূহ। আলহামদুলিল্লাহ! সবখানেই কিছু না কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে। কিছুদিন সেই পরিবেশে থাকার অভ্যাস করে নিতে হবে।

সম্ভবত সেই মজলিসের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আমরা শুনেছি, আপনি নাকি ইংরেজি পড়ুয়াদের দেখতে পারেন না? হযরত উত্তরে

বললেন,

ہرگز نہیں، ان لوگوں سے کوئی نفرت نہیں، البتہ انکے بعض اعمال وافعال سے نفرت ہے، جو شریعت کے خلاف ہے.

"আদৌ নয়। তাদের প্রতি আমার কোনো ঘৃণা নেই। হ্যাঁ, তাদের কিছু কর্মকাণ্ডের উপর আমার ঘৃণা আছে।"

সেই ব্যক্তি তখন বলল, সেই কর্মকাণ্ডগুলো কী? হযরত বলেন, সব তো আর এক রকম নয়।

বিভিন্ন লোকের মাঝে বিভিন্ন রকম কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। সে লোকটিও বেশ স্বাধীনচেতা ছিল। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, উদাহরণ স্বরূপ আমার মাঝে কী আছে বলুন? বর্তমান সময়ের মুক্ত মানসিকতার শিক্ষার্থীদের মত সে লোকটির মুখেও দাঁড়ি ছিল না। হযরত বললেন, কিছু বিষয় তো খোলা চোখেই ধরা পড়ে, কিন্তু লজ্জার কারণে সভার মাঝে সবার সামনে তা প্রকাশ করতে পারছি না। আর আপনার বাকি অবস্থা ও লেনদেন সম্পর্কে কিকরে বলি। সেগুলোতে আমার জানা নেই। এরপর সভা শেষ হলো এবং হযরত থানাভবন চলে এলেন।

এরপর সময় মতো সেই কলেজ বন্ধ হলো। সেখান থেকে হযরতের কাছে এক ছাত্রের চিঠি এলো। চিঠিতে লেখা ছিল, এখন আমাদের ছুটি চলছে। আপনার নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী কিছু দিন আপনার খেদমতে থাকতে চাই। কিন্তু আমার বাহ্যিক অবস্থা শরীয়ত সম্মত নয়। আর কথাবার্তার মাঝেও গড়বড়ি আছে। যদি এ ধরনের অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি থাকে, তাহলে আমি উপস্থিত হতে চাই।

হযরত জবাবে লিখলেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনি যে অবস্থায় থাকেন, চলে আসেন।

সেই ছাত্র এলো এবং নিবেদন করল, হযরত! আমার মনে কিছু প্রশ্ন আছে। সেগুলো আমি আপনার কাছে ব্যক্ত করে তার সমাধান জানতে চাই। হযরত বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু তার জন্য আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। কাজটি হলো, হযরতের মনে যত প্রশ্ন আছে, সবগুলো লিখে রাখবেন আর আমাদের মজলিসে আমাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে

শুনবেন। কোনো প্রশ্ন করবেন না। যখন আপনার অবস্থানের মেয়াদ থেকে তিন দিন অবশিষ্ট থাকবে, সে সময় আমাকে মনে করিয়ে দিবেন। তখন আমি আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য আলাদা একটি সময় দিবো। হযরত আরো বললেন, আপনি সে সকল প্রশ্ন লিখে রাখবেন। যদি এ সময়ের ভেতর কোনো প্রশ্নের জবাব আপনার বুঝে আসে, তাহলে তা কেটে দিবেন।

লোকটি কথামত কাজ করল। যখন তার বিদায়ের তিন-দিন পূর্বে তাকে প্রশ্ন করার সময় দিলেন; তখন সে বলল, হযরত! আমার প্রশ্নের তালিকা বেশ লম্বা ছিল। তবে এই অবস্থানের মাঝে অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর আমি নিজ থেকেই বুঝে গেছি। সেগুলোকে কেটে ফেলেছি। এখন শুধুমাত্র কয়েকটি প্রশ্ন বাকি আছে, যা আমি হযরতের কাছে পেশ করছি। হযরত থানবী রহ. সে সকল প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দিলেন এবং সে চিরদিনের জন্য প্রশান্ত হয়ে চলে গেল।

যেখানে যাও, সেখানে তোমরাই তো তোমরা

হাকীমুল উম্মাত মওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর ইলম ও ফজল জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া আর সূর্যকে প্রদীপ দেখানো একই কথা। হযরত ছাত্রজীবন থেকেই নিজস্ব প্রখর যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। ১৩০০ হিজরিতে যখন দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হন এবং সে বছর জামিয়া কর্তৃপক্ষ এক আড়ম্বরপূর্ণ বিশাল দস্তারবন্দি জলসা আয়োজন করে ফারেগ শিক্ষার্থীদেরকে সম্মানসূচক পাগড়ি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন হযরত থানবী রহ. সহপাঠিদেরকে নিয়ে হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী রহ.-এর খেদমতে হাজির হন এবং নিবেদন করেন- হযরত! আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আমাদেরকে পাগড়ি দেওয়া হবে এবং শিক্ষা সমাপনের সনদ দওয়া হবে। অথচ আমরা কোনোভাবেই তার যোগ্য নই। এ কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হোক। অন্যথায় এমনটি করা হলে জামিয়ার খুবই দুর্নাম হবে যে, এমন আযোগ্যদেরকে সনদ দেওয়া হয়েছে। হযরত নানুতবী রহ. এ কথা শুনে সোৎসাহে বললেন, তোমাদের

এ ধরনের ধারণা মোটেই ঠিক নয়। এখানে যেহেতু তোমাদের উস্তাদবৃন্দ রয়েছেন, সেহেতু তাদের সামনে তোমাদের ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটন হচ্ছে না। আর এমনই হওয়া উচিত। কিন্তু যখন তোমরা বাইরে যাবে, তখন তোমরা নিজেদের মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। যেখানে তো তোমরাই তোমরা। -[আশরাফুস সাওয়ানেহ : ১/৩২]

একটি বেহুদা চিঠির উত্তর

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর ওয়াজ ও নসিহতের মাধ্যমে এই উম্মতের যে দৃষ্টান্তহীন উপকার সাধিত হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। হযরতের ওয়াজের প্রতিক্রিয়া এখনো চলমান ও সম্মান ক্রিয়াশীল। যারা হযরতের সেই রচনাবলি অধ্যয়ন করেছেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এই সমস্ত দীনি আলোচনাগুলোর বৃহদাংশই ধর্মের আবশ্যিক বিষয়াবলি সম্পর্কিত ছিল। সমাজ সংস্কার ও আত্মবিনির্মাণের ক্ষেত্রে এগুলো এতটাই উপকারী যে, অন্য কোনো কিছু এগুলোর মত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না।

একবার জোনপুরে হযরতের ওয়াজ হচ্ছিল। সে এলাকায় বেরলভীদের বেশ প্রভাব ছিল। ওয়াজের মাঝপথে হযরতের কাছে একটি উড়োচিঠি আসে। যেখানে দু-চার কথা লেখা ছিল। একটি হলো, তুমি তাতি। দ্বিতীয়টি হলো, তুমি জাহেল। তৃতীয়টি হলো, তুমি কাফের। চতুর্থটি হলো, আত্মসংবরণ করে ওয়াজ করবে।

হযরত থানবী রহ. ওয়াজ শুরু করার পূর্বে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন, এ ধরনের একটি চিঠি আমার কাছে এসেছে। এরপর সেই চিঠি সবার সামনে পড়ে শুনালেন এবং বললেন, "এখানে লেখা আছে তুমি তাতি। আমি যদি তাতি হই, তাহলে সমস্যা কোথায়? আমি তো এখানে কারো সাথে আত্মীয়তা করতে আসি নি; বরং আল্লাহর বিধি-বিধান শুনাতে এসেছি। এর সাথে বংশ-গোত্রের কী সম্পর্ক?

দ্বিতীয় কথা হলো, এ বিষয়টি মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। আল্লাহ যাকে যে বংশে ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন। সব বংশই আল্লাহর সৃষ্টি। সবকিছুই ভালো যদি কীর্তি কলাপ ভালো হয়। এটি তো হলো মাসআলার বিশ্লেষণ। বাকি

থাকলো প্রকৃত অবস্থার বিশ্লেষণ। যদিও মাসআলা বিশ্লেষণের পর প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই। তারপরও যদি কারো মনে প্রকৃত অবস্থারও বিশ্লেষণ জানার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমি আমার জন্মভূমির সরদারের নাম-ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। তার কাছ থেকে যাচাই করে জেনে নিক, আমি কি তাতি, না অন্য কোনো বংশের সন্তান। আর যদি আমার উপর পূর্ণ আস্থা না থাকে, তাহলে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, আমি তাতি নই। বাকি থাকল, জাহেল হওয়ার বিষয়। আমি অবশ্যই স্বীকার করছি, আমি জাহেল; বরং বড় জাহেল। কিন্তু আমি আমার বুযুর্গদের কাছ থেকে যা শুনেছি এবং তাদের কিতাবাদির মাঝে যা পড়েছি; এখানে তার পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র। যদি কারো মনে হয়, আমি ভুল বলছি, তাহলে সে তার উপর আমল না করুক। তৃতীয় যে কথাটি কাফের হওয়া সম্পর্কে লেখা হয়েছে। এ নিয়ে বেশি আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাদের সামনেই পড়ে নিচ্ছি–

أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدًا رسول الله

আমি যদি নাউযুবিল্লাহ! কাফেরও হতাম, এখন তো তা না। শেষ কথা ছিল, বুঝে শুনে ওয়াজ করার ধমকি। এ সম্পর্কে আমার নিবেদন হলো, ওয়াজ করা আমার পেশা নয়। যখন কেউ খুব করে ধরে, তখন কিছু মুখে আসে, তাই ব্যক্ত করি। যদি আপনারা না চান, তাহলে আমি বয়ন করব না। বাকি থাকল, বুঝে শুনে ওয়াজ করার কথা। এ সম্পর্কে আমি পরিস্কারভাবে বলে দিচ্ছি, ঝগড়াঝাটি করা আমার অভ্যাসে নেই। ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে, অথবা কোনো দলের মনোকষ্টের কারণ হবে; এ ধরনের কথা আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কখনোই বলি না। কিন্তু যদি শরিয়তের মৌলনীতিসমূহের বিশ্লেষণের অধীনে কোনো এমন মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যার কোনো বেদআতী রুসমের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, তাহলে আমি তখন কারো বাঁধাই মানবো না। কেননা তা হবে সারাসরি দীনের মাঝে অসাধুতা বা আত্মসাৎ। এসব কথা শোনার পর এখন ওয়াজ সম্পর্কে আপনাদের যা অভিমত তা জানিয়ে দিন। যদি এ সময় কারো মেজাজের পরিপন্থি কোনো আলোচনা করে ফেলি, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে যেন আমাকে নিষেধ করে। আমি অঙ্গীকার

করছি, যদি কোনো অতি সাধারণ ব্যক্তিও আমাকে নিষেধ করে, তাহলে আমি সাথে সাথে আমার বয়ান বন্ধ করে দিয়ে বসে যাবো। ভালো হবে, যে ব্যক্তি আমাকে এই চিঠি দিয়েছে, সে যেন আমাকে নিষেধ করে দেয়। যদি তার নিজের বলতে লজ্জা হয়, অথবা সাহস না হয়, তাহলে সে যেন চুপিসারে অন্য কাউকে শিখিয়ে দেয়। সে এসে তার পক্ষ থেকে নিষেধ করে যাক। এ কথা শুনে সেখানকার এক প্রভাবশালী মানতেকী বেদআতী মৌলবী কর্কশ স্বরে বলে উঠলো, এ পত্র যে লিখেছে, সে নিঃসন্দেহে বেজন্ম। আপনি ওয়াজ করুন। আপনি কেমন ফারুকী?

হযরত বললেন, আমি স্থানের ফারুকী? যেখানকার ফারুকীদের এখানকার লোকেরা তাতি মনে করে।

যখন উপস্থিত সবাই চিঠির প্রেরককে ভৎর্সনা করতে শুরু করল। বিশেষ করে ঐ মৌলভী সাহেব অশ্লীল গালি-গালাজ করতে শুরু করল, হযরত তাকে নিষেধ করে বললেন, গালিগালাজ করতে যাবেন না। মসজিদের প্রতি তো সম্মান প্রদর্শন করুন।

এরপর হযরত ওয়াজ শুরু করলেন। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে শানদার ওয়াজ করলেন। ঘটনাচক্রে ওয়াজের মাঝখানে অনিচ্ছায় কোনো এক ইলমী বিশ্লেষণ করার সময় কতিপয় বেদআতী কর্মকাণ্ড ও প্রথার কথা এসে যায়। হযরত নিন্দুকের নিন্দাবাক্যের ভয় মাটি চাপা দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবে সেই বেদআতী রুসম রেওয়াজের কচুকাটা করলেন। হযরত তো পূর্ব থেকেই সবাইকে এই অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন, তারা চাইলেই ওয়াজ বন্ধ করে দিতে পারবে। কিন্তু কারো টু শব্দ করারও সাহস হলো না।

সেই প্রভাবশালী মানতেকী বেদআতী মৌলবী সাহেব প্রথম দিকে বয়ানের খুব প্রশংসা করতে লাগল। কথায় কথায় উচ্চস্বরে 'সুবহানাল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' -এর ধুয়া তুলতে লাগল। কেননা হযরত তখন তাসাওউফ নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করছিলেন। কিন্তু যখন বিদআত নির্মূল শুরু হল, তখন সে চুপচাপ বসে থেকে ওয়াজ শুনতে লাগল। এটিও আল্লাহ তা'আলার ইহসান ছিল। কেননা পরে জানা গেছে, সেই ব্যক্তি এতটাই কট্টোর ও উগ্রপন্থী ছিলো যে, যদি কেউ তার রুচিবিরুদ্ধ কোনো কথা বলে

ফেলে, তাহলে সে সাথে সাথে উঠে তার হাত ধরে তাকে মিম্বার থেকে উঠিয়ে দিত। কিন্তু এ সময় কোনো কথা বলে নি। একদম চুপ মেরে ওয়াজ শুনে গেছে।

ওয়াজ শেষ হওয়ার পর যখন সুধীমণ্ডলী ওঠতে শুরু করল, তখন সেই মৌলবী সাহেব হযরত থানবী রা.-কে বলল, এই সব মাসআলা নিয়ে আলোচনা করার কী দরকার ছিল? এ সময় অন্য এক আলেম (নিজেও বেদআতী মানসিকতার ছিল) এগিয়ে এসে তার জবাব দিতে উদ্যত হল। কিন্তু হযরত তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাকে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই আমাকে বলতে দিন। এরপর সেই মানতেকী মৌলবীকে বললেন, আপনি আমাকে এ কথা আরো আগে কেন বললেন না। তাহলে আমি আরো সচেতন হয়ে যেতাম। আমি তো যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, সেগুলোকে দরকারী মনে করেই বলেছি, কিন্তু এখন কী আর করা যাবে? বয়ান তো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটি সূরত এখনো বাকী আছে। তা হলো, এখনো বেশ ক'জন শ্রোতা উপস্থিত আছে। আপনি উচ্চ স্বরে তাদেরকে বলে দিন, ভায়েরা! এই কথাগুলোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি আপনার এই ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণও করব না। আপনার সেই কথাগুলো হবে শেষ কথা।

এ কথা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে ফেলল। অবস্থা বেগতি দেখে মৌলবী সাহেব কেটে পড়ল। তার এভাবে প্রস্থানের পর সবাই তার সমালোচনা করতে লাগলেন। যখন বেশ শোরগোল শুরু হল, তখন হযরত দাঁড়িয়ে ওঠে বললেন, ভায়েরা! এক বিদেশীর কারণে আপনারা স্থানীয় আলেমদেরকে পরিত্যাগ করবেন না। আমি আজ "মাছলী" শহর চলে যাচ্ছি। এখন আপনারা এক কাজ করুন এবং যিনি আমাকে এই উড়োচিঠি দিয়েছেন, আমি তাকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে বলছি, সে যেন আমার এই ওয়াজের প্রতিবাদ করে। তাহলে উভয় পথই দৃষ্টির সামনে চলে আসবে। যার যে পথ ভালো লাগবে, সে সেই পথে চলবে। সমাজের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার অধিকার কারো নাই।

তখন অন্য এক মৌলবী সাহেব; যিনি নিজে বেদআতী হওয়া সত্ত্বেও হযরতের সমর্থনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি উঠে বললেন, ভায়েরা! আপনারা

জানেন, আমি মিলাদও পরি, কেয়ামও করি। কিন্তু ন্যায় ও সত্যের কথা হলো, এই হযরত যে বিশ্লেষণ আজ দিয়েছেন, সেটাই সঠিক। [আশরাফুস সাওয়ানেহ : ১/৬৮-৭২]

শুভ লক্ষণ বাস্তবায়িত হোক

একটি ঘটনা আমি একাধিকবার আব্বাজানের কাছ থেকে শুনেছি। ঘটনাটি তাঁর এক ডায়রীর মাঝেও দেখেছি– শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের ভাষাতেই ঘটনাটি পেশ করা হচ্ছে, ১৩৫৫ হিজরির ঘটনা। শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ হযরত মাওলানা আসগর হুসাইন সাহেবসহ দারুল উলূম দেওবন্দের বেশ ক'জন আকাবির- যাদের নাম এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না- কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য থানাভবনে হাজির হন। খাদেম হিসেবে আমি তাদের মাঝে ছিলাম।

এশরাকের পর পরামর্শ হবে বল হযরত জানিয়ে দেন। খানকায় উপস্থিত ওলামায়ে কেরামেও পরামর্শে শরীক হতে বলে দেন- যাদের নাম এ মুহূর্তে মনে আসছে না-। নির্দিষ্ট সময়ে হাউজের পার্শ্বে নিজ জায়নামাজে হযরত বসা ছিলেন। অযু ইত্যাদি করতে গিয়ে আমার দেরি হয়ে যায়। সবাই বসা ছিলেন। আমি যখন পৌঁছি, তখন সামনের বিছানায় –যেখানে সমস্ত ওলামা হযরত বসে ছিলেন– সেখানে কোনো শূন্যস্থান ছিলো না। আমাকে দেখে নিজ জায়নামাজে বসার জন্য ডাক দেন। আমি সম্মান দেখিয়ে ওজর পেশ করে বললাম, এখানেই পাটিতে বসছি। হযরত বললেন, না, তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না। এখানে এসে যাও। আমি একটি কাহিনী শুনাচ্ছি। নির্দেশ মতো আমি সেখানে এসে বসলাম। তখন হযরত আলমগীর ও দারাশিকোহ-এর কাহিনী শুনালেন যে, এক বুযুর্গ এ দুই শাহজাদাকে নিজের পাশে বসতে বললেন, তখন দারাশিকোহ ওজর জানালো। কিন্তু আলমগীর বসে গেলেন। তখন বুযুর্গ বললেন, আমাদের বাদশা তো দারাশিকোহ-কে সিংহাসনে বসাতে চান। কিন্তু আল্লাহর মর্জি হচ্ছে, আলমগীর বসবে। পরবর্তীতে তাই বাস্তব প্রমাণিত হয়।

ঘটনাটি শুনে সবাই বিশেষ করে হযরত মিয়াঁ মোহাম্মদ আসগর হুসাইন সাহেব আমাকে মোবারকবাদ জানান। শ্রদ্ধেয় আব্বাজান তাঁর ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বে রোববারের মজলিসেও ঘটনাটি বলেছিলেন।

হযরত থানবী রহ.-কে লেখা আব্বাজান রহ.-এর কয়েকটি চিঠি

১. ২৮/০৬/১৩৫২ হিজরিতে এক চিঠিতে আব্বাজান রহ. লিখেন, আফসোস হযরতের পরিচালনায় যে রাস্তায় কদম ফেলা হচ্ছিল, এখন আর সে রাস্তায় কদম পড়ছে না। তার প্রথম কারণ হলো, এত বেশি সীমাহীন ব্যস্ততা যে, অবসরই মেলে না। দ্বিতীয় কারণ হলো, চারিত্রিক দুর্বলতা। এর চেয়েও বড় কারণ হলো, গাফলতি। সমস্যা হলো, না কোনো কাজ করতে পেরেছি, ভবিষ্যতেও যে কারতে পারবো– তারও শতভাগ দ্বিধাহীন সংশয়মুক্ত আশা রাখতে পারছি না। এ জন্য অধমের সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন হযরতের দু'আ ও শুভ দৃষ্টি। এ অবস্থায় মুক্তির পথ ঐ একটিকেই মনে হচ্ছে।

হযরত এই চিঠির জবাবে কী চমৎকার বাক্য প্রয়োগ করেছেন। বলেছেন,

> "আল্লাহ চাহেন তো মাহরূম হবেন না। যদি পথ থেকে বিচ্যুত না হন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ইপ্সিত বিহঙ্গের দর্শন থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

এর উত্তরে আব্বাজান লিখেন, হযরতের মূল্যবান পত্র হৃদয়ে আনন্দের ফল্গুধারা বইয়ে দিয়েছে। হতাশ পথিকের জন্য বিহঙ্গের দর্শন সম্ভাবনা যেন মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করেছে।

হযরত তাঁর জবাবে লিখেন, "ইনশাআল্লাহ শ্রীঘ্র তার বাস্তবায়ন ঘটবে"।

২. ১৩৪৭ হিজরির জিলকদ মাসে আব্বাজান এক পত্রে লিখেন, গতকাল শেষ রাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক সন্ধ্যায় ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। এশার নামাযের জন্য উঠবো। হঠাৎ এ সময় ঘরের পশ্চিম প্রান্তের আসমানে সোনালী বর্ণের স্পষ্ট অক্ষরে يا الله (ইয়া আল্লাহ) লেখা দেখতে পেলাম। তার নিচেই দু'টি সোনালী সিংহাসন। যার উপর কোনো কিছু অংকিত আছে। দূরে থাকায় বুঝে আসছিল না। সিংহাসন থেকে কিছুটা দূরে আরো দু'চারটি কথা ক্যালিওগ্রাফির বিভিন্ন স্টাইলে বিত্রিত আছে।

আমি এই অপূর্ব দৃশ্য দেখছিলাম। হঠাৎ এ দু'টি সিংহাসনের একটি বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার ঘরের ছাদে এসে পড়ল। আমি তখন বিশ্বাস অন্তরে

নিয়ে তা উঠানোর জন্য দৌড় দিলাম যে, এই সিংহাসনকে কুরআনে কারীমের মত শ্রদ্ধা করা ফরজ। সে সময় আমার ওজু নেই- এ ভাবনাও জাগ্রত ছিল। সেহেতু রুমাল দিয়ে সেই সিংহাসন ধরে উঠালাম। প্রথম দৃষ্টিতেই কিছু কথা চোখে পড়ল। লক্ষ করলাম, সেখানে লওহে মাহফুজ লেখা আছে। আমি তখন ভাবলাম, এই দৌলত তো আল্লাহ আমাকে দিয়ে দিয়েছেনই, কাজেই তা নামাযের পর আরামে পড়ব। যাতে এশার জামাত ছুটে না যায়। সে জন্য বেশ সতর্কতার সাথে সিংহাসনটি আমার নামাযের পাটির উপর রেখে নামায পড়তে চলে গেলাম। আর তখনি ঘুম ভেঙ্গে গেল। হযরত যদি স্বপ্নটির ব্যাখ্যা করে দিতেন, তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হতাম। আর যদি তা হযরতের রুচিবোধের পরিপন্থি হয়ে থাকে, তাহলে হযরতের মানসিকতা মেনে অনুগত হওয়ার ক্ষেত্রে সবার আগে আগে থাকার চেষ্টা করব। হযরত এর প্রত্যুত্তরে লিখেন, "আমার মনে হয়, এটি কলব। সেখানে আল্লাহ তা'আলা মা'রিফাত ও ভালবাসার চিহ্ন অংকন করে দিয়েছেন। স্বপ্ন বরকতম হোক।"

৩. ১৩৪৫ হিজরির সফর মাসের একটি চিঠিতে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান লিখেন - রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমি কোনো এক জিহাদ থেকে ফিরে আসার পথে একটি বাগানের এক প্রান্তে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। এ সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি সামনে এসে পড়লেন, যাকে মাদরাসার মুহতামিম মাও. হাবীবুর রহমান পাঠিয়েছেন। জানাল, হুজুর সা. তোমাকে ময়দানে ডাকছে। আমি সাথে সাথে বেশ আনন্দে তার সাথ চললাম। সামনে একটি কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম। রাস্তায় মনে হল, কোনো যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। সে জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে।

উক্ত পত্রের উত্তরে হযরত থানভী রহ. লিখেন– 'আল্লাহ চাহেন তো আপনাকে দীনী খেদমতের তাওফীক দিবেন এবং তা সবার উপকারে অবদান রাখবে। সে পত্রেই একটু পরে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান লিখেছিলেন, কিছুদিন পরে আরো একটি স্বপ্নে দেখেছি– মক্কা থেকে কিছুলোক হজরে আসওয়াদ মাথায় করে আমাদের ঘরে এল। তখন আমার সহধর্মিনী তা নেওয়ার জন্য এগিয়ে গেলেন। কিন্তু অতিশয় ভারী হওয়ায় তিনি তা আর ধরে রখেতে পারলেন না। মাটিতে পড়ে গেল। গুদাম ঘরে বসে আমি

সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখছিলাম। হজরে আসওয়াদ পড়তে দেখে আমি দৌড়ে গেলাম। আশংকা করছিলাম, হয়তো ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু কাছে এসে দেখলাম, আলহামদুলিল্লাহ! কিছুই হয় নি।

জবাবে হযরত লিখেন, যে কোনো সময় আপনার হাতে এক দীনী সংস্কৃতি প্রচারের মারকায স্থাপিত হবে।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের অভ্যাস ছিল, জীবনের যে কোনো সাধারণ বিষয়ও শায়খের পরামশ ও অনুমতি না নিয়ে করতেন না। যেহেতু অনেক সময় ঘরোয়া ব্যাপার-সেপার ও মাদরাসার হাল হাকীকত প্রভৃতি নিয়েও পত্র লিখতেন। এক চিঠিতে এ ধরনের কিছু কথা জানিয়ে শেষ প্রান্তে লিখেন,– এতটুকু লেখার পর এ চিন্তা মাথায় এলো, হযরতের সমস্ত অনুরাগীরা হযরতের খেদমতে নিজের ভালো অবস্থার কথা লিখে এবং উচ্চশিক্ষা অর্জন করে সৌভাগ্যবান হচ্ছে আর আমি এক অকমর্ণ্য অযোগ্য অধম হযরতের খেদমতেও নিজের দুনিয়াবী ঝাগড়াঝাটির কথা লিখছি।'

তার জবাবে হযরত থানবী রহ যে কথা লিখেছেন, তা শুধুমাত্র একজন শায়খে কামেল তাঁর এ শিষ্যকে লিখতে পারেন; যার জীবনের প্রতিটি প্রান্ত তাঁর সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এবং যার নিজ শিষ্যের প্রখর প্রতিভার উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা আছে। সাথে সাথে যাকে নিজের কথা বললে খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে না। তিনি বলেছেন, "কিন্তু যা অন্যদের জন্য দুনিয়া। তা তো আপনার জন্য দ্বীন। -৩০/০৩/১৩৫২ হি.

বাই'আত করানোর অনুমতি প্রদান

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. শ্রদ্ধেয় আব্বাজানকে বাই'আত করানোর অনুমতি দিয়ে যে পত্র লিখেন, তা এখানে হুবহু পেশ করাই বোধ হয় ভাল হবে।

> প্রিয় মৌলভী মুহাম্মাদ শফী সাহেব!
> মুদাররিস. দারুল উলূম দেওবন্দ।
>
> আস-সালামু আলাইকুম,
>
> স্বতস্ফুর্তভাবে হৃদয়ে এ কথা জেগেছে, অন্যান্য সুহৃদদের সাথে আপনাকেও বাই'আত ও তালকীন (আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব ও

আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসায় নসীহত প্রদান) -এর অনুমতি দিচ্ছি। সুতরাং আল্লাহর উপর ভারসা করে আপনাকে এই আমলের উপর কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছি। যদি কোনো সত্য পথের দিশাসন্ধানী আপনার কাছে আবেদন করে, তাহলে আপনি তা সাদরে গ্রহণ করে নিবেন। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সাথে সাথে শিক্ষাদাতার উপকার হবে। আমি এর জন্য প্রতিনিয়ত দু'আ করব। আপনি বিষয়টি আপনার বন্ধুমহলে লুকাতে যাবেন না। সতর্কতা স্বরূপ খামে ভরে পত্র পাঠালাম।

ওয়াস সালাম– অধম আশরীফ আলী, থানা ভবন।

(রবীউস সানী : ১৩৪৯ হি.)

চিঠি পেয়ে আব্বাজান হযরতকে লিখেন, মহান বুযুর্গের পত্র পেয়েছি। পড়ে আমি হয়রান। কোথায় অকর্মণ্য পথহারা শফী' আর কোথায় বাই'আত আর তালকীনের অনুমতি? খারাপ ব্যক্তির হাতে সংশোধনের দায়িত্ব অর্পণ। সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার। শপথ করে বলতে পারবো, কীভাবে শায়খের হাতে বাইআত হতে হয়, তাই আমার জানা নেই। যখন আধ্যাত্মিক রীতি-নীতির প্রাথমিক জ্ঞানটুকুর সম্বন্ধে স্বাচ্ছ ধারণা পর্যন্ত আমার নেই, তখন অন্যকে কী তালকীন করবো? ওদিকে আবার এমন কোন নির্বোধ আছে, যে আমার কাছে বাই'আত হতে আসবে? আপনার পত্র বরাবার পড়ছি আর নিজের খারাপ কাজগুলো দু'চোখে ভেসে ওঠছে। বড় পেরেশানি হচ্ছে। আশংকা জাগছে, আমার মত এক অসচেতন মন্দলোককে এত বড় পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা, না জানি কোনো ভাবে এই পদকে কলংকিত করার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। এই আশংকার কারণেই মনে হচ্ছে, বিষয়টি লুকিয়ে রাখলে বোধ হয়, ভালো হবে।

পত্রের জবাবে হযরত লিখেন, আপনি আপনার নিজের সম্পর্কে এমন ধারণা রাখেন বলেই আমি আপনাকে বাই'আতের অনুমতি দিচ্ছি।

তখন আব্বাজান লিখেন, উক্ত পত্র হাতে পাওয়ার পর পদে পদে নিজের অযোগ্যতার খুব বেশি উপলব্ধি হচ্ছে।

হযরত লিখেন– "আল্লাহ চাহেন তো খুবই উপকার হবে"।

আপনারা দু'জন আমার চোখের মণি

ভাই জনাব মাওলানা আবদুল কারীম সাহেব বর্ণনা করেন যে, যখন আব্বাজান রহ. ও হযরত মাওলানা মুফতি আবদুল কারীম সাহেব الحيلة الناجزة (আল হীলাতুন নাজিযা) কিতাবটির সংকলন শেষ করেন, তখন হযরত থানবী রহ. উভয়কে সম্বোধন করে বলেন,

আপনারা দু'জন আমার চোখের মণি। একজনের নামের শুরুতে عين (আরবি বর্ণ 'আ'ইন') অর্থাৎ عبد الكريم (আবদুল কারীম) অপরজনের নামের শেষে عين অর্থাৎ محمد شفيع (মুহাম্মাদ শফী')।

আল জেরিয়ায় খেলাফতে উসমানী

সুদীর্ঘ কাল পযন্ত আল জেরিয়ায় উসমানী খেলাফতের সোনালী শাসন চলতে থাকে। শান্তি নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতার সঙ্গে জনগণ জীবন কাটাতে থাকে। একটা সময় পর্যন্ত তুর্কি-শাসকরা সামগ্রিক ভাবে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সেখানে দূর্বলতা ছড়াতে থাকে। অনেক সাম্প্রদায়িক মানসিকতাচ্ছন্ন গভর্নর সরকারি চাকরিতে তাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাতে থাকে। যার কারণে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে এই গভর্নররা নিজেরা উসমানী খেলাফতের বিধি-বিধান ভালোভাবে মেনে চলতো না, অপরদিকে জনগণের ধর্মীয় জীবনধারাতেও অধঃপতন মেনে এসেছিল। এই অধঃপতনের যুগে উসমানী খেলাফতের পক্ষ থেকে আলজেরিয়ার সর্বশেষ গভর্নর হিসেবে হুসাইন পাশাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এই চরম নির্বোধ গভর্নর নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের দাসত্বে ঠেলে দেয়। যার ঘটনা খুবই করুণ। ঘটনাটি হলো, আলজেরিয়ার এক ইহুদী ব্যবসায়ী বাকরি আবূ হান্নাহ এর সঙ্গে ফ্রান্সের এক দল ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিলো। সেই ব্যবসায়িক লেনদেনের এক পর্যায়ে সেই ফরাসি ব্যবসায়ীরা এই আলজেরিয়া ইহুদীর কাছে ঋণি হয়ে পড়ে। ইহুদি ব্যবসায়ী যখন তাদের কাছে তার পাওনা ঋণ চায়, তখন তারা এই অজুহাত পেশ করে যে,

আমরা লোকসানের কারণে আপনার পাওনা আদায় করতে অপরাগ। বাকরী আবূ জান্নাহ এ প্রেক্ষাপটে আলজেরিয়ার গভর্নর হুসাইন পাশার শরণাপন্ন হয়। হুসাইন পাশা ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে চাপ প্রয়োগ করলো যে, অতি সত্তর যেনো টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অবশেষে দীর্ঘ কথাবার্তর পর উভয় পক্ষের মাঝে সন্ধি হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, ফ্রান্সের ব্যবসায়ী বাকরী আবু জান্নাহকে একটি বড় ধরনের অংক সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আদায় করে দেবে। জনশ্রুতি আছে যে, এই মামলাটি নিয়ে হুসাইন পাশার দূরভিসন্ধি শুরু থেকেই খারাপ ছিলো। ব্যাপারটি নিয়ে তার মাত্রাতিরিক্ত নাক গলানোর কারণ হলো, সে মনে মনে ইচ্ছে করছিলো যে, উক্ত বিশাল অংক বা তার বৃহৎ অংশ সে আত্মসাৎ করবে। কেননা এই ধরনের দুর্নীতি সে নিয়মিতই করে আসছিলো।

সন্ধি অনুযায়ী যখন সেই অর্থ পরিশোধের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন ফ্রান্সের অন্য একদল ব্যবসায়ী বাকরী আবূ জান্নাহর বিরুদ্ধে এই দাবী করে বসলো যে, আমরা তার কাছে বেশ বড় অংকের টাকা পাই। তারা তাদের সরকারের মাধ্যমে একটি স্থগিতাদেশও আদায় করে নিলো। যার কারণে আইনিভাবে বাকরী আবূ জান্নাহর কাছে ঋণী পথমপক্ষের ব্যবসায়ীদের উপর উক্ত চুক্তি মাফিক পাওনা টাকা শোধ করার উপর প্রতিক্রিয়াটি স্থগিত হয়ে গেলে। কারণ হলো, এর মাধ্যমে ফ্রান্সের ব্যবসায়ীদের দ্বিতীয় দলটি ফ্রান্সে থেকেই আইনিভাবে উক্ত পাওনা উসুল করে নিতে পারবে।

হুসাইন পাশা যখন সেই সংবাদ পেলো, তখন সে ফ্রান্সের রাষ্টদূতকে ডেকে প্রতিবাদ জানালো। তার বক্তব্য হলো, চুক্তি মোতাবেকই ঋনের টাকা শোধ করতে হবে। যদি দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবসায়ীগণ বাকরী আবূ জান্নাহর কাছে কোনো টাকা পেয়ে থাকে, তাহলে তা উসূল করতে হবে প্রথম টাকা উসূল করার পর। কেননা এ দু'টি এক লেনদেন নয়। প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক লেনদেন। কিন্তু রাষ্ট্রদূত তাতে সায় দিলো না। কারণ হলো, হুসাইন পাশার দূর্নীতি ছিল সর্বজনবিদিত। যে সব ব্যবসায়ী বাকরী আবূ জান্নাহর কাছে টাকা পেতো, তাদের আশংকা ছিলো যে, ফ্রান্স থেকে সেই টাকা বেরিয়ে যাওয়ার পর বাকরী আবূ জান্নাহর কাছে পৌঁছবে না। হুসাইন পাশা তো মেরে দেবে। আমরা যখন বাকরী আবূ জান্নাহর

কাছে আমাদের পাওনা টাকা চাইবো, তখন তার কাছে দেওয়ার মতো কিছুই থাকবে না।

যখন রাষ্ট্রদূত হুসাইন পাশার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন হুসাইন পাশা সরাসরি ফ্রান্সের সরকারের কাছে পত্র লেখে। ফ্রান্স সরকার সেই পত্র তার রাষ্ট্রদূতের কাছে পাঠিয়ে তার উত্তর লেখার নির্দেশ দেয়। এরই মধ্যে সেই রাষ্ট্রদূত অন্য একটি বিষয় নিয়ে হুসাইন পাশার কাছে আসে। পাশা তখন তাকে বলে, আমি এখনও আমার পত্রের উত্তর পাই নি। অথচ অনেক সময় গড়িয়ে গেছে।

রাষ্ট্রদূত তখন জানায় যে, পত্রটি আমার কাছে। আমার রাষ্ট্র আমাকে তার উত্তর জানাতে বলেছে। হুসাইন পাশা এর উত্তর জানতে চাইলে রাষ্টদূত তার উত্তরে এমন একটি কথা বলে, যা হুসাইন পাশার কাছে অপমানজনক মনে হয়। এ সময় পাশার হাতে একটি পাখা ছিলো। ক্রোধে সে হাতের পাখাটি ফ্রান্সের রাষ্টদূতের মুখের উপর ছুঁড়ে মারে এবং তাকে বের করে দেয়।

ফ্রান্সের সরকার তার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে উক্ত অসদাচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং রাষ্ট্রদূতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানায়। কিন্তু হুসাইন পাশা তা প্রত্যাখান করে। সে সময় ফ্রান্স সরকার নিজেদের কিছু অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে বিভিন্ন রণাঙ্গণে তাদের সৈন্যদল যুদ্ধ করছিলো। যার কারণে নতুন কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাচ্ছিলো না। এ কারণে সবশেষে তারা এই প্রস্তাব পেশ করে যে, হুসাইন পাশা নিজে রাষ্ট্রদূত বা ফ্রান্স সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে প্যারিসে বসবাসকারী কোনো বাক্তিকে এই কাজের জন্য নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে দিক। সে ফ্রান্স সরকারের কাছে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

উসমানী খেলাফতের কেন্দ্র থেকেই হুসাইন পাশাকে তাকিদ দেওয়া হয় যে, সে যেনো উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে তার উপর আমল করে। কিন্তু হুসাইন পাশা নিজের জেদের উপর অটল থাকে। সে এই প্রস্তাবও প্রত্যাখান করে। যার ফলে ফ্রান্স সরকার যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একটি শক্তিশালী নৌবহর পাঠিয়ে তারা আলজেরিয়ার উপর আক্রমণ করে। হুসাইন পাশা সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। আর এভাবে ফ্রান্স

সরকার গোটা আলজেরিয়াকে জবরদখল করে। হুসাইন পাশাকে গ্রেফতার করে প্যারিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

অনেক ঐতিহাসিক উক্ত প্রবাহের নেপথ্যে কারণ হিসেবে লিখেছে যে, হুসাইন পাশা নিজে আলজেরিয়ার বাসিন্দা ছিল না। এ জন্য এই দেশের মাটির উপর তার কোনো দরদ ছিলো না। কারণ, সে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা পরিশেষে আলজেরিয়ার চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। কিন্তু আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ বায়রাম তিউনিসী রহ. তাদের সেই বিশ্লষণ নাচক করেছেন। আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ বায়রাস রহ. হচ্ছেন শেষ যুগের উত্তর আফ্রিকার সর্বজন স্বীকৃত দীনী ব্যক্তিত্ব। ইলমে দীন ছাড়াও ইতিহাস, রাজনীতি ও ভূগোল শাস্ত্রে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, ইসলামী জাতিয়তা একটাই। যদি কেউ এ দাবী করে যে, বাহিরাগত মুসলমানদের মনে দেশের প্রতি মায়া হয় না, বাস্তবতার বিচারে তার এই দাবী ভুল। ইতিহাসে এর স্বপক্ষে প্রমাণের অভাব নেই। আমরা অনেকবারই প্রত্যক্ষ করেছি যে, বাহিরাগত কত যে মুসলমান শাসক তার শাসনাধীন এলাকার সাথে পূর্ন বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন। সেখান থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করেছেন। সেই জনপদ সে সুন্দর, স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। অথচ এর বিপরীতে আমরা অনেক স্বদেশের সন্তানদেরকে দেশের ধ্বসযজ্ঞে নেমে আসতে দেখেছি। কাজেই কোনো এলাকা থেকে মুসলমানদের কর্তৃত্ব চলে যাওয়ার কারণ হিসেবে শাসকদের জাতিয়তাকে অজুহাত পেশ করলে ঠিক হবে না; বরং তার আসল কারণ হলো, সেই এলাকার নেতৃবর্গের চরিত্রিক অধঃপতন। তারা যখন পাপাচারের শিকার হয়ে যায়, তখন সেই পাপাকার্যের পরম্পরায় সেই এলাকার শাসনভার সময়ের চোরাপথে অযোগ্যদের হাতে চলে যায়। তখন তাদের উপর আল্লাহর প্রতিফলন ঘটে। আল্লাহ তাদের শাসক হিসেবে এমন লোকদের চাপিয়ে দেন, যারা তাদেরকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়। আপনি বিভিন্ন জাতি সত্তার ইতিহাস ঘেটে দেখুন, তাদের পতনের কারণ হিসেবে আপনাকে বারংবার এই কারণের মুখোমুখি হতে হবে। আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি অনুধাবন করার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন, তারা

সব সময় কোনো বিপদ নেমে আসলে তার সত্যিকার কারণ খুঁজে বের করুন। এবং সেই কারণের দিকে বিপদের সম্বন্ধ যুক্ত করে দিন। এটি যদি পুরনো কোনো কারণও হয়ে থাকে, তবুও তারা সত্যি কথা বলতে দ্বিধা করেন না।

কোনো দেশের সেই সর্বশেষ শাসক, যার হাতে ধরে সেই জাতির কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা হয়, সত্যিকার অর্থে তিনি হয়ে থাকেন একটি গোপন পুরনো রোগের বাহ্যিক উপসর্গ। এতদসত্ত্বেও তাকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের সামনে জবাবদিহি করতে হবে। কেননা তার হাতে সেই ব্যাধি প্রতিহত করা ও তার চিকিৎসা করার ক্ষমতা ছিলো। কিন্তু সে ঐ ব্যাধির পরিধি সীমিত করার পরিবর্তে সেদিকে আরো ছড়িয়ে দিয়েছে। যার ফলে গজবের বজ্রকড়ক হয়ে এই ব্যাধি গোটা উম্মতকে তাড়িত করেছে। এর কারণ হলো, একটি অসুস্থদেহের উপর এমন সব পারিপার্শ্বিকতাও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ফেলে, সাধারণত সুস্থ দেহ যে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে না। কাজেই যেহেতু সেই শাসক একটি অমঙ্গল ও অকল্যাণের ধারক-বাহক হয়ে থাকে, কাজেই এই ব্যাপারটিই তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যথেষ্ট লাঞ্ছনা বয়ে আনে।

কাজেই মৌলিকভাবে আলজেরিয়ার মৃত্যুরোগ সেদিন থেকেই শুরু হয়ে গেছে, যেদিন থেকে উসমানী খেলাফতের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে চারিত্রিক অধঃপতন দেখা দিয়েছে। যার কারণে প্রশাসনিক কেন্দ্র নষ্ট হয়েছে। শাসকবর্গের মাঝে বিকার দেখা দিয়েছে। হুসাইন পাশার মতো শুধু আলজেরিয়া নয়; রাষ্ট্রের অনেক অংশই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যার ফলে সেখানে অত্যাচার, অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের সর্বগ্রাসী মুসিবত বিকট আকার ধারণ করেছে। -সফওয়াতুল এ'তেবার বি মুস্তাওদিঈল আমসার ওয়াল আক্বতার, লিশ শায়খ মুহাম্মাদ বায়রাম : ৩/৯-১০

আলজেরিয়ার উপর ফ্রান্সের শাসন মুসলিম জাহানের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ঔপনিবেশিক শাসন প্রমাণিত হয়। মুসলমানদের পক্ষে ব্যক্তিগত জীবন ও দীনের উপর আমল করা কঠিন হয়ে যায়। অসংখ্য অসংখ্য মসজিদ শহীদ করে দেওয়া হয়। অনেকগুলো মসজিদ গীর্জায় পরিণত করে ফেলা হয়। ইসলামী জ্ঞান তো পরের কথা, আরবি ভাষা শিক্ষা করাও নিষিদ্ধ করে

দেওয়া হয়। আরবির পরিবর্তে ফারসি ভাষাকে দেশের সরকারি ভাষা ঘোষণা দিয়ে স্থানীয় জনগণকে বাধ্য করা হয় যে, তারা শুধু এই ভাষা শিখবেই না; বরং তাদেরকে নিজেদের জীবনের সব ধরনের লেনদেন এই ভাষাতেই সম্পন্ন করতে বাধ্য করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদেরকে এখানে এনে বাস করতে দেওয়া হয়। যার ফলে এক সময় আলজেরিয়া শহরে খ্রিস্টানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সমস্ত চারিত্রিক ব্যাধিগুলো আমদানি করে এই অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি এতটাই নিম্নগামী হয়ে যায় যে, অনেক বড় বড় শহরেও মুসলিম নারী অমুসলিম পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকে।

কিন্তু শেষ কথা হলো, আল্লাহ তা'আলাই তাঁর ধর্মের রক্ষক। চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের ভেতরেও আল্লাহর কিছু বান্দা দীনি ইলমকে তাদের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখে বসেছিলেন। তারা সংগোপনে দীনি শিক্ষাদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। অনেক লোকদের দীনি ইলমের পাণ্ডিত্য অর্জন করার জন্য তিউনিসিয়ার যাইতুনাহ বিশ্ববিদ্যালয় ও মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

রওযায় আতরাস বিজয়ের ঘটনা

মিসর জয়ের পূর্বে, এমনকি পরে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ জায়গাটিকে "জাযিরাতুল মিশর" বলা হতো। কেননা এটি নীলনদের মাঝখানে অবস্থিত। স্থানটির একদিকে কায়রো আর অন্যদিকে সেই জিযা নগরী, সেখানে মিশরের পিরামিড গুলো অবস্থিত। যখন হযরত আমর ইবনে আস রা. মিশরের কেল্লা অবরোধ করেন, তখন কিবতী বাদশাহ মুকাওকিস সেই কেল্লা থেকে পালিয়ে এই জাযিরার কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছিলো। (কেল্লায় যাওয়ার জন্য নীলনদের উপর যে সেতু নির্মিত হয়েছিলো, সেটিও ভেঙ্গে দিয়েছিলো। যেন মুসলমানরা নীলনদ পেরিয়ে জাযিরা পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। অন্য দিকে সে রোমসম্রাটের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো, যেনো তারা পিছন থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে।

এমন পরিস্থিতিতে মুকাওকিস হযরত আমর ইবনে আস রা. -এর কাছে তাঁর একদল দূতের মাধ্যমে চিঠি লিখে পাঠালো যে, তোমার এক দিকে

নীলনদ আর অন্যদিকে অন্য দিকে রোমান সৈন্য। তুমি এখন নিজেই আবরুদ্ধ হয়ে পড়ছো। তোমার হাতেও বেশি সৈন্য নেই। এখন বলতে গেলে তুমি আমাদের হাতে বন্দি। কাজেই যদি নিজের কল্যাণ চাও, তাহলে সন্ধির কথাবার্তা নিষ্পন্ন করার জন্য তোমার কিছু লোক আমার কাছে প্রেরণ করো।

পত্রটি নিয়ে সেসকল দূত যখন হযরত আমর ইবনে আস রা.-এর কাছে পৌছলো, তখন তিনি এর কোনো উত্তর দিলেন না; বরং তাদেরকে দুই দিন দুই রাত নিজের কাছে অতিথি হিসেবে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, পত্র বাহক যেনো মুসলমানদের কর্মকাণ্ড ও তাঁদের চেতনা ও প্রেরণা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হতে পারে। অন্যদিকে দূতদের ফিরতে দেরি দেখে মুকাওকিসের আশংকা হলো, এরা আবার পত্রবাহকদেরকে হত্যা করে ফেলাকে বৈধ মনে করে না তো? দু'দিন পর সেই দূত হযরত আমর ইবনে আস রা.-এর এই বার্তা নিয়ে ফেরে যে, আমরা তিনটি পথ ছাড়া চতুর্থ কোনো পথ মেনে নেবো না। (অর্থাৎ ইসলাম, জিযয়া অথবা যুদ্ধ)। এ কথা আমরা তোমাদেরকে পূর্বেও জানিয়েছি।

বার্তা জানার পর মুকাওকিস যেই দূতদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা মুসলমানদেরকে কেমন পেয়েছো? তার সেই প্রশ্নের উত্তরে দূতগণ বলল–

> رأينا قومًا الموتَ احب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب اليهم من الرفعة ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة ولانهمة، وانما جلوسهم على التراب، وأكلهم على ركبهم وأميرهم كواحدٍ منهم، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم، ولا السيد من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يختلف منهم أحد، بغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون فى صلاتهم.

> "আমরা এমনি এক জাতি দেখেছি, যাদের প্রতিটি সদস্য জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে বেশি ভালবাসে। যারা জাঁকজমকের চেয়ে নম্রতাকে বেশি পছন্দ করে। যাদের কারো দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও লোভ নেই। তারা মাটিতে বসে পড়ে ও হাঁটু গেড়ে খাবার গ্রহণ করে। তাদের দলপতি তাদেরকে কোনো সাধারণ সদস্যের মতো জীবন-যাপন করে। তাদের মাঝে কে উঁচু, আর

কে নিচু; তা জানার উপায় নেই। যখন নামাযের সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তাদের কেউই পেছনে পড়ে না। তারা তখন তাদের অঙ্গগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে নেয় এবং বিনম্রতার সঙ্গে নামায আদায় করে।"

লোকমুখে শুনা যায় যে, পত্রবাহকদের কাছ থেকে এই উত্তর শোনার পর মুকাওকিস বলেছিলো, "এদের সামনে পাহাড় পড়লে নির্ঘাত তারা তা সরিয়ে দেবে। তাদের সঙ্গে কেউ লড়াই করতে পারবে না।" এরপর উভয় পক্ষের মাঝে চিঠি লেনদেনের পর হযরত আমর ইবনে আস রা. হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা.-এর নেতৃত্বে দশ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মুকাওকিসের কাছে প্রেরণ করেন। মুকাওকিস তাদেরকেও অর্থ-কড়ির লোভ দেখিয়ে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করল। মুসলমানদের অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কথা তুলে এই নিশ্চয়তা দিলো যে, তার প্রস্তাব গ্রহণ করলে মুসলমানরা স্বচ্ছল হয়ে যাবে। তার উত্তরে হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. এক অনন্য বিস্ময়কর বক্তব্য দেন। তাঁর সেই বক্তৃতা ছিলো সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও বিশ্বাস, তাদের ইস্পাত দৃঢ় সংকল্প ও অবিচলতা, পৃথিবীর প্রতি চরম অনাসক্তি, পরকাল-ভাবনা ও শাহাদতের প্রতি হৃদয়ের আকুলতার জাজ্বল্যমান প্রতিচ্ছবি। সেই প্রতিচ্ছবি থেকে নির্বাচিত অংশ তুলে ধরছি। তিনি তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন–

"আল্লাহর শত্রুদের সাথে আমরা এজন্য লড়ছি না যে, আমাদের মাঝে দুনিয়ার প্রতি মোহ রয়েছে বা আমরা আরো দুনিয়া গ্রাস করতে চাই। আমাদের অবস্থা তো এমন যে, আমাদের মাঝে না স্বর্ণের স্তুপ রয়েছে, না একটি মাত্র কড়ি রয়েছে। তার প্রতি আমাদের কারো কোনো পরওয়া নেই। এ কারণে দুনিয়ার কাছে আমাদের প্রতিটি ব্যক্তির সর্বোচ্চ চাওয়া হলো– স্বল্প খাবার, যা দিয়ে সে সকাল-সন্ধ্যা পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবে। আর একটি চাদর, যা সে গায়ে জাড়িয়ে নেবে। এতটুকু পেয়ে গেলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। যদি আমাদের কোনো ব্যক্তি এক স্তুপ স্বর্ণও পেয়ে যায়, তাহলে সে তা আল্লাহর পথেই ব্যয় করবে। কেননা দুনিয়ার কোনো নেয়ামতই সত্যিকার কোনো নেয়ামত নয়। দুনিয়ার স্বচ্ছলতাও সত্যিকারের স্বচ্ছলতা নয়। প্রকৃত নেয়ামত তো

আখেরাতে পাওয়া যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে এই নির্দেশই দিয়েছেন। আমাদেরকে আমাদের নবী সা. সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, দুনিয়ার যতটুকু পেলে আমাদের ক্ষুধা নিবারিত হয়ে যাবে এবং দেহ আবৃত হয়ে যাবে; এর চেয়ে অতিরিক্ত দুনিয়ার চিন্তা যেন আমাদেরকে পেয়ে না বসে। আমাদের সকল ফিকির ও আসল সাধনা হতে হতে হবে; আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ও তাঁর শত্রুদের সাথে জিহাদ করা।

আর আপনি আমাদেরকে যে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, আমাদের মোকাবেলা করার জন্য রোমান সৈন্যরা একত্রিত হচ্ছে। তাদের সংখ্যা প্রচুর। আপনি বলছেন, তাদের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি আমাদের নেই। তার উত্তরে আমি কসম করে বলছি, এগুলো আমাদের মনে কাঁপণ ধরায় না। এতে আমাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে না। যদি আপনার এ কথা সত্যই হয়ে থাকে, (যে, আমাদেরকে প্রতিহত করার জন্য রোমান সৈন্যবহর আসছে) তাহলে আল্লাহর কসম এই সংবাদ আমাদের যুদ্ধ স্পৃহা আরো বাড়িয়ে দেয়। কেননা এতো বিশাল সৈন্যদলের সঙ্গে যদি আমাদেরকে লড়তে হয়, তাহলে মহান আল্লাহর সামনে আমাদের জবাবদিহিতা আরো সহজ হয়ে যাবে। যদি আমাদের একেকজন তাদের মোকাবেলা করে শহীদ হয়, তাহলে আমাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা আরো প্রবল হয়ে উঠবে। অন্য কোনো সংবাদ আমাদের কাছে এর চেয়ে বেশি প্রিয় ও চক্ষুশীতলকারী হতে পারে না। আমাদের অবস্থা হলো এমন যে, আমাদের দলের প্রতিটি সদস্য সকাল সন্ধ্যা এ দু'আ করে যে, মহান আল্লাহ তাঁকে শহীদ হওয়ার তৌফিক দিন। তাঁকে যেন তাঁর শহর, তাঁর বাসভূমি ও তাঁর পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরতে না হয়। আমরা আমাদের মাতৃভূমিতে যা কিছু ছেড়ে এসেছি, তা নিয়ে আমাদের কোনো ভাবনা নেই। কেননা আমাদের প্রত্যেকেই তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে তাঁর প্রতিপালকের যিম্মায় রেখে এসেছে। আমাদের সামনে ঘটিতব্য অবস্থা কেন্দ্রিক আমাদের যাবতীয় ভাবনা।

বাকি রইলো আপনার সেই কথা যে, আমরা নিজেদের অর্থনৈতিক বিচারে সংকীর্ণতা ও কাঠিণ্যের সঙ্গে দিনাতিপাত করছি। আমরা আপনাকে পূর্ণ

নিশ্চয়তার সঙ্গে জানাই যে, আমরা এতোটাই স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে রয়েছি যে, তার সঙ্গে তুলনা করার মত কোনো স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ নেই। যদি গোটা পৃথিবী আমাদের মালিকানায় এসেও পড়ে, তবুও আমরা নিজেদের জন্য তার চেয়ে বেশি রাখতে চাইবো না, যতটুকু এখন আমাদের কাছে আছে।

কাজেই আপনি এখন আপনার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে আমাদের জানিয়ে দেন যে, আমাদের প্রস্তাবিত তিনটি পথের মধ্যে হতে কোনটি আপনি নির্বাচিত করবেন। আমরা আমাদের সম্পর্কে এতটুকু বলে রাখতে চাই যে, আমরা উল্লেখিত তিন পথের বাইরে অন্য কোনো পথ পছন্দ করবো না। এগুলোর বাইরে আপনার কোনো কথাও গ্রহণ করবো না। সুতরাং আপনি এই তিনটির কোনো একটি গ্রহণ করে নিন। অনন্তর বিষয়গুলোর লোভ ছেড়ে দিন। এটাই আমাদের সেনাপতির নির্দেশ। আমাদের আমীরুল মু'মিনীন [হযরত ওমর রা.] এ বিষয়েরই নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই সেই অঙ্গীকার, যা আল্লাহর রাসূল সা. আমাদের দিয়ে গেছেন।"

এরপর হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. সেই তিন পথের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেন। ইসলাম ধর্মের পূর্ণ পরিচিতি তুলে ধরেন। মুসলমান হওয়ার সুফল আলোচনা করেন। মুকাওকিস হযরত উবাদা রা.-এর কথা শোনার পর জিযিয়ার প্রস্তাব বেছে নিতে আগ্রহী হয়। কিন্তু তার সভাসদেরা তার কথা শুনলো না। অবশেষে যুদ্ধ হলো এবং মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন।

আসহাবে কাহফ

কুরআনে কারীম আসহাবে কাহফের ঘটনা আলোচনা করেছে। সেই ঘটনার কারণে কুরআনে কারীমের একটি সূরার নাম আসহাবে কাহফ রেখেছে। কাহফ আরবি ভাষায় গুহাকে বলা হয়। ঘটনাটি হলো, এক মূর্তিপূজারী রাজার আমলে কয়েকজন যুবক একত্ববাদী ধর্মের উপর ঈমান এনেছিলো। শিরক ও মূর্তিপূজা তাদের মন থেকে উঠে গিয়েছিলো। তখন মূর্তিপূজারী ও তার কর্মচারীরা তাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু

করল। যার কারণে তারা তাদের জনবসতি থেকে একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ তাদের গভীর ঘুমে নিমজ্জিত করেন। তখন তারা বছরের পর বছর ঘুমিয়ে থাকে। তাদের গুহাটির অবস্থান এমনই ছিলো যে, সূর্যের আলো ও বাতাস যদিও পর্যাপ্ত পরিমাণে ভেতরে পৌছতো, কিন্তু তাপ কখনো ভেতরে ঢুকতে পারতো না। এভাবে অনেক বছর কেটে গেলো। সেই মূর্তিপূজারী রাজার শাসনামলের সমাপ্তি ঘটে। তার স্থানে একজন একত্ববাদী সঠিক বিশ্বাসের অধিকারী বাদশাহ ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেন। তাঁর যুগে এই যুবকেরা তাদের গভীর নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে। তখন তারা প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করে। তারা নিজেদের এক সাথিকে মুদ্রা দিয়ে বাজারে পাঠায়। তারা তাগিদ দিয়ে বলে যে, গোপনে গিয়ে কোনো হালাল খাবার কিনবে। তারা মনে করছিলো, এখনো সেই মূর্তিপূজারী রাজার শাসন চলছে। কাজেই তারা আশংকাবোধ করছিলো, যদি তার লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলে, তাহলে ধরে বেঁধে নিয়ে যাবে এবং ভয়ানক অত্যাচার না করে ছাড়বে না। ঐ সংগীটি বেশ গোপনীয়তা রক্ষা করে জনবসতীতে এলো। সে এক দোকানে এসে খাবার কিনলো। যখন সে তার দিকে মুদ্রা বাড়িয়ে দেয়, তখন দোকানদার তা হাতে নিয়ে দেখে যে, এটি তো প্রাচীন যুগের মুদ্রা। তখন সমস্ত রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। এরপর সে কথা জেনে আশ্বস্ত হয় যে, প্রশাসন বদলে গেছে। এক পর্যায়ে তাৎকালীন বাদশাহর কাছেও খবর পৌছে যায়। তখন সে বাদশাহর কাছে তার অপর সাথি-সঙ্গীদের বৃত্তান্তও অবহিত করে।

কুরআনুল কারীম সংক্ষেপে এই ঘটনা উপস্থাপন করার পর অনন্তর এই সংবাদও জানিয়েছে যে, ঐ যুগের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার এই নেক বান্দাদের প্রতি সম্মানে তাদের অবস্থানস্থলের উপর একটি মসজিদ নির্মাণেরও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো।

কুরআনুল কারীম তার সাধারণ বর্ণনানীতি অনুযায়ী ঘটনাটির ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিশদ বর্ণনা করে নি যে, ঘটনাটি কোন যুগে কোথায় ঘটেছিলো? যার কারণে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনার দ্বারস্থ হয়ে ইতিহাসবিদ ও তাফসীরকারকগণ এক্ষেত্রে নানারকম রায় দিয়েছেন। অধিকাংশ গবেষকদের রায় হলো, ঘটনাটি হযরত ঈসা আ.-এর উর্দ্ধাকাশে

আরোহণের কিছু কাল পর অর্থাৎ প্রথম থেকে তৃতীয় খ্রিস্টীয় শতকের ভেতরে ঘটেছিলো। সে সময় ঐ এলাকার নিবতী মূর্তিপূজারী রাজাদের রাজত্ব ছিলো। কিন্তু ফিলিস্তিনে আত্মপ্রকাশ করা খ্রিস্টধর্ম এসব অঞ্চলেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যার ছোঁয়ায় এ যুবকেরা সেই ধর্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর যখন তারা গুহার অন্ধকারে ঘুমিয়ে ছিলো, সে সময় ধীরে ধীরে খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা সেই নিবতী শাসকবর্গের কবল থেকে মুক্ত করে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এখানকার জনগণও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।

সেই পূণ্যাত্মার অধিকারী যুবকেরা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পরিস্থিতির পরিবর্তনে খুব খুশি হয় যে, তাদের সেই সত্য ধর্ম সবত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তারা তখন নিজেদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, পৃথিবীর সমস্ত হাঙ্গামা থেকে আলাদা হয়ে বাকি জীবন তারা এ গুহাতেই কাটাবে, কিন্তু বাদশাহ চেয়েছিলেন, এখন তারা নাগরিক জীবনে চলে আসুক। কিন্তু তারা তাতে সায় দিলো না।

এভাবে তারা বাকি জীবন সেই গুহাতে কাটিয়ে দেয়। বিভিন্ন বর্ণনায় এ কথা পাওয়া যায় যে, যখন সমকালীন বাদশাহ তাদের বৃত্তান্ত শুনেন, তখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের গুহায় এসে হাজির হন। কিন্তু ততোক্ষণে তাদের ইন্তেকাল হয়ে যায়। অন্যান্য বর্ণনাগুলো তাদের মৃত্যুর ব্যাপারে নীরব।

খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন সূত্র থেকে এ ঘটনা এভাবে বর্ণিত রয়েছে। বর্ণনাগুলোর মাঝে সৎসামান্য পার্থক্য রয়েছে। কথিত আছে, ইয়াকুব সারোগী (অথবা জেমস) নামক (ইরাকের) এক জ্যোতির্বিদ ৫২১ হিজরিতে ঘটনার বিশদ বিরবণ জানিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেন। নিবন্ধটি সুরিয়ানী ভাষায় লেখা হয়েছিল। এরপর সেটি গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। তার বিবরণ অনুযায়ী ঘটনাটি ২৫০ খ্রিস্টাব্দে এশিয়ার ছোট একটি শহর "আফসুস" এ ঘটেছিলো। সেই যুবকদের সংখ্যা ছিল সাত। তারা পৃথিবীকে মহান আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার জানান দিয়ে ও বার্তা শুনিয়ে পুনরায় সেই গুহাতেই ঘুমিয়ে পড়েন।

কিন্তু ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে জর্ডানের গবেষক তাইসীর যাবইয়ানে কারো মাধ্যমে সংবাদ পান যে, আম্মানের নিকটবর্তী এক পাহাড়ের উপর এমন একটি

গুহা রয়েছে, যার ভেতর বেশ কিছু কবর ও কংকাল রয়েছে। সেই গুহার উপর একটি মসজিদও নির্মিত রয়েছে। তখন তিনি একজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই গুহার সন্ধানে বের হন। স্থানটি সাধারণ সড়ক থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। তারা কয়েক কিলোমিটার দূর্গম পথ পেরিয়ে সেই গুহার পাদদেশে পৌঁছুতে সক্ষম হন। তাইসীর যবইয়ান সাহেবের ভাষায়– "আমরা একটি অন্ধকার গুহার সামনে এসে দাঁড়ালাম। লোকালয় থেকে বেশ দূরে একটি বিস্তৃত তেপান্তরের উপর এটি অবস্থিত। গুহাটির ভেতরে এত বেশি অন্ধকার ছিলো যে, আমাদের প্রবেশ করতে বেশ সমস্যা হচ্ছিলো। স্থানীয় এক রাখাল আমাকে জানালো যে, গুহার ভেতর বেশ কিছু কবর রয়েছে। সেখানে অনেক গুলো পুরাতন হাড়-গোড় পড়েছিলো। গুহাটির দরজা ছিল দক্ষিণমুখী। তাঁর দু'ধারে দুটি স্তম্ভ ছিলো, যা বড় পাথর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছিল। আমার দৃষ্টি হঠাৎ সেই স্তম্ভগুলোর উপর নির্মিত নকশাগুলোর উপর পড়লো।সেখানে অনেকগুলো অস্পষ্ট নকশা দেখতে পেলাম। গুহাটির চারদিক থেকে পাথরের স্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ ঘিরে রেখেছিলো। এখান থেকে অনুমানিক ১০০ মিটার দূরে একটি জনবসতি রয়েছে। যার নাম রাজিন।"

তাইসীর যবইয়ান সাহেব তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশেষে প্রত্নতত্ত্ববিদ রফিক দুজানী সাহেব গভীর গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এটি সেই আসহাবে কাহফের গুহা। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে খনন কাজ শুরু হয়। তার সেই সিদ্ধান্তের সমর্থনে অনেক উপাত্ত হাতে আসে। নিম্নে কিছু আলামত প্রদত্ত হলো–

১. এই গুহাটির মুখ দক্ষিণমুখী। যার অর্থ হলো, তার উপর কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটি পুরোপুরি প্রযোজ্য হয়–

وتری الشمس اذا طلعت فزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت
تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه.

"আর আপনি দেখতে পাবেন তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে যায় এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে। আর তারা ছিল গুহার প্রশস্ত চত্বরে।"

২. এই গুহার অভ্যন্তরীণ চিত্র হলো, কখনোই রোদ তার ভেতরে প্রবেশ করে না; বরং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ডান বাম দিয়ে অতিক্রম করে। গুহার ভেতর একটি প্রশস্ত চত্বর রয়েছে। সেখানে অনায়াসে আলো-বাতাস পৌঁছুতে পারে।

স্যার সাইয়্যেদ সাহেবের একটি ঘটনা

আমি আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর কাছে স্যার সাইয়্যেদ সাহেবের একটি ঘটনা শুনেছি। এখন তো তিনি আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। এখন আল্লাহর সাথে তার বুঝা-পড়া। তবে বাস্তবতা হলো, তিনি ইসলামী আকায়িদের ক্ষেত্রে যে গড়বড়ি করেছেন, তা বড় ভয়াবহ পর্যায়ের। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে যেহেতু তিনি বুযুর্গদের সান্ধিধ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং যথারীতি একজন আলেমও ছিলেন। তার চরিত্র ছিলো খুব উত্তম।

যাই হোক, আব্বাজান তার এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, একবার তিনি তার ঘরে বসেছিলেন। এবং তার সাথে কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিলো। তিনি দেখলেন, সামনের দিক থেকে জনৈক এক ব্যক্তি তার দিকে আসছে। লোকটি সাধারণ হিন্দুস্তানীদের পোষাক পরিহিত ছিল। লোকটি কাছাকাছি এসে বাইরের একটি হাওজের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার হাতে একটি ব্যাগ ছিলো। সে ব্যাগ থেকে একটি জুব্বা বের করল এবং আরবের লোকেরা মাথায় পাগড়ির উপর যে দড়ি বাঁধে, তা বের করে জুব্বা ও দড়ি দুটি পরল। এরপর কাছ আসতে শুরু করল। স্যার সাইয়েদ সাহেব দূর থেকে তা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি তার এক বন্ধুকে বলেন, যে লোকটি আসছে, মনে হচ্ছে সে এক ধোঁকাবাজ। কারণ, সে একটু আগে হিন্দুস্থানের সাধারণ পোষাক পরিহিত অবস্থায় আসছিলো। কাছে আসতে না আসতেই সে নিজের চলন পরিবর্তন করে ফেলল এবং আরবি পোশাক পরিধান করল। এখন সে এখানে এসে নিজেকে আরবীয় প্রকাশ করবে। অতঃপর টাকা পয়সা ইত্যাদি প্রার্থনা করবে।

কিছুক্ষণ পর সেই ব্যক্তিটি তার কাছে এসে ঘরের দরজায় কড়া নাড়ে। সাইয়েদ সাহেব গিয়ে দরজা খুলেন এবং অতি সম্মানের সাথে ঘরে

প্রবেশের অনুরোধ জানান। সাইয়েদ সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করেন, কোত্থেকে এসেছেন? সে উত্তরে বলল, আমি হযরত শাহ গোলাম আলী সাহেব রহ. -এর হাতে বাইআত গ্রহণ কারী এক ব্যক্তি। হযরত শাহ গোলাম আলী রা. সাহেব হলেন একজন উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। অতঃপর ঐ লোকটি তার কিছু প্রয়োজনের কথা বলেন যে, আমি এই প্রয়োজনে এসেছি। আপনি আমায় কিছু সহযোগিতা করুন। সেমনে সাইয়েদ সাহেব প্রথমত তার খুব আতিথেয়তা করেন এবং তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে অতি সম্মানের সাথে তাকে বিদায় জানান।

ঐ লোকটি চলে যাওয়ার পর সাইয়েদ সাহেবের বন্ধু তাকে বলল, আপনিও এক অদ্ভূত মানুষ! আপনি স্বচোক্ষে তার কর্মকাণ্ড ও ধোকাবাজি দেখা এবং এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরও তাকে এত সম্মান কেন করলেন এবং তাকে এত টাকা কেন দিলেন?

স্যার সাইয়েদ সাহেব বললেন, মূলত বিষয় হলো, প্রথমত সে মেহমানরূপে এসেছিল। তাই আমি তার মেহমানদারী করেছি। আর তাকে পয়সা দেওয়ার বিষয়টি হলো, তার ধোকার কারণে আমি তাকে পয়সা দিতাম না; তবে যেহেতু সে একজন বড় বুযুর্গের নাম নিয়েছে, তাই না দেওয়ার সহস আমার হলো না। কেননা শাহ গোলাম আলী সাহেব ঐ সকল আওলিয়ায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত যে, যদিও ঐ ব্যক্তিটি আরো দূরবর্তী সম্পর্কের অসীলায় আমার কাছে পয়সা চাইতো, তবুও তাকে পয়সা দেওয়া আমার জন্য ফরজ ছিলো। হয়ত আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্ককে সম্মান জানানোর কারণে আমাকে ক্ষমা করবেন। তাই আমি তাকে পয়সা দিয়ে দিয়েছি।

আমি এই ঘটনাটি আমার আব্বাজান রহ এর কাছে শুনেছি। তিনি এই ঘটনাটি তাঁর শায়খ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর কাছে শুনেছেন। হযরত থানবী রহ. এই ঘটনাটি বর্ণনার পর বলেন, একদিকে স্যার সাইয়োদ আহমদ সাহেব মেহমানের যথাযথ সম্মান করেছেন। অন্যদিকে তিনি বুযুর্গানে দীনের সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কেননা আল্লাহর ওলীদের সাথে সামান্য সম্পর্কের কেউ যদি মূল্যায়ন করে,

তবে হতে পারে আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এমন কাজের তাওফীক দান করুন। আমীন।

সম্পর্ক রক্ষা করাও ঈমানের অঙ্গ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, একবার হুযুর সা. -এর খেদমতে এক বয়স্ক মহিলা আসলেন। হুযুর সা. -তাকে খুব সম্মানের সাথে সংবর্ধনা জানালেন। তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথ বসালেন এবং তাঁর সাথে বিনয়ের সাথে কথা বললেন। তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। এরপর ঐ মহিলাটি চলে গেলেন। হযরত আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলাটি কে, যার প্রতি আপনি এত সম্মান প্রদর্শন করলেন? জবাবে হুযূর সা. বললেন,

انّها تأتينا زمان خديجة رضـــ.

এ মহিলাটি সে সময় আমাদের ঘরে যাতায়াত করত, যখন হযরত খাদীজা রা. জীবিত ছিলেন। হযরত খাদিজা রা.-এর সাথে তার সম্পর্ক ছিলো। যেন মহিলাটি হযরত খাদিজা রা.-এর বান্ধবী ছিল। তাই তাঁকে আমি এত সম্মান করেছি। অতঃপর বললেন,

أحْسن العهد من الإيمان

"কারো সাথে ভলো সম্পর্ক রক্ষা করাও ঈমানের অংগ।"

স্ত্রীর পরিবার তথা শ্বশুর বাড়ির লোকজনের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। হাদীস শরীফে আছে, এক লোক হুযূর সা. -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, হুযূর! আমার আব্বাজন ইন্তেকাল করেছেন। আমার অন্তরে এক প্রকার অস্থিরতা বিরাজ করে যে, আমি তার খেদমত করতে পারি নি। তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারি নি, যেভাবে তাঁর হক আদায় করা উচিত সেভাবে তার হক আদায় করতে পারি নি। (যে সকল লোক পিতা-মাতার খেদমত করে না, তাদের অন্তরে এরকম আফসোস তৈরি হয়। এরকম আফসোস ঐ ব্যক্তির অন্তরে তৈরি হয়। তাই সে আরজ করল যে, আমার অন্তরে হতাশা আর অস্থিরতা!) এখন আমি কী করবো? উত্তরে হুযূর সা. বললেন, এখন তুমি তোমার পিতার সাথে যাদের বন্ধুত্ব

ছিলো, সম্পর্ক ছিল, যারা তোমার পিতার নিকটাত্মীয়, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো। এর ফলশ্রুতিতে তোমার পিতার অন্তর খুশি হবে। আর তুমি তোমার পিতার খেদমত ও সম্মানে যে অবহেলা করেছো, তা কোনো না কোনো পর্যায়ে পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ!। তাই মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজন ইন্তেকালের পর তাদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তাদের সাথ মিলে মিশে চলা, এটাও ঈমানের অংশ। এমন তো নয় যে, ব্যক্তি মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার আত্মীয় স্বজনও মরে যায়; বরং তারা তো জীবিত আছেন। তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো।

দেখুন! হযরত খাদীজা রা. ইন্তেকালের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও হুযূর সা. তার বান্ধবীকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এ ছাড়া কোনো কোনো হাদীসে এসেছে যে, হুযূর সা. খাদীজা রা.-এর বান্ধবীদের কাছে হাদয়া তোহফাও পাঠাতেন। শুধু এ কারণে যে, এসব মহিলার সম্পর্ক ছিলো হযরত খাদীজা রা.-এর সাথে আর এরা তাঁর বান্ধবী ছিল।

আগা খানের ভবন

একবার আমি সুইজারল্যান্ড গেলাম। সেখানকার এক রাস্তা দিয়ে অতিক্রমকালে এক ভাই একটি বিশাল আলীশান প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বললেন, এটি আগা খানের ভবন। দেখে মনে হচ্ছিল, এটি ঝিলপাড়ে অবস্থিত পৃথিবীর আলীশান জান্নাত। কেননা এ সমস্ত রাষ্ট্রে সাধারণত লোকদের ঘর বাড়ি ছোট ছোট হয়ে থাকে। এখানে বড় বড় ঘর-বাড়ির দৃশ্য দেখা যায় না।

ভবনটির আয়তন ছিলো দুই -তিন কিলোমিটার ব্যাপী। এতে ছিলো নানা রকম বাগান, লেক, আলীশান ভবন ও একদল চাকর-বাকর। এ কথা প্রশিদ্ধ যে, অশ্লীলতা ও বিলাসিতার সকল হেয় কার্যক্রম তার এখানে বৈধ ছিল এবং মদ পানের মজমাও হত।

তখন আমি আমার মেজবানদের বললাম, লোকেরা স্বচক্ষে দেখছে যে, এ সমস্ত লোক– যারা নেতা ও সমাজের প্রধান হয়ে বসে আছে, কতটা বিলাসিতায় মত্ত রয়েছে। এ সকল কাজকে সাধারণ মুসলমানও হারাম ও

অবৈধ জ্ঞান করে। তবুও এসব লোকেরা তাদেরকে কেনো নেতা বলে স্বীকার করে? আমার এ কথা শুনে আমার এক মেজবান বললেন, কী অদ্ভুদ মিল? আপনি যে কথা আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, হুবহু এ কথাই আমি আগা খানের এক অনুসারীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তোমরা যদি কোনো নেককার মুত্তাকী ব্যক্তিকে নেতা বানাতে, তাহলে তা মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে আমীর বানিয়ে রেখেছো, যাকে তোমরা স্বচক্ষে দেখছো যে, সে বিলাসিতায় মত্ত। এ সব বিশাল বিশাল অট্টালিকা বানিয়ে রেখেছে। এসব কিছু দেখা সত্ত্বেও তোমরা তাকে কী করে ইমাম গণ্য করো?

তখন আগা খানের ঐ অনুসারী উত্তরে বলল, বিষয়টি হলো, এটি হলো আমাদের ইমামের বড় কুরবানি যে, তিনি দুনিয়ার প্রসাদ-অট্টালিকা পেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। অনন্তর আমাদের প্রকৃত ঠিকানা তো ছিল 'জান্নাত'। কিন্তু তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য জান্নাতের ঐ সকল নেয়ামতরাজি বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ায় চলে এসেছেন। আর দুনিয়ায় এ সকল নেয়ামত তো তাঁর কাছে কিছুই না। তিনি তো এর চেয়ে বেশি নেয়ামত পাওয়ার অধিকার রাখেন। হাদীস শরীফে এই বিষয়টির প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে–

أن يطاع المغوى "তথা গোমরাহকারীদের অনুসরণ করা হবে।"

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, এক ব্যক্তি ভ্রষ্টতার রাস্তায় চলছে এবং অন্যায় ও পাপাচারে মত্ত রয়েছে। তাকে কিভাবে বলছে যে, এ আমাদের ইমাম, নেতা ও প্রধান।

অনুরূপ বতমানে অনেক ভণ্ড-মূর্খ পীরদের রাজত্ব কায়েম রয়েছে। তাদেরকে যদি আপনি কখনো গিয়ে দেখেন, তো হয়রান হয়ে যাবেন। সেখানে মূর্খ-পীরদের জন্য গদি বিছানো আছে। দরবার কায়েম আছে। নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর কাজ সেখানে আঞ্জাম দেওয়া হয়। এ সত্ত্বেও তাদের অনুসারীরা তাদেরকে বলে, এরা আমাদের পীর, জমীনে আল্লাহর নমুনা-নিদর্শন। হাদীসে এদের কথাই বলা হয়েছে যে, যারা গোমরাহকারী, লোকেরা তাদের অনুসরণ করে। তাদের অনুসরণ করার কারণ হলো,

তাদের হাতে রয়েছে কিছু ভেল্কিবাজি। এসব ভেল্কিবাজির কারণে লোকেরা মনে করে যে, এরা হলো আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধি, যারা পৃথিবীতে আগমন করেছে। সুতরাং এরা যা কিছু বলবে, তা মেনে চলতে হবে এবং এর অনুসরণ করতে হবে। চাই সে কাজ হালাল হোক বা হারাম। বৈধ হোক বা অবৈধ। শরিয়ত মাফিক হোক বা না হোক।

মাওলানা মওদূদী সাহেবের সাথে বিতর্ক

হযরত থানবী রহ.-এর সোহবত প্রাপ্ত এক বুযুর্গ হযরত বাবা নাজম আহসান রহ.। বিরল স্বভাবের এই বুযুর্গ একদিন আমাকে বলেন, জনাব মওদূদী তার "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" কিতাবটিতে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেছেন। এ নিয়ে তুমি একটা কিছু লেখো!

তাই আমি এর উপর একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। তারপর মওদূদী সাহেবের পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়া হলো, আমিও তার পাল্টা জবাব দিলাম। এভাবে দু'বার জবাব পাল্টা জবাব হলো। বাবা নজম আহসান আমার দ্বিতীয় জাবাব পড়ে আমাকে একটি চিরকুট লিখলেন। চিরকুটটি আজো আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি। তিনি লিখেছেন–

میں تمہارا یہ مضمون پڑھا اور پڑھ کر بڑا دل خوش ہوا اور دعائیں نکلیں،

اللہ تعالی اسکو قبول فرمائں

"তোমার প্রবন্ধটি আমি পড়েছি। খুব খুশি হয়েছি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে দু'আও করেছি। আল্লাহ এটাকে কবুল করুন।"

তারপর তিনি লিখলেন-

اب اس مردہ بحث کو دفنا دیجئے

অর্থাৎ এবার দ্বিতীয় বারের মত আমার যা বলার আমি বলে দিয়েছি। সেখানে হক বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এরপর যদি তাদের পক্ষ থেকে কোনো জবাব আসে, তাহলে আমি যেন পুনরায় তার জবাব না দিই। আল্লাহর ওলীরা বিতর্ককে এভাবেই ঘৃণা করতেন। কেননা এতে কোনো ফায়দা নেই। যুক্তিতর্কের ফলে হক গ্রহণ করেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এতে শুধু সময় নষ্ট হয়।

কেনইবা আল্লাহর ওলীরা বিতর্ককে ঘৃণা করবেন না। রাসূলুল্লাহ সা. তো নিজেই বলেছেন, বিতর্কে জড়ানো মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বিতর্ক ও মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার হিম্মত ও তাওকীক দান করুন। -আমীন

জনৈক সাহাবীর ঘটনা

একটা সময় ছিলো, যখন মুসলমানরা কুরআনে কারীম শিক্ষা করার জন্য নানা রকম কষ্ট-ক্লেশ, পরিশ্রম-সাধনা ও কুরবানি প্রদান করতো। সহীহ বুখারীতে একটি ঘটনা এসেছে যে, সাহাবী আমর ইবনে সালামা রা. বলেন, যখন হুযুর সা. মদিনা তাইয়িবা আগমন করেন, তখন আমি ছোট্ট শিশু ছিলাম। আর আমার গ্রাম ছিল মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। আমার গোত্রের কতিপয় লোক মুসলমান হয়ে যায় এবং আমাকেও আল্লাহ তা'আলা ঈমান দান করেন। 'ঈমান' -এর পর সবচেয়ে বড় দৌলত হলো কুরআনে কারীম। আমার সাধ হলো যে, আমি কুরআনে কারীমের শব্দাবলি হিফজ করবো। কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করবো। কিন্তু আমার মহল্লার কেউ কুরআনে কারীম পাঠ করতে পারতো না এবং কুরআনে কারীম শিক্ষা করার কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। তাই আমি মহল্লার রাস্তা (যেদিক দিয়ে কাফেলা যাতায়াত করতো)-এ গিয়ে প্রত্যহ সকালে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কোনো দল অতিক্রম করলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, আপনারা কি মদিনা মুনাওয়ারা থেকে এসেছেন? যদি তারা বলতো, আমরা মদিনা থেকে এসেছি, তবে আমি তাদের কাছে নিবেদন করতাম, আপনাদের মাঝে কারো কুরআনে কারীমের কোনো অংশ মুখস্থ থাকলে আমাকে তা শিখিয়ে দিন। যার যে অংশ মুখস্থ থাকতো, আমি তার কাছে তা মুখস্থ করে নিতাম। এটা ছিল, আমার দৈনন্দিনের অভ্যাস। এভাবে কয়েক মাসের মাঝে আমি হয়ে গেলাম গোত্রের মাঝে সর্বাধিক কুরআন হিফজকারী। যখন আমার মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ হলো এবং ইমামতি করার জন্য কাউকে সামনে যেতে হতো, তখন লোকেরা আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন। কারণ সবচেয়ে বেশি কুরআন আমার হিফজ ছিলো।

মোটকথা, এরূপ কষ্ট ও সাধনার ফলে লোকেরা কুরআনে কারীম শিক্ষা করতেন। তাদের মেহনত ও কষ্টের ফলাফলে ও আল্লাহর অনুগ্রহে আলহামদুলিল্লাহ! আজ এই কুরআন তার সঠিকরূপ ও আকৃতিতে বহাল আছে। শুধু বাক্য নয়; বরং অর্থ সংরক্ষিত রয়েছে। বর্তমানে আলহামুলিল্লাহ পূর্ণ আস্থার সাথে একথা বলা যায় যে, কুরআনে কারীমের ঐ বিশুদ্ধ তাফসীর, যা হুযূর সা. -এর কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম ও সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে, তা বিশুদ্ধরূপে সংরক্ষিত রয়েছে। এতে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমনভাবে কুরআনে শব্দাবলি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি এর অর্থাবলিও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

ডা. আবদুল হাই রহ.-এর আমল

রমজান মাসে আসরের নামায মসজিদে পড়ার পর ই'তেকাফের নিয়তে মাগরিব পযন্ত মসজিদে অবস্থান করা ছিলো ডা. আবদুল হাই রহ.-এর নিয়মিত আমল। এ সময়টাতে তিনি কুরআন তেলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ, মুনাজাত ইত্যাদিতে মাশগুল থাকতেন। এটা চলতো ইফতার পর্যন্ত।

তিনি নিজের মুরিদদেরকে আমলটি করার পরামর্শ দিতেন। কারণ এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো মসিজদে কাটানো সম্ভব হয়, ই'তেকাফের ফজিলত লাভ করা যায়, আমল আদায় করা যায় এবং সবশেষে দু'আ ও মুনাজাত করারও তাওফীক হয়। রমযানের সারনির্যাস তো আল্লাহর কাছে অধিক মুনাজাত করা। কেননা, ই'তেকাফের সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন মানবহৃদয়ে আল্লাহর প্রেমে উতলা হয়ে ওঠে, তাই যে দু'আই করা হয়, কবূল হয়। এ জন্য তিনি মুরিদদেরকে এট করার পরমার্শ দিতেন, তাকিদ ও দিতেন। আলহামদুলিল্লাহ! হযরতের মুরিদদের মাঝে এ আমলেল গুরুত্ব এখনও আছে।

একবারের ঘটনা, হযরতের এর মুরিদ হযরতকে বললেন, হযরত! আপনার কথা মত আমি রমযানে আসর থেকে মাগরিব পর্যৃন্ত ই'তেকাফের নিয়তে মসজিদেই যিকির আযকার, তাসবীহ তাহলীল, ও দু'আ-মুনাজাতে

কাটাই। একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলল, সারা দিনতো বাইরেই থাকেন, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টুকু ঘরেই থাকুন, তাহলে একসঙ্গে ইফতার করে কিছু আনন্দ উপভোগ করতে পারবো। আপনি তো এ সময়টুকুও মসজিদে কাটাচ্ছেন, এতে একত্রে বসে কথাবার্তা বলা ও ইফতার করার সুযোগ হয় না। এজন্য হযরত! আমি এখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি যে, এ সময়টুকুতে কী করবো? স্ত্রীর ইচ্ছেমতে ঘরে থাকবো, না মসজিদে কাটাবো? হযরত কথাগুলো শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এ সময়টুকু মসাজিদে না কাটিয়ে আপনার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঘরেই কাটান। ঘরে থেকেই যতটুকু সম্ভব যিকির-আযকার, তেলাওয়াত ইত্যাদি করুন। এবং এক সঙ্গে ইফতার করুন।

তারপর হযরত বললেন, আমি যে আপনাকে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে কাটানোর জন্য বলেছি, এটা মুস্তাহাব আমল। আর আপনার স্ত্রী যা বলেছে, এটা তার অধিকার। স্বামীর কর্তব্য হলো, শরিয়তের গণ্ডিতে থেকে স্ত্রীর মন রক্ষা করে চলা, যা কখনো কখনো ওয়াজিবও হয়ে যায়। সুতরাং যদি আপনি স্ত্রীর এ বৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে মসজিদের ইবাদত ছেড়ে দেন। আশা করি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ঐ ইবাদতের বরকত থেকে বঞ্চিত করবেন না। কারণ, স্ত্রীর বৈধ ইচ্ছা পূরণ করাও আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশ। ইনশাআল্লাহ! এতে আপনি মসজিদে ইবাদত করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন।

মাওলানা আহমদ প্রতাবগোড়ী সাহেব রহ.

মাওলানা আহমদ সাহেব রহ. হাতে গোনা বুযুর্গ ব্যক্তিদের অন্যতম, যাদের কথা ভাবলে মনে হয়, এ যুগেও আল্লাহ ওয়ালাদের সংখ্যা এখনো হ্রাস পায় নি। তিনি একজনের মধ্যবর্তিতার মধ্য দিয়ে হযরত শাহ ফজলে রহমান সাহেব গঞ্জেমুরাদাবাদি রহ.-এর খলিফা। হযরত ফজলে রহমান সাহেবের খলিফাদের মধ্য থেকে অন্যতম বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ বদর আলী শাহ সাহেব রহ. ছিলেন তাঁর শায়খ। তাঁর সোহবতে থেকে তিনি রিয়াজত ও মুজাহাদা করেন এবং মা'রেফাতের সাধনার মঞ্জিল অতিক্রম করেন। এমনকি হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ বদর আলী সাহেব

একবার বলেছিলেন, "যদি আল্লাহ্ পাক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কী এনেছো? তাহলে আমি নিবেদন করবো, আহমদ মিয়াঁ অর্থাৎ মাওলানা মুহাম্মাদ আহমদ সাহেব প্রতাপগোড়ী কে এনেছি। হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ. একবার হযরত মাওলানা মুফতি মাহমূদ সাহেব গাঙ্গুহী রহ. (প্রধান মুফতি. দারুল উলূম দেওবন্দ)-কে জিজ্ঞেস করেন, বর্তমানে নকশবন্দিয়া সিলসিলার শক্তিশালী নিসবতের অধিকারী কে? জবাবে মাওলানা মাহমূদ সাহেব গাঙ্গুহী রহ. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমদ সাহেব রহ.-এর নাম উল্লেখ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আহমদিয়া সংগঠন

দক্ষিণ আফ্রিকার আদালতি কর্ম পদ্ধতি আমাদের দেশের কর্মপদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্ন। ওখানে বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে মূল মামলা দায়ের করার পূর্বে সংক্ষিপ্ত আবেদনরূপে আদালতের কাছে অভিযোগ তুলে ধরে সাময়িক নির্দেশ অর্জন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে বাদীকে একটি শপথনামা দাখিল করতে হয়। শপথনামায় বাদী তার অভিযোগ তুলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে বাধ্য হয় যে– "আমি এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবো। কিন্তু মামলার কার্যধারায় সময় ক্ষেপনের সম্ভাবনা আছে বলে আমার এতদিনের জন্য সাময়িক নির্দেশ প্রয়োজন। আদালত যদি বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে অভিযোগের ভিত্তি আছে বলে মনে করেন, তাহলে অপর পক্ষের অবস্থান কী (?) তা না শুনেই এক তরফা ভাবেই সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করতে পারেন। তবে পরবর্তী সময়ে বিবাদীকে তার অবস্থান তুলে ধরার জন্য শপথনামা দাখিল করতে বলা হয়। তারপর নির্দিষ্ট একটি তারিখে উভয় পক্ষের দলিল প্রমাণ শুনানি শেষে সেই এক তরফা স্থগিতাদেশ বাতিল করা হবে, না কি তা দৃঢ় করা হবে, তার ফয়সালা করা হয়। স্থগিতাদেশ দৃঢ় করণ বা বাতিল করণের পর নির্ধারিত একটি মেয়াদের ভিত্তিতে বাদীর মূল মামলা দায়ের করার অধিকার থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার আইনি পরিভাষায় একে Main Action বলা হয়। মেইন একশনের সময় উভয় পক্ষের সাক্ষ্য পেশ করা এবং মামলার বিস্তারিত কার্যধারা সম্পন্ন করার পর মামলার ফায়সালা হয়। তাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক বছর সময়ও লেগে যায়।

কেপটাউন দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বড় শহর। এটি দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে পুরাতন শহর এবং তা দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় অঞ্চল রামস উমায়েদ (Cope of Goodhoppe) -এর রাজধানী।

কেপটাউনে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার) আর কাদিয়ানীদের সংখ্যা ২০০ (দুইশ) -এরও কম। এখানে তারা "আহমদিয়া আঞ্জুমানে এশায়াতে ইসলাম নামে আহমদিয়া আঞ্জুমান লাহোর -এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সংগঠনটি কেপটাউনের পাঁচজন ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে শা'বান মাসের শেষ দিকে কেপটাউনের সুপ্রিম কোর্টে এক আবেদনে এই অভিযোগ দায়ের করে যে, তারা আমাদের লোকদের অমুসলিম সাব্যস্ত করে থাকেন। ফলে তারা মসজিদগুলোতে আমাদের ইবাদত করার এবং আমাদের মৃতদের লাশ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করার অনুমতি দেন না। আমরা এ ব্যাপারে বিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা সবিস্তার দায়ের করবো। তার ফায়সালা হতে অনেক দেরি হতে পারে বলে বিবাদীর বিরুদ্ধে মূল মামলার ফায়সালা হওয়ার আগ পর্যন্ত সাময়িক স্থগিতাদশে জারি করা হোক।

স্থগিতাদেশ দৃঢ় করার জন্য প্রথমে ৬ই আগষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরে তা পিছিয়ে নিয়ে ৯ই সেপ্টেম্বর করা হয়। এ সময় পাঁচজন বিবাদীর পক্ষে বিস্তারিত শপথনামা প্রস্তুত করা হয় এবং এ বিষয়ে দক্ষতা থাকার কারণে ওয়াটার ফলের হযরত মাওলানা মুফতি ইবরাহীম সাঞ্জালোভী এবং ডরবনের ড. হাবীবুল হক নদভীও শপথনামা দাখেল করেন।

এই শপথনামাগুলোতে মির্যায়ীদের (কাদিয়ানীদের) ইতিবৃত্ত, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর স্বরূপ ও চরিত্র, ধাপে ধাপে উত্থাপিত তার দাবিগুলো এবং খতমে নবুওয়াত আক্বীদার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার সঙ্গে মির্যায়ীরা কাদিয়ানী গ্রুপ হোক বা লাহোরী গ্রুপ হোক; কিভাবে খতমে নবুওয়াতের আক্বীদার খোলাখোলি বিরুধিতা করে নিজেদের ইসলাম ধর্ম থেকে আলাদা করে ফেলেছে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তাদেরকে এক আওয়াজে কাফের ও ইসলাম বহির্ভুত বলে সাব্যস্ত করেছে, তাও স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার পরও মির্যায়ীদের সম্পর্কে যে সব মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিলো, তার অধিকাংশ শপথনামাগুলোতে তুলে ধরা হয়। ১৯৭৪ সালে খতমে নবুওয়ত আন্দোলনের সময় মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী রহ.-এর নির্দেশে এই অধম এবং মাওলানা সামিউল হক সাহেব যে বয়ান সংকলন করেছিলাম। যা 'মিল্লাতে ইসলামিয়া কা মাওকাফ' নামে প্রকাশিত হয়েছিলো। আমার বড় ভাই জনাব মুহাম্মাদ ওলী রাজী সাহেব তার ইংরেজি অনুবাদ করেন। এটি দারুল উলূম কারাচী প্রকাশনা বিভাগ থেকে Qudianism Of trial নামে প্রকাশিত হয়। দু'বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণকালে আমি আমার কোনো কোনো বন্ধুকে গ্রন্থটি দিয়ে এসেছিলাম। শপথনামা প্রস্তুত করতে ঐ গ্রন্থ থেকে অনেক সহায়তা নেওয়া হয়।

তবে মামলার বিস্তারিত বিবরণ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আদালতের কর্মপন্থার আরেকটি বিষয় আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হলো, বিদ্যমান সময়ের মধ্যেই তিন মাস পূর্বে আদালতে জারিকৃত স্থগিতাদেশের আসরতা প্রমাণ করা হয়। কারণ মামলা চলাকালে এই স্থগিতাদেশের মুসলমানদের উপর মির্যায়ীদের (কাদিয়ানীদের) মসজিদে নামায পড়তে দেওয়া এবং তাদের মৃতদের লাশ মুসলিম কবরস্থানে দাফন করতে দেয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। এই স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে সে সূক্ষ্ম আইনি বিশ্লেষণ তুলে ধরা জরুরি ছিল, তার উল্লেখ বিবাদীর শপথনামায় ছিলো না, ফলে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সে সব সূক্ষ্ম আইনি বিষয় আমাদের মনে আসে, প্রতিনিধি দলের সম্মানিত সদস্য জনাব হাজী গিয়াস মুহাম্মাদ সাহেব (সাবেক এটর্নি জেনারেল পাকিস্তান) সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করে টাইপ করান।

সকাল আটটায় আমরা জোহানেসবার্গ থেকে বিমানযোগে কেপটাউনের উদ্দেশ্য যাত্রা করি। দশটার সময় কেপটাউনে পৌছে। আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কেপটাউনের ওলামা মাশায়েখ, বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও বিপুল সংখ্যক সাধারণ মুসলমান বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

কেপটাউনে পৌছার পর মুসলমান বিবাদীদের আইনজীবি জনাব ইসমাঈল মুহাম্মাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয় এবং মামলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা

হয়। জোহানেসবার্গ থেকে কেপটাউন পর্যন্ত প্রায় সবাই ইসমাঈল মুহাম্মাদের আইনি যোগ্যতা, ওকালতির দক্ষতা এবং তার মেধা ও প্রতিভার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো। সাক্ষাতের সময় আমরা তাঁকে বাস্তবেও তেমনি দেখতে পাই। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই যে, মামলার সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতা পেশা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তিগতভাবেই তিনি উদ্দীপনা ও হৃদয়ের আকুতির সঙ্গে মামলা পরিচালনা করেছেন।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে যে সব সূক্ষ্ম আইনি বিষয় বিন্যস্ত করা হয়েছিল, বিচারপতি আফজাল চীমা সাহেব ও হাজী গিয়াশ মুহাম্মাদ সাহেব ইসমাঈল মুহাম্মাদ সাহেবের কাছে সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করেন। প্রতিটি বিষয় তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শোনেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আমাদের সাজানো বিষয়গুলো তিনি কেবল কাজেই লাগান নি; বরং তাঁর চমৎকার বাগ্মিতা ও প্রভাব বিস্তারক উপস্থাপনায় সেগুলোকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তোলেন।

৯ই সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মামলার কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু তার আগে ৯টা বাজতেই আদালতকক্ষ কৌতুহলী মানুষের ভীড়ে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শ্রোতার আধিক্যের কারণে শেষ পর্যন্ত বড় একটি কক্ষে আদালত স্থানান্তর করা হয়। কক্ষটিতে জায়গাও বেশ প্রশস্ত ছিলো এবং উপরে শ্রোতাদের জন্য বিস্তীর্ণ গ্যালারীও ছিলো। কিন্তু মামলার কার্যক্রম শুরু হতে না হতেই আদালত কক্ষ ও গ্যালারী সম্পূর্ণ ভরে যায়। দাঁড়ানোর মত জায়গা কোথাও থাকে না। দুই দিন ব্যাপী সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মামলার কার্যক্রম চলে। এই মামলার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ ও কৌতুহল এত বেশি ছিল যে, অনেক শ্রোতা বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং সকাল থেকে মামলার কার্যক্রম শুনেন। এমনকি মুসলমান মহিলারাও সন্তানদের কোলে নিয়ে চূড়ান্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে গ্যালারীতে বসে থাকেন।

জজ ছিলেন একজন খ্রিস্টান মহিলা। মির্যায়ীদের পক্ষ থেকে দুইজন ইহুদি আইনজীবী মামলা পরিচালনা করছিলেন এবং একজন তরুণ মির্যায়ী আইনজীবী তাদের সহযোগিতা করছিলেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রধান আইনজীবী ছিলেন ইসমাঈল মুহাম্মাদ সাহেব। প্রথম দিন

মির্যায়ীদের আইনজীবী মিস্টার ইয়াঙ-এর দায়িত্ব ছিলো স্থগিতাদেশ দৃঢ়করণের জন্য দলিল প্রমাণ পেশ করা। কিন্তু তিনি দলিল পেশ করার আগে দাঁড়িয়ে এই আবেদন করেন যে, মামলায় 'আঞ্জুমানে এশায়াতে ইসলাম', লাহোর-এর পক্ষ থেকে শপথনামা দাখিল করা হয়েছে। এখন মিস্টার পিক নামের এক ব্যক্তিকে এই শপথনামায় শরিক হিসেবে মামলার পক্ষ বানানো হোক।

মূলত এই আবেদনের উদ্দেশ্য ছিলো, তাদের মামলার দুর্বলতাকে দৃঢ় করা। আসল কথা হলো, মূল শপথনামা একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে দাখিল করা হয়েছিলো এবং সংগঠনটি কেবল 'লিগ্যাল পারসন' (অস্তিত্বহীন আইনি ব্যক্তি) এর মর্যাদা রাখে। প্রকৃত পক্ষে এটি কোনো মানুষ নয়; তাই সংগঠন হিসেবে সে মানহানির দাবিদার হতে পারছিলো না। ঠিক একইভাবে কবরস্থানে সমাহিত হওয়ার এবং মসজিদে প্রবেশ করার দাবিও করতে সক্ষম ছিলো না। এই প্রেক্ষিতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে মির্যায়ীদের শপথনামার বিরুদ্ধে এই আইনি ক্রটির বিষয়টিও তুলে ধরার কথা ছিলো।

সম্ভাব্য আইনি আপত্তি দূর করতে মির্যায়ীদের পক্ষ থেকে উপযুক্ত আবেদন পেশ করা হয়। যাতে মিস্টার পিক একজন মানুষ হিসেবে শপথনামার পক্ষ সাব্যস্ত হতে পারেন এবং সংগঠনের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলেও কমপক্ষে মিস্টার পিকের আবেদন যেনো ঠিক থাকে।

জজ সাহেবা এ সময় মুসলমানদের পক্ষের আইনজীবীকে জিজ্ঞেস করেন, মিস্টার ইয়াঙ-এর আবেদনের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? মুসলমানদের পক্ষের আইনজীবী বলেন, মামলার এই পর্যায়ে এসে কোনো আবেদন পেশ করা আমাদের কাছে অত্যন্ত আপত্তি জনক। কেননা এখন পর্যন্ত মামলার যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্জুমানের শপথনামার ভিত্তিতেই বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং তারই জবাবদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এসে কোনো ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ বানানো আমাদের জন্য ন্যায় বিচারের পরিপন্থি হবে। জজ সাহেবা তখন মির্যায়ী পক্ষের আইনজীবী মিস্টার ইয়াঙ-এর আবেদন প্রত্যাখান করে তাকে প্রমাণ পেশ করতে বলেন।

৯ই সেপ্টেম্বর বৃহস্প্রতিবার মির্যায়ী পক্ষের আইনজীবী মিস্টার ইয়াঙ-এর আলোচনাতেই সারাটা দিন কেটে যায়। তিনি বার বার একই কথা

বলছিলেন যে, মির্যায়ীরা যেহেতু মুসলমান এবং তারা তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত বিশ্বাস রাখে; তাই তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করার অধিকার কারো নেই। এমনিভাবে তাদেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে বা তাদের মৃতদের লাশ কবরস্থানে দাফন করতে কেউ বাঁধা দিতে পারে না। জজ সাহেবা বারবার তাকে এ কথা বলে বাঁধা দিচ্ছিলেন, মির্যায়ীরা মুসলমান না কি কাফের? এ মুহূর্তে আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয় এবং আমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তও নয়। আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন, বছরের পর বছর ধরে মুসলমানগণ আপনাদের অমুসলিম মনে করে আসছেন এবং আপনাদের কোনো লোক মুসলামনদের কবরস্থানে সমাহিত হয় নি। তাহলে আজ এমন কি সমস্যা দেখা দিল যে, যে কারণে আপনারা স্থগিতাদেশ লাভের জন্য আবেদন করলেন?

মিস্টার ইয়াঙ তার দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও এই প্রশ্নের কোনো যুক্তিযুক্ত জবাব দিতে পারেন নি। তবে এক পর্যায়ে তিনি বলেন, স্থগিতাদেশ পাওয়ার জন্য আমাদের সাময়িক প্রয়োজন এই যে, আমাদেরকে কাফের বলা থেকে যদি কেপটাউনের ওলামা মাশায়েখকে বাঁধা প্রদান করা না হয়, তাহলে অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কাদিয়ানী ও অকাদিয়ানীদের মধ্যে যেসব বৈবাহিক রয়েছে, সেগুলো ছিন্ন হয়ে যাবে।

জজ সাহেবা তখন বললেন, কিন্তু রেকর্ডে এমন কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই, যার মাধ্যমে কোনো কাদিয়ানীর সঙ্গে অকাদিয়ানীর বিবাহ প্রমাণিত হয়। জবাবে মিস্টার ইয়াঙ বললেন, মাননীয় আদালত! এ বিষয়ে রেকর্ড থাকা জরুরি নয়। আপনার এ ব্যাপারে জুডিশিয়াল নোটিশ নেয়ার দরকার যে, মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানের বিবাহ হয় আর আহমদিয়া (কাদিয়ানীরা) যেহেতু মুসলমান, তাই তাদের আপোসে বিবাহ হয়ে থাকবে।

জজ সাহেবা তখন স্পষ্ট ভাষায় বললেন, আপনি চান যে, এভাবে আমি আপনাদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি আগেই ফয়সালা করে দেই এবং তারপর আপনাদের সঙ্গে মুসলমানদের বিবাহ হওয়ার জুডিশিয়াল নোটিশ গ্রহণ করি? এটা কী করে সম্ভব? আমার জুডিশিয়াল নোটিশ তো হলো, মুসলমান মুসলমানকে বিবাহ করে থাকে আর কাদিয়ানী বিবাহ করে থাকে কাদিয়ানীকে।

মোটকথা, সারাদিন এরকম মনোমুগ্ধকর টোকাটুকি চলে। বিকাল ৪টার দিকে যখন আদালতের সময় শেষ হতে মাত্র পনের মিনিট বাকি। জজ সাহেবা মুসলমানদের আইনজীবী ইসমাঈল মুহাম্মাদ সাহেবকে প্রমাণ পেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে তিনি দলির প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার আগেই ১৫ মিনিটে মামলার আইনি ধারাগুলোর সারাংশ একে একে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে তুলে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ লিখিত আকারে জজ সাহেবার হাতে অর্পণ করেন। তিনি বলেন, এসব জটিল আইনি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা আমি আগামীকাল পেশ করবো। তখন সেদিনের এজলাসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পর দিন ইসমাঈল মুহাম্মাদ সাহেবের তাঁর দলিল প্রমাণ পেশ করার কথা। কিন্তু তার আগেই মিস্টার ইয়াঙ দাঁড়িয়ে যান এবং পুনঃদৃষ্টি দানের জন্য তার সেই আবেদন পেশ করেন। তিনি বলেন, এই মামলায় মিস্টার পিককে বাদী পক্ষ বানানো হোক এবং দাখিল কৃত শপথনামা 'আঞ্জুমানে এশাআতে ইসলাম' ছাড়াও মিস্টার পিক-এর পক্ষ থেকে ধরে নেয়া হোক।

জজ সাহেবা তার আবেদনের বিষয়টি মুলতবি রেখে ইসমাঈল মুহাম্মাদ সাহেবকে তাঁর দলিল প্রমাণ পেশ করতে বলেন, ইসমাঈল সাহেব তাঁর বক্তব্য শুরু করেন, তিনি মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় আইনি খুটিনাটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সুবিন্যস্ত আকারে ও দৃঢ়তার সংগে তাঁর বক্তব্যে পেশ করেন।

এখানে ইসমাঈল মুহাম্মাদ সাহেবের সম্পূর্ণ বক্তব্য এবং তাঁর উপস্থাপিত যাবতীয় দলিল -প্রমাণ উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। তবে তাঁর বক্তব্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি বিশ্লেষণ আলোচনা করলে পাঠকের মনোরঞ্জনের ব্যাপার হবে নিঃসন্দেহে।

তাঁর উপস্থাপিত প্রথম আইনি বিশ্লেষণটি ছিল, বিভিন্ন আইনি দৃষ্টান্তের আলোকে আবেদনকারীর স্থগিতাদেশ লাভের অধিকার কেবল তখন নিশ্চিত হবে, যখন বাহ্যিকভাবে মামলাটি বাদীর অনুকূলে থাকবে এবং তাতে কোনো মারাত্মক সংশয় বা জটিল আপত্তি না থাকবে। শপথনামাগুলো থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তাঁর অনুসারীদের ইসলামের গণ্ডি

বহির্ভূত ও কাফের সাব্যস্ত করে থাকে। একে ভিত্তি করেই পকিস্তানের যেখানে মির্যায়ীদের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ন্যাশনাল- এসেম্বলি ও সিনেট কাদিয়ানীদেরকে অভিযোগ খণ্ডনের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই করার পর সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে। এই রায়ের প্রেক্ষিতেই পকিস্তানের সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়েছে। ঐ একই ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'রাবেতায়ে আলম আল ইসলামী' গোটা মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বদানকারী একশ চল্লিশটিরও বেশি সংগঠনের সম্মিলিত সমাবেশে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীদেরকে একবাক্যে অমুসলিম সাব্যস্ত করেছে এবং তাদের সাথে অমুসলিমদের মত আচরণ করে আসছে। এ সব বিষয়ের স্বীকৃতি আবেদনকারীর শপথনামাতেই বিদ্যমান আছে।

মুসলমানদের শপথনামাগুলোতে মির্যা গোলাম আহমদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে চয়নকৃত গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তিনি কেবল নবী ও রাসুল হওয়ারই দাবি করেনি; বরং নিজের মর্যাদার সার্বিক বিবেচনায় হযরত ঈসা আ. থেকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ঈসা আ.-কে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। নিজেকে মহানবী সা. -এর ছায়া নবী, তাঁর সমকক্ষ ও পূর্ণ প্রকাশস্থল ঘোষণা করেছেন। নাউযুবিল্লাহ! তা ছাড়া শপথনামাগুলোতে কুরআন ও হাদীস এবং ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞানের দলিলাদি ও বিশেষজ্ঞদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূল সা.-এর পর কোনো অর্থেই কোনো প্রকার নবুওয়াতের দাবিদার মুসলমান হতে পারে না।

পক্ষান্তরে মির্যায়ীদের শপথনামাতে তাদের মুসলমান হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণই পেশ করা হয় নি এবং তাদের স্বপক্ষে ইসলামী জ্ঞানে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞের বক্তব্য তুলে ধরা হয় নি। তাই স্পষ্টতই মামলার রায় তাদের পক্ষে কিছুতেই হতে পারে না।

তাছাড়া আবেদনকারী তার বিরবণীতে স্বীকার করেছেন যে, তারা "আহমদিয়া আঞ্জুমান, লাহোর" -এর একটি শাখার সদস্য। বলাবাহুল্য, আঞ্জুমানে লাহোর-এর সদস্যদের পাকিস্তানের সংবিধানে অমুসলিম সাবস্ত্য

করা হয়েছে বিধায় তাদের সদস্যরা মুসলমানদের কবরস্থানে সমাহিত হওয়ার অধিকার রাখে না। লাহোরের আঞ্জুমান তাদের উপর এই নিষেধাজ্ঞা বা তাদের অবস্থানের ব্যাপারে ওখানকার আদালতে কখনো চ্যালেঞ্জ করে নি। তাই লাহোর আঞ্জুমানের একটি শাখা কী করে মূল আঞ্জুমান (সংগঠন) -এর বিপরীত অবস্থান দাবি করতে পারে? এদিক থেকেও স্পষ্ট যে, মামলা তাদের পক্ষে নয়; বরং তাদের বিপক্ষে যাবে।

দ্বিতীয় আইনি বিশ্লেষণ হলো, স্থগিতাদেশ প্রদানের জন্য আদালতকে এই বিষয়টিও দেখতে হয় যে, বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সুবিধায় ভারসাম্য (Balance of Convience) কোন পক্ষে রয়েছে। অর্থাৎ স্থগিতাদেশ জারি করলে এবং এ অবস্থায় বিবাদী জয়ী হলে তার বেশি ক্ষতি হবে, না কি স্থগিতাদেশ জারী না করলে এবং এ অবস্থায় বাদী জয়ী না হলে তার বেশি ক্ষতি হবে।

এখানকার পরিস্থিতি হলো, কেপটাউনে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ছাব্বিশ হাজার আর কাদিয়ানীর সংখ্যা দুই শো-এর বেশি নয়। এমতাবস্থায় যদি ছাব্বিশ হাজার মুসলমানকে স্থগিতাদেশের মাধ্যমে মির্যায়ীদের অমুসলিম মনে করা সত্ত্বেও তাঁদের মসজিদে মুসলমানদের ইবাদত করার এবং তাদের কবরস্থানে ওদের লাশ দাফন করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে মূল মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত মসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস পরিপন্থি এবং মনের ইচ্ছার বাইরে এমন কাজ করতে বাধ্য হতে হবে, যা তাদের ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতিতে প্রচণ্ড আঘাত হানবে। মামলায় জেতার পর তার ক্ষতিপূরণের কোনো উপায় থাকবে না। অন্যদিকে স্থগিতাদেশ জারি করা না হলে মির্যায়ীদের কোনো অপূরনীয় ক্ষতি হবে না। মির্যায়ীরা নিজেরাই স্বীকার করেছে, গত চৌদ্দ বছর ধরে তাদের কোনো মৃত লাশ মুসলমানদের কবরে দাফন করা হয় নি। তাই মূল মামলার রায় হওয়া পর্যন্ত দুই তিন বছর যদি এই অবস্থাতেই থাকে, তাহলে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। এই প্রেক্ষিতেও সুবিধার ভারসাম্যের স্পষ্টভাবে মুসলমানদের পক্ষে রয়েছে এবং মির্যায়ীদের বিপক্ষে রয়েছে।

তৃতীয় আইনি বিশ্লেষণটি ছিলো এমন, কার্যাধীন মামলায় কোনো মানুষ শপথনামা পেশ করে নি এবং একটি আঞ্জুমান (সংগঠন) তা পেশ

করেছে। সংগঠনটি মসজিদে প্রবেশ করারও ক্ষমতা রাখে না এবং কবরস্থানে দাফন হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না। ফলে সংগঠনটির আবেদন প্রথম বিবেচনাতেই শোনার অযোগ্য। এ সময় ইসমাঈল মুহাম্মাদ সাহেব কৌতুক করে বলেন, যদি এই সংগঠন ভূমিগর্ভে সমাধিস্থ হতে পারতো, তাহলে আমরা খুবই আনন্দিত হতাম। কিন্তু কী করার আছে, কবরস্থানে সমাহিত হওয়ার জন্য তো মানুষ হওয়া দরকার।

ইসমাঈল মুহাম্মাদ সাহেব আরো বলেন, মির্যায়ীদের আইনজীবী মিস্টার ইয়াঙ তার মামলার দুর্বলতার বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন। গতকাল ও আজ তিনি মিস্টার পিককে বাদী পক্ষ বানানোর জন্য যে আবেদন করেছেন, তা তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় পরাজয় মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি। তিনি জানেন যে, আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে শপথনামা বা আবেদন আইনের দৃষ্টিতে কোলো মূল্য রাখে না। তাই মামলার একেবারে অন্তিম মুহূর্তে তিনি মামলাটি বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে মিস্টার পিককে বাদী বানাতে চাচ্ছেন। কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে একে মিস্টার ইয়াঙ-এর আবেদন মঞ্জুর করা হলে আমাদের সাথে চরম অবিচার করা হবে। আমাদের সব বক্তব্য আঞ্জুমানের দাবির জবাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমেই যদি মিস্টার পিকের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হতো, তাহলে আমাদের জবাবমূলক শপথনামায় সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হতো। ফলে ১১ টা ৫৯ মিনিটে মামলার পক্ষ বানানোর আবেদন কোনো ভাবেই মঞ্জুর হওয়ার যোগ্য নয়।

দুপুর ১২ টা বেজে গিয়েছিলো। জুমার নামাযের সময় হতে যাচ্ছিলো। জজ সাহেবা এ সময় মামলার পক্ষ বানোর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বেলা ২টা পর্যন্ত আদালত মুলতবি ঘোষণা করেন।

জুমার পর বেলা দুইটায় পুনরায় এজলাস শুরু হয়। জুমার পর বেলা দুইটায় মির্জায়ীদের দ্বিতীয় আইনজীবী ইসমাঈল মুহাম্মাদের বক্তব্যের জবাবে বক্তব্য দিতে শুরু করেন এবং তিনি মিস্টার ইয়াঙ-এর বলা কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। অবশেষে বিকাল চারটায় আদালতের সময় শেষ হওয়ার উপক্রম হলে জজ সাহেবা মামলার দলিল প্রমাণ শুনানি পিছিয়ে দেন এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত নির্দেশও শুনিয়ে দেন।

নির্দেশে তিনি বলেন, আদালতের পক্ষ থেকে যে স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছিলো, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। মামলার খরচও আবেদনকারী অর্থাৎ মির্যায়ী সংগঠনকে বহন করতে হবে। তবে মামলার ব্যয়ের পরিমাণ পরবর্তী সময়ে নির্ধারণ করতে হবে।

এই রায় ঘোষণার পর আদালত কক্ষের দৃশ্য উপভোগ্য হয়ে ওঠেছিলো। মুসলমানদের সবাই পারস্পরিক আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে একে অপরকে মুবারক বাদ জানাচ্ছিলেন। ইসমাঈল মুহাম্মাদ সাহেবের অনুরোধে কেপটাউনের শেখ নাজিম সাহেব দু'আ করেন। এভাবেই সম্পূর্ণ বিষয়টি উত্তমভাবে ও কল্যাণের সঙ্গে সমাপ্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ!

আদালতের রায়ের পরের পরিস্থিতি হলো, ২১ দিন পর্যন্ত মির্যায়ীদের মূল মামলা দায়ের করার অধিকার থাকবে। এই সময়ের মধ্যে তারা মামলা দায়ের না করলে বিষয়টি সমূলে শেষ হয়ে যাবে। তবে যদি তারা এ সময়ের মধ্যে মূল মামলা দায়ের করে তাহলে বাহ্যত তা দীর্ঘ সময় লাগবে। তখন দক্ষ ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষ্যদানের প্রয়োজন পড়বে এবং তার রায় হতে দু'তিন বছরেরও বেশি সময় লাগবে। তবে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর মামলার কার্যক্রম দীর্ঘ সময় ব্যাপী চললেও মুসলমানদের জন্য ক্ষতি কর হবে না। ইনশাআল্লাহ!

হযরত মিয়াঁ সাহেব রহ.-এর যবান হেফাজত

আমার আব্বাজানের একজন উস্তাদ ছিলেন। নাম ছিল হযরত মিয়াঁ আসগর হুসাইন। মিঁয়া সাহেব নামেই তিনি সমাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক উঁচু মানের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁকে দেখলে সাহাবায়ে কেরামের কথা মনে পড়তো। তার সঙ্গে আব্বাজানের গভীর সম্পর্ক ছিলো। এ জন্য তিনি তার নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করতেন। মিয়াঁ সাহেবও আব্বাজানকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। আব্বাজান বলেন, একদিন আমি মিয়াঁ সাহেবের খেদমতে গেলাম। তখন হযরত মিয়াঁ সাহেব বলেন, দেখো ভাই মোলবী শফী সাহেব! আজ আমরা উর্দূতে নয়; বরং আরবিতে কথা বলবো। আব্বাজান বলেন, একথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। যেহেতু এর আগে কখনো এমন হয় নি, আজ মিয়াঁ সাহেব কেন আমাকে বসিয়ে আরবিতে

কথা বলতে চাচ্ছেন? তাই আমি কৌতুহল বশত জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! আজকের কথাবার্তা আরবিতে চলবে কেন? তিনি উত্তর দিলেন, এমনিতেই মনে আসলো, তাই। আমি কারণ জানতে পীড়াপীড়ি করলাম। তখন তিনি বললেন, আসল কথা হলো, যখন আমরা দু'জন কথাবার্তা শুরু করি, তখন অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় আমরা গলদ কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে যাই। তাই আমি ভাবলাম, আজ থেকে যদি কথাবর্তা আরবিতে বলি, তাহলে যবান নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কারণ অনর্গল আরবিতে তুমিও বলতে পার না। আমিও পারি না। সুতরাং আরবিতে বললে, যবান লাগমহীন হবে না। এভাবে অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচা সহজ হবে।

অতঃপর হযরত মিয়াঁ সাহেব রহ. বললেন, আমাদের উপমা ঐ লোকের মতো, যে প্রচুর টাকা পয়সা হাতে করে বাড়ি থেকে সফরে উদ্দেশ্যে বের হলো। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পূর্বে তার সব টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেলো। এখন হাতে আছে অল্প কিছু টাকা। এ টাকা সে খুব হিসাব নিকাশ করে খরচ করে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া খরচ করে না। যেন কোনো রকম গন্তব্যে পৌছতে পারে।

অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে জীবন দান করেছেন, এটা আমাদের জন্য গন্তব্যস্থলে পৌছার টাকা পয়সা তথা পাথেয়ের মতো। অথচ আমরা আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় নষ্ট করে দিচ্ছি। যদি একে সুন্দরভাবে ব্যবহার করতাম, তাহলে গন্তব্যস্থলে পৌছার পথ সহজ ও সুগম হতো। কিন্তু আমরা আমাদের মূল্যবান এ পূঁজিকে শেষ করে দিচ্ছি। অহেতুক কথাবার্তায় সময় কাটাচ্ছি। গল্পের আড্ডা জমাচ্ছি। আরো বিভিন্ন অহেতুক কাজে জীবনকে নিঃশেষ করে দিচ্ছি। জানা নেই, আর কত দিন বাঁচবো। এখন শেষ মুহূর্তে এসে মন চায়, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো হিসেব করে চলি। মেপে মেপে চলি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে, এমন কাজ করি।

আল্লাহ যাদেরকে এ ধরনের পবিত্র চিন্তা দান করেছেন, তাদের অবস্থা এমনই হয়। তারা ভাবে, আল্লাহ যবান দিয়েছেন, তাই এর যথাযথ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এর সঠিক ব্যবহার হওয়া উচিত। গলদ স্থানে যেন এর ব্যবহার না হয়- এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

দুনিয়া হচ্ছে মৃত লাশ

হযরত মিয়াঁ সাহেব রহ. -এর অভ্যাস ছিল, তিনি দিনের প্রতিটি ঘটনাকে শিক্ষণীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করতেন। কোনো কিছু ঘটে গেলে তার থেকে শিক্ষা ও নসীহত গ্রহণ করতেন। হযরতের বাসা ছিল দারুল উলূম থেকে যথেষ্ট দূরে "মহল্লায়ে ক্বেলআতে"। মূল শহর থেকে বেশ বাইরে। পথিমধ্যে খানিকটা জঙ্গলও পড়ত। দারুল উলূম দেওবন্দে যোগদানের পর হযরতের অভ্যাস ছিল, যে কামরায় তিনি গ্রন্থ প্রকাশনার কাজকর্ম সারতেন, সে কামরায় তিনি দরসের আগে পরে কিছু সময় বসতেন। 'দারুত তাসনীফ ওয়াল ইশাআত" (সংকলন ও প্রকাশনালয়) নামে কামরাটি প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রদ্ধেয় আব্বাজানও অবসর পেলেই এখানে বসে যেতেন।

একদিন তিনি বাসা থেকে এসে কামরায় বসে আব্বাজানকে বললেন, আজ আমি এক চমৎকার কৌতুক দেখেছি। আব্বাজান কাহিনী শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, 'মহল্লায়ে কোটলা' -এর বাইরের জঙ্গলে কিছু বাচ্চা মেয়ে হাতাহাতি করছিলো। একজন আরেকজনকে মারছিলো। কাছে গিয়ে জানলাম, এরা সবাই মিলে জঙ্গল থেকে গোবর কুড়িয়ে এনে এক স্থানে স্তুপ করেছে। এ দেখে প্রথমত আমার হাসি পেয়েছিল। এ দুর্গন্ধময় অংশের কম-বেশ নিয়ে প্রথম ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। অপবিত্র বস্তু নিয়ে এরা লড়ছে। আমি তাদের অপরিপক্ক বুদ্ধি ও বালকসূলভ মানসিতার উপর কৌতুল অনুভব করে তাদের ঝগড়া মেটাতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। তখন হঠাৎ কুদরত আমার মনে একটি কথা জানিয়ে দিল যে, এদের নির্বুদ্ধিতার উপর যে হাসছে, দুনিয়ার ধন সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে যারা আজ লড়াই করছে সে যদি তাদের অবস্থাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করত, তাহলে নির্ঘাত সে বুঝতে পেত, ঐ সকল প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও নিপুন প্রজ্ঞার অধিকারীদের লড়াই এ সকল শিশুদের ঝগড়া থেকে কোনোমতেই ভালো নয়। যে বস্তুর মধ্য থেকে খানিক পরেই আমার অধিকার আর থাকবে না বা কিছুদিন পর যার ধ্বংস অনিবার্য; সে সব জিনিস আখেরাতের অফুরন্ত নেয়ামত রাশির মোকাবেলায় এক টুকরো গোবর থেকে উত্তম কিছু নয়। হাদীস শরীফে রাসূল সা. এরশাদ করেন,

الدنيا جيفة وطالبها كلاب

(দুনিয়া হচ্ছে মৃত লাশ, কুকুরই যা খুঁজে বেড়ায়।)

দেখুন! এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা প্রতিদিন সবার চোখের সামনে ঘটছে। কিন্তু তার থেকে শিক্ষা অর্জন করার মত সেই প্রখর দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি ক'জনেরই বা আছে?

তুমি এ বিষয়ে জান না?

একদিন শ্রদ্ধেয় আব্বাজন ও আমি মাগরিবের নামায পড়ে মিয়াঁ সাহেবের বাসায় গেলাম। তিনি বললেন, আম খাবে? আব্বাজান বললেন, আম? তাও আবার আপনার দেওয়া। সোনায় সোহাগা! অবশ্যই, মিয়াঁ সাহেব উঠে এক টুকরি আম নিয়ে রাখলেন। চামড়া ও বীচি রাখার জন্য একটি খালি টুকরিও সামনে রাখলেন। আম খাওয়া শেষ হলে আব্বাজন বাকল, ও বীচির টুকরি নিয়ে উঠে চললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, টুকরি নিয়ে কোথায় চললে? আব্বাজান বললেন, বাইরে ফেলে দিতে যাচ্ছি। তিনি বললেন, ফেলতে পারবে? আব্বাজান বললেন, এগুলো ফেলা আবার এমন কোনো বিশেষ বিদ্যা, যা শিখতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তুমি তা জান না। আমার কাছে দাও। টুকরি নিয়ে তিনি প্রথমে বীচি বাকল থেকে আলাদা করে ফেললেন। বাইরে নিয়ে এসে রাস্তার ধারে অল্প অল্প দূরত্ব রেখে নির্দিষ্ট স্থানে বাকল ফেলে দিলেন এবং বিশেষ একস্থানে বীচিগুলো ঢেলে দিলেন।

আব্বাজান তখন তাঁকে এ কাজের কারণে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমার প্রতিবেশিদের অধিকাংশ গরীব মিসকিন। রুটি যব যোগার করাই তাদের জন্য নেহায়েত কষ্টকর। তারা যদি একস্থানে এতগুলো ফলের বাকল দেখে, তাহলে তাদের নিজেদের সীমাহীন দারিদ্রের অনুভূতি জেগে উঠবে। অর্থ শূন্যতার উপর কষ্ট হবে। আর আমিই হবো তাদের সে মনবেদনার কারণ। এ কারণেই তা ভিন্ন ভিন্ন স্থনে ফেলেছি। তাও এমন স্থানে যেখান দিয়ে জন্তুদের পাল যায়। এ বাকল গুলো তাদের কাজে আসবে। আর বীচি এমনস্থানে ফেলেছি। যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করে। তারা এগুলো ভুনা করে খেয়ে ফেলবে। এই বাকল ও বীচিও এক নেয়ামত, যা নষ্ট করা কখনো উচিত হবে না।

এখানে একথা লক্ষণীয়, মিয়াঁ সাহেব রা. নিজে কমই আম খেতেন। সাধারণত মেহমানদের জন্য রেখে দিতেন এবং মহল্লার গরীব শিশুদেরকে ডেকে ডেকে খাওয়াতেন। তারপরও যেন গরীবদের দুঃখবোধের কারণ না হন, এ জন্য বাকল ও বীচি এক জায়গায় ফেলা থেকে সংযত থেকেছেন। এ কারণে অনেক ফকীহবিদ বাজারের খাবার না খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কেননা এগুলোর উপর গরীবদের দৃষ্টি পড়ে এবং এগুলোর কারণে তাদের হৃদয়ে বঞ্চনার কষ্ট জাগে।

দেখুন! এ সকল আল্লাহ ওয়ালাগণ দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডের কতটা প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। তারা কেমন করে প্রতিটি বস্তুর যথার্থ হক আদায় করতেন।

যাতে বদনামী শুধু একজন আলেমের না হয়

প্রসিদ্ধ আলেমে দীন এক বুযুর্গের সাথে কোনো এক রাজনৈতিক বিষয়ে হযরত মিয়াঁ সাহেবের প্রকাশ্যে প্রচণ্ড মতনৈক্য হয়। কিন্তু তারপরও কেউ ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে কোনো অনুচিৎ কথা বললে হযরত তাকে শক্ত ভাবে সতর্ক করে দিলেন। মৌলিকভাবে তাদের এখতেলাফ ছিলো রাসূলে আকরাম সা.-এর সেই অমিয় বাণী اختلاف امتی رحمة "আমার উম্মতের পারস্পরিক মতনৈক্যও রহমত বটে"-এর বাস্তব নমুনা। মতনৈক্যের ক্ষেত্রে সামান্যতম সীমা লংঘনও ছিলো তাদের রুচিবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

সেই ভিন্ন মতাদর্শী বুযুর্গ একবার অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে ইস্তিস্কার নামায আদায়ের ঘোষণা দিতেন। মিঁয়া সাহেব সম্ভবত কাশ্‌ফ (ওলীদের মনে অজানা খবরের প্রকাশ) -এর মাধ্যমে জেনেছি, এ দিন বৃষ্টি হবে না। কিন্তু তারপরও তিনি আব্বাজানকে বললেন, মিয়াঁ! আজতো বৃষ্টি হবে না। অবশ্য, নামাযের সওয়াব হাসিল করার জন্য যেতে হবে। আব্বাজান তাঁর সাথে নামায আদায় করলেন। বৃষ্টি না হওয়ার কথা ছিল, হয় নি।

সেই বুযুর্গ দ্বিতীয় দিনেও নামাযের এ'লান দিলেন। সে দিনেও তিনি প্রথম দিনের মত মন্তব্য করে নামায পড়তে চলে এলেন এবং বৃষ্টি ছাড়াই ফিরে আসেন। তৃতীয় দিন পুনরায় নামাযের ঘোষণা দিলেন। এ দিনেও মিয়াঁ

সাহেব নামায পড়ার জন্য মাঠে চলে এলেন এবং সেই বুযুর্গকে নিজ থেকে সেঁধে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আজ আমি নামায পড়াবো। সবাই বিস্ময়াবিভূত হয়ে গেলেন। যেই মিয়াঁ সাহেব ওয়াক্তিয়া নামাজেই সকলের শত অনুরোধ সত্ত্বেও অগ্রসর হন না। আজ তিনি নিজেই নিজেই ইমামতির জন্য নিজেকে পেশ করছেন। অবশেষে তাঁর ইমামতিতে ইস্তিস্কার নামায শুরু হলো। হযরতের ভক্তদের মনে ধারণা উঁকি মারছিলো, আজ অবশ্যই বৃষ্টি হবে। সম্ভমত মিয়াঁ সাহেব কাশফের মাধ্যমে জেনে আজ নিজেই অনভিপ্রেত ভাবে ইমামতির জন্য পা বাড়িয়েছেন।

কিন্তু আজো সূর্য জ্বলছিলো প্রচণ্ড তাপমাত্রা নিয়ে। কোথাও বৃষ্টির কোনো নাম গন্ধও নেই। বাধ্য হয়ে সকলেই হাতাশ হৃদয় নিয়ে ফিরে এল। পরে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরতকে তার রুচিবোধের এই আকস্মিক পরিবর্তন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি তো সকলের শতও অনুরোধেও ওয়াক্তিয়া নামাযে ইমামতি করেন না, আজকের ব্যাপারটি কী বলুন তো? হযরত বললেন, আমার উদ্দেশ্য ছিল, যে আলেমে দ্বীন দুই দুই দিন নামাজ পড়িয়েছেন, তাঁর উপর যেনো কারো খারাপ ধারণা না জন্মে। আমিও যেন তাঁর মাঝে শরিক হয় যাই। আমি জানতাম, ঐ সময় বৃষ্টি হওয়া তাকদীরে নেই। কোনো আলেম বা মহৎ ব্যক্তির এখানে অপরাধ কি? আর যদি বদনামী হয়েও যায়, তাহলে তা কেন শুধু একজন আলেমই বহন করবে?

প্রতিবেশীদের সবার বাড়ি কাঁচা

হযরত মিয়াঁ সাহেব রহ. আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের অধিকার ও মানসিকতার উপর হযরত যেভাবে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন। মিয়াঁ সাহেবের ঘরের সিংহভাগই কাচা ছিল, যা প্রতি বছরই মেরামত করতে হত। অন্যথায় ভেঙ্গে পড়ার আশংকা থাকত। হযরত প্রতি বছর বর্ষার শুরুতে তা সেরে ফেলতেন। তখন ঘরের যাবতীয় আসবাব বাইরে নিয়ে আসতে হত। একদিন এ কাজ চলাকালে আব্বাজান তাঁকে বললেন, হযরত! প্রতি বছর আপনাকে এ কাজ করতে হয়। এভাবে প্রতি বছর যে টাকা ব্যয় হয়, তা একত্র করা হলে পাঁচ সাত বছরের টাকা দিয়েই ইটের শক্ত ঘর বানানো যাবে।

আচরণগত ভদ্রতার কারণে কারো কথা নাকচ করা হযরতের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। বড় উদারতা ও উদ্দীপনার সাথে তিনি বললেন, মাশাআল্লাহ! আপনি কত বড় বুদ্ধির কথা বলেছেন। আসলেও তো পাঁচ সাত বছরের মেরামত ব্যয় একত্র করলে তা দিয়ে পাকা ইটের ঘর বানালে এ কষ্ট থেকে নাজাত মিলবে। বুড়ো সুড়ো হয়ে গিয়েছি তো; তাই এভাবে একত্র করার বিষয় মাথায় আসে নি।

এতটুকু বলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর রহস্য খুলে বললেন, আমার প্রতিবেশীদের সবাই গরীব ও তাদের ঘরগুলো কাঁচা। এমতাবস্থায় মিয়াঁ সাহেবের কি ভালো লাগবে। সে তার ঘর পাঁকা করে বসে থাকবে আর প্রতিবেশীদের দুঃখ হবে।

সে সময় আমি বুঝলাম, হযরত কত উঁচু মাকামের লোক। তাঁর কাজকর্ম দেখে বুঝা যাবে না, তিনি কতবড় রহস্যের আধার। প্রতিবেশী ও অসহায়দের প্রতি মনোযোগ রাখা হযরতের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। অথচ বিয়ষটির প্রতি অনেকের নজর পর্যন্ত পৌঁছে না।

হযরতকে এরপরও প্রতি বছরই নিয়মিত এই বাৎসরিক কষ্ট সহ্য করতে দেখেছি। এরপর আশেপাশের প্রত্যেকের ঘর যখন পাকা হয়ে গেলো, তখন তিনি নিজের ঘর পাকা করলেন।

এ সকল বুযুর্গদেরকে আমাদের সুমহান পূর্বসূরীদের সত্যিকার অনুসারী বলা যায়। হযরত ফারুকে আ'যম রা. -এর খেলাফতকালে একবার মদিনায় ঘির অভাব দেখা দেয়। তখন আমীরুল মুমিনীন সাইয়িদুনা উমর ফারূক রা. ঘি খাওয়া ছেড়ে দেন এবং বলেন, যতদিন না মদিনার সর্বসাধারণ ঘি খাবে, ততদিন পর্যন্ত আমি ঘি খাবো না।

এতো নেয়ামতের অকৃজ্ঞতা

হাদীস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি একেবারে নিম্নমানের পোশাক পরে রাসূল সা. -এর দরবারে এসেছিল। লোকটির অবস্থা দেখে রাসূল সা. তাকে বললেন,

ألك مال؟ قال نعم، قال من أي المال؟ قال قد أتاني الله من الإبل والغنم و الخيل والرقيق، قال : فإذا أتاك الله مالًا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته.

"তোমার নিকট সম্পদ আছে কি? বলল, হ্যাঁ, আছে! রাসূল সা. বললেন, তোমার নিকট কী ধরনের সম্পদ আছে? বলল, উট, ঘোড়া, ছাগল, গোলাম-বাদী সব ধরনের সম্পদ আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। রাসূল সা. বললেন, তাহলে এর কিছু আলামত তোমার পোশাকের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া উচিত।" -আবূ দাউদ, কিতাবুল লিবাস, হাদীস : ৪০৬৩

কেননা, তোমার ময়লা মাখা পোশাক প্রকারান্তরে আল্লাহর নেয়ামতের না শুকরি।

আমি অনুমতি দিচ্ছি

হযরত আবূ মাসউদ আল বদরী রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল সা. কে দাওয়াত দিয়েছিল। তার সাথে আরো চারজন ছিল। ঐ জামানায় কোনো লৌকিকতা ছিল না হেতু রাসূল সা. অনেক সময় নিজের সঙ্গে আরো দু'একজন নিয়ে নিতেন। এখানে লোকটি দাওয়াত দিয়েছিল রাসূল সা. সহ মোট পাঁচ জনের। রাসূল সা. যখন দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। পথিমধ্যে আরো একজন যোগ হয়ে গেল। আজকাল যেমনিভাবে কোনো বুযুর্গকে দাওয়াত দেওয়া হলে সঙ্গে আরো দু'একজন আসেন। যখন তিনি মেজবানের বাড়িতে পৌছুলেন, মেজবানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে চলে এসেছে, তুমি চাইলে তাকে মেহমান হওয়ার অনুমতি দিতে পার। অন্যথায় সে ফেরত চলে যাবে। মেজবান বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিলাম।

এ হাদীসের মাঝে রাসূল সা.-এর যে শিক্ষাটি রয়েছে, তা হলো- কারো বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেলে যদি তোমার সঙ্গে এমন ব্যক্তিও যায়, যে দাওয়াত প্রাপ্ত নয়, তাহলে প্রথমে মেজবানের অনুমতি নিয়ে নিবে। তারপর দাওয়াত খাবে। কেননা এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে চলে আসে সে যেন চোর হয়ে আসল আর ডাকাত বনে চলে গেলো

দাওয়াতের পবিবর্তে এক শো রূপি

আমাদের এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রহ.। আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন, আমীন। আব্বাজানের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। লাহোর থাকতেন একবার করাচীতে প্রোগাম করলেন। সে সুবাদে দারুল উলূম কাওরাঙ্গীতে আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন। আব্বাজান খুবই খুশি হলেন। সকাল ১০ টার দিকে তিনি দারুল উলূম পৌছে গিয়েছিলেন। আব্বাজান জিজ্ঞেস করলেন, আজকে আপনার বিশ্রাম কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, আগরা কলোনীতে এক ভদ্র লোকের বাসায়। আব্বাজান বললেন, সেখান থেকে কখন ফিরবেন? উত্তর দিলেন, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ! লাহোরের উদ্দশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবো।

যা হোক, সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনার যখন তিনি ফিরতে চাইলেন, তখন আব্বাজান তাকে বললেন, ভাই মোলভী ইদরীস সাহেব! আপনি অনেক দিন পর আমার এখানে এসেছেন। মনে হচ্ছে, আপনাকে একটু দাওয়াত করি। কিন্তু ভাবলাম, আজকে আপনার বিশ্রাম আগরা তাজ কলোনীতে, আর আমি থাকি কাওরাঙ্গীতে। এখন যদি বলি অমুক সময় আমার এখানে এসে খানা খাবেন। তাহলে আপনি মহা বিপদে পড়ে যাবেন। কারণ আগামীকাল আবার আপনাকে চলে যেতে হবে। হয়তো অনেক কাজ আছে। তাই মন চাচ্ছে না, আপনাকে দ্বিতীয়বার টেনে এনে কষ্ট দিবো। সুতরাং দাওয়াতের পরিবর্তে আমার থেকে এক শো রুপি হাদিয়া গ্রহণ করুন। মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী রহ. ঐ একশ' রুপির নোটটি নিজের মাথার উপর রাখলেন এবং বললেন, আপনি তো আমাকে বিরাট নেয়ামত দান করেছেন। দাওয়াতের ফযীলতও লাভ করলেন, অথচ অতিথির কোনো কষ্ট ভোগ করতে হলো। এরপর অনুমতি নিয়ে বিদায় নিলেন।

এটাকেই বলে সাদা সিধে জীবন এবং মেহমানের আরামের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দান। হযরত মুফতি সাহেবের স্থলে অন্য কেউ হলে বলতো, আরে আপনি লাহোর থেকে করাচী এসেছেন। আর আমার বাসায়

দাওয়াত খাবেন না, এটা হতে পারে না। যত কষ্টই হোক, আমার এখানে চারটা ডাল ভাত হলেও খেয়ে যাবেন। আর ইদরীস সাহব রহ. -এর স্থলে অন্য কেউ হলে বলত, আমি কি তোমার দাওয়াতের কাংগাল? পয়সা দিচ্ছো কেন? আমি কি ফকির যে, তমি আমাকে এই জন্য টাকা দিচ্ছো যে, এটা দিয়ে আমি খাবার খাবো?

ডালও বিস্বাদ খাবারে নূরের অনুভূতি

আব্বাজান রহ.-এর নিকট একাধিকবার ঘটনাটি শুনেছি। দেওবন্দে একজন ঘাষবিক্রেতা ছিলেন। ঘাস কেটে বাজারে বিক্রি করতেন। এর মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। এক সপ্তাহে তিনি ছয় পয়সা আয় করতেন। সংসারে তিনি একাই ছিলেন। তাই এই ছয় পয়সাকে ভাগ করতেন এভাবে– দুই পয়সা দিয়ে নিজের জন্য খাবার কিনতেন। দুই পয়সা দান করে দিতেন। অবশিষ্ট দুই পয়সা নিজের কাছে জমা করতেন। একমাস পর যখন কিছু পয়সা জমা হতো, তা দিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের বুযুর্গদের দাওয়াত করে খাওয়াতেন। দাওয়াতে বিস্বাদ চাল রান্না করতেন ও ডাল পাকাতেন। এ দিয়েই পরিবেশন চলতো। আব্বাজান রহ. বলেন, দারুল উলূম দেওবন্দ-এর সমকালীন মুহতামিম মাওলানা ইয়াকূব নানূতবী রহ. বলতেন, পুরো মাস আমরা এই লোকের দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকতাম। কারণ, এ লোকের বিস্বাদ চাল ও পাতলা ডালের মাঝে যে নূর অনুভব করতাম, সে নূর পোলাও-বিরানীর শানদার দাওয়াতেও অনুভব হতো না।

সুন্নাতের অভ্যাস

হযরত ড. আব্দুল হাই রহ. বলেন, একবার আমি নামাযের উদ্দেশ্যে এক মসজিদে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর পানি পান করার প্রয়োজন হলো। মসজিদের মধ্যে পানি পান করার জন্য একটি ড্রাম রাখা ছিলো। ড্রাম থেকে পানি নিলাম এবং নিজ অভ্যাস মতো এক জায়গায় বসে পান করা শুরু করলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললো, আপনি বসার প্রতি এত গুরুত্ব দিলেন কেন? দাঁড়িয়ে পান করলেই তো

পারতেন। ভাবলাম, এ লোকের সাথে এত কথা কী বলবো? তাই তাকে বললাম, ভাই! আসলে এটা আমার অভ্যাস। আমি সব সময় বসে পান করি। লোকটি বলল, আপনি তো দেখি বিস্ময়কর কথা বলছেন। সুন্নতের অভ্যাস হয়ে যাওয়া এটা কী চাট্টিখানি কথা!

আসলে মানুষের অভ্যাস তো অভ্যাসই। অভ্যাসটা যদি সুন্নতের উপর হয় তাহলে কতই না ভালো হয়। এতে সওয়াবের ভাণ্ডারও অর্জন হয়ে যায়।

বরকতময় দিরহাম, ঘাম ও চুল

* বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের রা.। একবার রাসূল সা. তাঁকে কিছু দিরহাম দিয়েছিলেন। তিনি দিরহামগলো খরচ করেন নি। আজীবন নিজের কাছে সযত্নে রেখে দিলেন। রাসূল সা.-এর দানকৃত দিরহাম বরকতময় মনে করে এভাবে তার মূল্যায়ন করলেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে সন্তানদেরকেও অসিয়ত করে বললেন, 'দিরহামগুলো আমাকে আমার প্রিয়তম হাবীব সা. দান করেছেন। এগুলো তোমরা কখনও খরচ করবে না। বরকত হিসেবে দিরহামগুলো নিজেদের কাছে রাখবে।" পরবর্তীতে দেখা গেছে, হযরত জাবের রা.-এর বংশে দীর্ঘকালব্যাপী এগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছিলো। অবশেষে অনাকাঙ্ক্ষিত এক পরিস্থিতিতে সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

* মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে সালীম রা.। প্রিয় নবী সা. কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি বলেন, 'একদিন দেখতে পেলাম, প্রিয়নবী সা. শুয়ে আছেন। গরমের মওসুম ছিলো। প্রিয়তম সা.-এর পবিত্র শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছিলো। আমি একটি শিশি নিলাম। ঘামগুলো যত্নের সাথ শিশিতে ভরে রাখলাম। কস্তুরি কিংবা জাফরানের সুগন্ধি নবীজী সা. -এর ঘামের সুগন্ধির কাছে কিছুই মনে হলো না। আমার ঘরে সুগন্ধি ব্যবহারের প্রয়োজন হলে এখান থেকে সামান্য একটু নিতাম এবং অন্য সুগন্ধির সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতাম। বরকতের উদ্দেশ্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঘামগুলো আমার ঘরেই ছিলো। ব্যবহার করতে করতে একদিন শেষ হয়ে গেলো।

* এক মহিলা সাহাবী বলেন, প্রিয়নবী সা.-এর কিছু চুল সৌভাগ্যক্রমে আমার হাতে আসে। আমি একটি শিশির ভেতর পানি ঢুকিয়ে বরকতময়

চুলগুলো সেখানেই রেখে দিলাম। আমাদের কেউ অসুস্থ হলে শিশিটি থেকে এক ফোঁটা পানি অন্য পানির সঙ্গে মিশিয়ে থাকতাম এবং রোগীকে পান করাতাম। এতে রোগ ভালো হয়ে যেতো।

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সা. থেকে প্রাপ্ত জিনিসের এভাবে মূল্য দিয়েছেন। বরকত লাভের নিয়তে আজীবন সংরক্ষণ করেছেন। তারপর বংশ পরম্পরায় সেগুলো সংরক্ষিত হয়েছে।

ডান দিক অগ্রগণ্য

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে পানি মিশ্রিত কিছু দুধ নিয়ে এলো। এ মিশ্রণটা ছিলো বিশেষ কোনো কারণে; দুধ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নয়; বরং আরবের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলো, নির্ভেজাল দুধের চেয়ে পানি মিশ্রিত দুধের মধ্যে তুলনামূলক ভিটামিন অধিক। রাসূলুল্লাহ সা. উক্ত দুধ থেকে কয়েক ঢোক পান করে বাকিটুকু উপস্থিতদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। সে সময় তাঁর ডান দিকে উপবিষ্ট ছিলো এক গ্রাম্য আরব। আর বাম দিকে উপবিষ্ট ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.। রাসূলুল্লাহ সা. অবশিষ্ট দুধটুকু প্রথমে হযরত আবূ বকর রা.-কে না দিয়ে ডান দিকে উপবিষ্ট গ্রাম্য লোকটিকে দিলেন এবং বললেন, "الأيمن فالأيمن" "যে ব্যক্তি ডান দিকে আছে, সর্বপ্রথম সেই পাওয়ার অধিক হকদার।"

একটু ভাবুন! হুযূর সা. ডান-বামের এই বিন্যাসের কতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মুজাদ্দেদে আলফেসানী রহ.-এর ভাষায় সিদ্দীক বলা হয়, ঐ ব্যক্তিকে যিনি নবীর প্রতিচ্ছবি হন। রাসূল সা. আয়নার সামনে দাঁড়ালে তাঁর সত্তা যদি নবী হয়, তাহলে আয়নার দেদীপ্যমান প্রতিচ্ছবির নাম হলো সিদ্দীক। রাসূল সা.-এর খলিফা বলতে বুঝায়- সিদ্দীকের ব্যক্তিসত্তার মাঝে তা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। আম্বিয়ায়ে কেরামের নবুওয়াতের মর্যাদার পরবর্তী স্থান যে ব্যক্তির, তিনি হলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.। তাই হযরত ওমর রা. একবার সিদ্দীকে আকবর রা. কে বলেছিলেন, গোটা জীবন যে সব আমল করেছি, সবগুলো আপনি নিয়ে নিন, তবে এর বিনিময়ে সেই এক রাতের ছওয়াব আমাকে দান করুন, যে রাতে আপনি প্রিয় নবী সা. -এর সাথে হেরা গুহায় কাটিয়েছিলেন। এত বড় মর্যাদার

অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাসূল সা. দুধের পেয়ালাটা আবূ বকর রা. কে দেন নি; বরং গ্রাম্য ব্যক্তিটিকে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এর কারণও বলে দিয়েছেন যে, "الأيمن فالأيمن" "ডানের লোকের হক বেশি। ডানের পর আসবে বামের পালা।" একটু ভাবুন, বন্টনের ক্ষেত্রে ডানকে প্রাধান্য দেওয়ার গুরুত্ব কত বেশি।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর বিচক্ষণতা

ডান দিক অগ্রগণ্য হওয়ার বিষয়টি অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, একবার হুযূর সা.-এর খেদমতে কিছু পানীয় হাদিয়া স্বরূপ এলো। রাসূল সা. তা পান করার পর কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেলো। তখন মজলিসে ডান পার্শ্বে এক নওজোয়ান বসে ছিলো। আর বাম পাশে বয়স্ক সাহাবায়ে কেরাম বসে ছিলেন, যারা বয়সের পাশাপাশি জ্ঞান-অভিজ্ঞতায়ও অধিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হুযূর সা. ভাবলেন, ইসলামী শিষ্টাচার ও নীতির দাবি হলো অবশিষ্ট পানি নওজোয়ান সাহাবীকে প্রথমে দেওয়া। অন্যদিকে বামপার্শ্বে বড় বড় সাহাবীরা বসে আছেন, তাদের মর্যাদা ও সম্মানের বিবেচনায় তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার। তাই রাসূল সা. নওজোয়ানকে সম্বোধন করে বললেন, তোমার বায়ে বড় বড় বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ বসে আছেন। পানীয় তুমি পাওয়ার অধিক দরকার। কারণ, তুমি ডান দিকে বসে আছো। এখন যদি তুমি অনুমতি দাও, তাহলে আমি তাদেরকে দেবো। এ নওজোয়ান ছিল খুব বিচক্ষণ। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অন্য কোনো বিষয় হলে অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রাধান্য দিতাম। কিন্তু এটি হলো, আপনার বরকতময় ঝুটা। আপনার ঝুটার ক্ষেত্রে আমি অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে পারবো না। সুতরাং আমি পাওয়ার হকদার হলে আপনি আমাকে তা দিন! এরপর হুযূর সা. তাঁর হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, নাও! তুমিই নাও। এই নওজোয়ান হলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। -মুসলিম শরীফ, কিতাবুল আশরিবা, বাবু ইস্তিহবাবি ইদারাতিল মা ওয়াল লাবান

অমুসলিমরা ইসলামী শিষ্টাচার আপন করে নিয়েছে

একবার আমি আব্বাজানের সঙ্গে ঢাকা (বাংলাদেশ) সফরে গিয়েছিলাম। ভ্রমণ ছিলো বিমানে। পথে আমার নিম্নচাপ হলো। আপনারা হয়তো

জানেন যে, বিমানে বাথরুমের বেসিনের কাছে একটি বাক্য লেখা আছে "বেসিন ব্যবহারের পর কাপড় দ্বারা মুছে রাখুন, যেন পরবর্তী ব্যবহার কারীর জন্য ঘৃণার কারণ না হয়।"

আমি বাথরুম থেকে যখন ফিরে এলাম আব্বাজান বললেন, বেসিনের উপরে যে বাক্যটি লেখা আছে, তা মূলত ওটাই, যা আমি তোমাদেরকে বারবার বলে থাকি। অপরকে কষ্ট না দেয়াই দ্বীন। এটি আজ অমুসলিমরা গ্রহণ করে নিয়েছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা এ কথাগুলোকে আজ দীন মনে করি না। এ সব শিষ্টাচার আমরা দূরে ঠেলে দিয়েছি। বিধায় অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াকে "দারুল আসবাব" বানিয়েছেন, এখানে আমল অনুপাতে ফলাফল পাওয়া যাবে।

এটি মজলিসের আদবের পরিপন্থি

হযরত ড. আবদুল হাই সাহেব রহ. হযরত থানবী রহ.-এর এই ঘটনাটি শুনিয়েছেন যে, একবার হযরত থানবী রহ.-এর মজলিস চলছিল। হযরত ওয়াজ করছিলেন। ঐ মজলিসেই এক ব্যক্তি দেওয়াল বা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অহংকারীর মত বসে গেল। এভাবে ঠেক লাগিয়ে বসা মজলিসের আদবের পরিপন্থি। যে ব্যক্তিই মজলিসে আসতো, সে নিজের আত্মশুদ্ধি করার জন্য আসতো। তাই তারা যদি কোনো ভুল করত, তাহলে হযরতের দায়িত্ব ছিলো, তাকে তা থেকে বিরত রাখা। তাই হযরত থানবী রহ. ঐ ব্যক্তিকে থামিয়ে বললেন, এভাবে বসা মজলিসের আদবের পরিপন্থি। আপনি আদবের সাথে বসুন। ঐ লোকটি সোজা হয়ে না বসে নিজের অপরাগতা পেশ করে বলল, হযরত! আমার কমরে ব্যথা রয়েছে। তাই আমি এভাবে বসেছি। স্পষ্টত সে বলতে চাচ্ছিল যে, আমাকে আপনার বাধা দেওয়া আপনার উচিত হয় নি।

হযরত ড. সাহেব নিজেই বলেন, আমি হযরত থানবী রহ.-কে দেখেছি যে, তিনি কিছুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করলেন ও চোখ বন্ধ করলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে বললেন, আপনি মিথ্যা বলছেন। আপনার কমরে কোনো ব্যথা নেই। আপনি মজলিস থেকে ওঠে যান। হযরত এ বলে তাকে

ধমকিয়ে উঠিয়ে দেন। কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেককার বান্দাদেরকে কোনো বিষয়ের সংবাদ কাশফ এলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দেন। তাই বুযুর্গ ব্যক্তিদের সাথে মিথ্যা বলা বা তাদেরকে ধোকা দেওয়া খুবই ভয়াবহ বিষয়। যদি ভুল কিংবা অবহেলা হয়ে যায়, পরবর্তী উক্ত বিষয়ের কারণে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করলে ইনশাআল্লাহ! গুনাহ ও ভুল আল্লাহ মাফ করবেন।

মোটকথা, হযরত ঐ ব্যক্তিকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিলেন। পরে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে তাদেরকে সাফ জানিয়ে দেয় যে, হযরত বাস্তবেই সত্য বলেছিলেন। আমার কমরে কোনো ব্যথা ছিলো না। আমি আমার কথা রাখার জন্য এ কথা বানিয়ে বলেছিলাম।

ভালবাসার মূল্যায়ন

আমি হযরত ড. সাহেবকে দেখেছি, যখন হযরতের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মাঝে কেউ তাঁর কাছে কোনো হাদিয়া পাঠাত, তখন হযরত হাদিয়া গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করতেন না; বরং হাদিয়া গ্রহণের প্রতি খুব আগ্রহ প্রকাশ করতেন এবং বলতেন ভাই ! তুমি তো এমন জিনিস এনেছো, যার প্রয়োজন আমি খুব অনুভব করছিলাম।

একবার আমি হযরতের খেদমতে একটি কাপড় নিয়ে গেলাম। আমার এ কথার চিন্তাও ছিল না যে, হযরত এ হাদিয়া পেয়ে এতটা আনন্দ প্রকাশ করবেন। আমি যখন হাদিয়া পেশ করলাম, হযরত বললেন, আমার এমন কাপড়ের বড়ই প্রয়োজন ছিলো। আমি এটাই খুঁজছিলাম এবং বললেন, তুমি আমার পছন্দসই রঙের কাপড় এনেছো। কাপড়টাও তো দেখি উন্নত মানের। বার বার কাপড়টির প্রশংসা করছিলেন আর বলছিলেন, যখন কেউ হাদিয়া নিয়ে আসবে, তার কমপক্ষে এতটুকু প্রশংসা করবে যে, তার ভালবাসার মূল্যায়ন হয় এবং তার অন্তর খুশি হয়ে যায় যে, যা আমি হাদিয়া দিলাম তিনি তা পছন্দ করেছেন। হাদীসে এসেছে تهادوا تحابوا। "পরস্পরে হাদিয়া দিবে। এর মাধ্যমে পরস্পর মহব্বত বৃদ্ধি করো।" আর হাদিয়া পরস্পর মহব্বতের মাধ্যম তখনই হবে, যখন তোমরা হাদিয়া পাওয়ার পর তার পছন্দ হওয়ার কথা ও ভালবাসা প্রকাশ করবে।

হযরত মুফতি সাহেব রহ. ও তাঁর মালিকানা স্পষ্টকরণ

আমি আমার আব্বাজান রহ. কে দেখেছি যে, সব কিছুতেই তিনি মালিকানা স্পষ্ট করে দিতেন। শেষ বয়সে আব্বাজান রহ. পৃথক কামরায় একটি চৌকি রেখেছিলেন। দিন রাত ওখানেই থাকতেন। আমরা সব সময় তাঁর খেদমতে থাকতাম। দেখেছি, প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস যখন তাঁর খেদমতে আনতাম, প্রয়োজন শেষে তিনি বলতেন, জিনিসটি রেখে আসো। মাঝে মাঝে আমাদের একটু বিলম্ব হয়ে যেতো। এতে তিনি রাগ করতেন। বলতেন, তোমাদেরকে বলেছি, জিনিসটা রেখে আসো; এখনো রেখে আসো নি।

অনেক সময় আমরা ভাবতাম, এক্ষণি ফেরত দেওয়ার দরকার কি? এত তাড়া কিসের? একটু পরে তো এমনিই ফিরিয়ে দেবো। একবার আব্বাজান রহ. বললেন, ব্যাপার হলো, আমি অসিয়ত নামা লিখেছি, আমার কামরার জিনিসপত্র আমার মালিকানায় আর স্ত্রীর কামরার জিনিসপত্র তার মালিকানায়। তাই আমার কামরায় অপরের জিনিস এলে বিচলিত হই। না জানি আমার ঘরে থাকার কারণে তার মালিক আমাকে মনে করা হয়। এ জন্যই আমার এত তাড়া।

এসব কথাও দীনের অংশ। এগুলো বড়দের কাছ থেকে শিখতে হয়। অথচ আমরা এগুলোকে দীন মনে করি না। মূলত এসব কথা এ হাদীস থেকে চয়নকৃত, যে হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমার 'কিরান' করো না।"

অন্যের হক আত্মসাৎ করা জায়েয নেই

হযরত জাবালা ইবনে সাহীম রা. বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদি.-এর শাসনামলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের সময় আল্লাহ তা'আলা খাবারের জন্য কিছু খেজুর দান করলেন। যখন আমরা খেজুর খাচ্ছিলাম, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমাদেরকে বললেন, দুই দুইটি করে খেজুর খাবে না। কেননা হুযূর সা. এভাবে দুই দুইটি খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন। দুই দুইটি খেজুর একসাথে খাওয়াকে আরবিতে "কিরান" বলা হয়। হুযুর সা. এই জন্য নিষেধ করেছেন যে, খাবার জন্য যে সব খেজুর রাখা হয়েছে,

এতে সবার অধিকার সমান সমান। এখন কেউ যদি একটি একটি করে খায় আর তোমরা দুই দুইটি করে খাও, তবে অন্যের হক নষ্ট হবে। আর অন্যের হক নষ্ট করা জায়েজ নেই। তাই সহীহ পদ্ধতি হচ্ছে, অন্যেরা যেভাবে খাবে, তোমরাও সেভাবে খাবে। এ হাদীস দ্বারা একথার নির্দেশ দেওয়া মূল উদ্দেশ্য যে, অন্যের হক নষ্ট করা জায়েয নেই। -সহীহ বুখারী হাদীস : ৫৪৪৬

নাপাক বস্তুতে সৃষ্ট পোকা

জানিনা ঘটনাটি সঠিক কি না? সঠিক হলে বিশেষ শিক্ষনীয় বটে। এক ব্যক্তি তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছিলো। মল ত্যাগের সঙ্গে সাদা ধরনের কৃমি দেখতে পেলো। লোকটি ভাবলো, আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিই কোনো না কোনো উপকারে আসে- এটা অবশ্য অযৌক্তিক নয়। তবে এই প্রাণীটা যার জন্ম-উৎস হলো অপবিত্র মল, যাকে ত্যাগ করতে পারলেই স্বস্তি; তাও আবার উপকারী- এটা আমার বোধগম্য নয়। আল্লাহই ভালো জানেন, কেন তিনি একে সৃষ্টি করেছেন।

কিছুদিন পর লোকটির চোখে রোগ দেখা দিল। এর পিছনে সে বহু চিকিৎসা শেষ করে ফেলেছিলো। কিন্তু কাজ হয় নি। অবশেষে এক প্রবীণ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা প্রার্থনা করলো। চিকিৎসক গভীর ভাবে ভেবে বললেন, আপাতদৃষ্টিতে এর কোনো চিকিৎসা আমার জানা নেই তবে একটা চিকিৎসার কথা মনে আছে। তা হচ্ছে, মানুষের পেটের ভেতর যে কৃমি জন্মে, তা পিষে মিহি করে চোখে লাগাতে হবে। এতে আশা করি এ রোগের নিরাময় হবে।

লোকটি ডাক্তারের কথা শুনে একেবারে থ বনে গেল। এবার তার বোধগম্য হলো, আল্লাহর কোনো সৃষ্টিই অনর্থক নয়।

আল্লাহর ব্যাপারেও এই একই দর্শন। কোনো খাবার আমাদের মনঃপূত না হলেও এটি আল্লাহর সৃষ্টি। উপরন্ত আল্লাহ আমাদের জন্য রিজিক হিসেবে এটি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তার সম্মান করা জরুরি। মনঃপূত না হলে খাবো না। কিন্তু মন্দও বলবো না। অনেকে খাবারের মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়ায়। এটা জায়েয নেই।

মুনাজারা ছিলো। মুনাযারার পূর্বে খানা-পিনার আয়োজন করা হলো। অভ্যাস অনুযায়ী হযরত নানুতবী রহ. সামান্য কিছু খেয়ে ওঠে গেলেন। অন্যদিকে আর্য হিন্দুপণ্ডিত অতি ভোজনে অভ্যস্ত ছিলো। বিধায় খুব পেট ভরে খাবার খেলো। খাওয়ার পর্ব শেষ হলে নিমন্ত্রণকারী বললো, মাওলানা! আপনি খুব সামান্য খাবার খেলেন? হযরত নানুতবী রহ. উত্তর দিলেন, যতটুকু চাহিদা ছিল, ততটুকু খেয়েছি। পণ্ডিতজী পাশ থেকে বলে উঠলো, আপনি যেহেতু খাওয়ায় হেরে গেলেন, সুতরাং বিতর্কেও হেরে যাবেন। হযরত নানুতবী জবাব দিলেন, যদি খাওয়ার প্রতিযোগিতা করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমার সাথে করার কী প্রয়োজন ছিলো? কোনো গরু কিংবা মহিষের সাথে করলেই তো হতো। গরু-মহিষের সাথে খাবার প্রতিযোগিতা হলে অবশ্যই আপনি হেরে যাবেন। আমি খাওয়ায় প্রতিযোগিতা করতে আসি নি; বরং আপনাদের ভ্রান্ত যুক্তিগুলো খণ্ডন করতে এসেছি।

হযরত নানুতবী রহ.-এর উত্তরে প্রচ্ছন্নভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, একটু বিবেক খরচ করলেই দেখা যাবে, খানা পিনার বেলায় মানুষ ও পশুতে মৌলিক কোনো তফাৎ নেই। পশুরাও খায়, মানুষও খায়। আর আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণীকেই রিযিক দান করেন, এমনকি অনেক সময় মানুষের চেয়েও উন্নত রিজিক দান করেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মানুষ খাওয়ার সময় আল্লাহকে ভুলে যায় না, আল্লাহকে স্মরণ করে। পশু-পাখি এ কাজটি করতে পারে না। এটাই হলো মানুষ ও পশুর মাঝে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবধান।

আল্লামা আইনী ও ইবনে হাজার আসকালানী রহ.

আল্লামা আইনী রহ. কে মহান আল্লাহ ইলম ও প্রজ্ঞা, মেধা ও লেখনী শক্তির এমন বিরল প্রতিজ্ঞা দান করেছিলেন যে, এমন সৌভাগ্য নিয়ে খুব কম লোকই জন্ম গ্রহণ করে। তিনি এত দ্রুত লিখতে পারতেন যে, একবার এক রাতে গোটা কুদুরীর অনুলিপি তৈরি করে ফেলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ও আল্লামা আইনী রহ.-এর সমকালীন ছিদ্রান্বেষণ সর্বজনবিদিত। যদিও আল্লামা আইনী রহ. বয়সে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. থেকে ১২ বছরের বড়ো ছিলেন এবং হাফেজ রহ. তাঁর

কাছে কয়েকটি হাদীস পড়েছেন। কিন্তু সামষ্টিক বিচারে তারা পরস্পরে সমবয়সীই ছিলেন। হাফেজ রহ. ছিলেন শাফেয়ী ও আল্লামা আইনী রহ. ছিলেন হানাফী। তিনিও বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন, আইনী রহ.ও পালন করেছেন। তিনি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, আইনী রহ.ও লিখেছেন। যার কারণে তাদের দু'জনের মাঝে সূক্ষ্মজ্ঞানগত দ্বন্দ্ব চলতো। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার কাজে আগে হাত দেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়ার কাজ করিয়ে নিতেন। এই কাজ সম্পন্নকারীদের মাঝে একজন ছিলেন আল্লামা বদরুদ্দীন ইবনে খিযির। আল্লামা আইনী রহ.-এর কাছেও তাঁর যাতায়াত ছিলো। আল্লামা আইনী রহ. তাঁকে অনুরোধ করেন যে, সে যেন তাঁর লেখা কপিগুলো তাকে ধার দেন। আল্লামা খিযির রহ. হাফেজ রহ.-এর অনুমতিক্রমে আল্লামা আইনী রহ.-কে ব্যাখ্যার অংশগুলো ধার দিতে শুরু করেন। এভাবে আল্লামা আইনী রহ. তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার সময় হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ সামনে রাখতেন। তিনি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের নানাস্থানে হাফেজ রহ.-এর সমালোচনাও করেছেন। পরবর্তীকালে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আইনী রহ.-এর আপত্তিগুলোর উত্তরে স্বতন্ত্র দুটি কিতাব সংকলন করেছেন।

তাদের দু'জনের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের একটি চমৎকার গল্প হলো, তাদের সময়কার শাসক "মালিক মুআইয়াদ"-এর জীবনীর উপর আল্লামা আইনী রহ. একটি দীর্ঘ প্রশংসামূলক কবিতা লিখেছিলেন। যেখানে তিনি তার নির্মাণ করা জামে মসজিদেরও প্রশংসা করেছিলেন। ঘটনাক্রমে কিছুদিন সেই মসজিদের মিনারা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। যার উপর হাফেজ ইবনে হাজার রহ. একটি চিরকুটে দু'টি পঙক্তি লিখে বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দেন। পঙক্তিদুটি হলো–

لجامع مولانا المويد رونق ÷ منارته تزهو على الفخر والزين

تقول ووقد مالت، عليَّ ترفقوا ÷ فليس على حسنِي أضر من العين

"জনাব মুআইয়াদ এর জামে মসজিদ অবশ্যই আড়ম্বরপূর্ণ। সেটির মিনারা গৌরব ও সৌন্দর্যের বিচারে খুবই দৃষ্টিনন্দন।

কিন্তু সেটি যখন ঝুঁকে গেল, তখন আমাকে বললো, আমার উপর রহম করো। কেননা, আমার সৌন্দর্যের জন্য আইন তথা চোখ থেকে অধিক ক্ষতিকারী আর কিছু নেই।"

এই শ্লোকের চমৎকারিত্ব হলো, এখানে عين [আইন] শব্দকে আইনী পড়তে হয়। যার মাধ্যমে আল্লামা আইনী রহ.-কে কটাক্ষ করা হচ্ছে।

মালিক মুআইয়াদ এই চিরকুটটি হাতে পাওয়ার পর তা আল্লামা আইনী রহ.-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। তার উত্তরে আল্লামা আইনী রহ. দুটি পংক্তি লিখে ফেরত পাঠান। সেই পঙক্তি দু'টি হলো–

منارة كعروس الحسن قد جليت ÷ وهدمها بقضاء الله والقدر

قالوا أاصيبت بعين قلت ذا خطأ ÷ وإنما هدمها من خيبة الحجر

"এই মিনারা সৌন্দর্যের নববধুর মতো দেদীপ্যমান। তবে তার পতন একমাত্র আল্লাহর সিদ্ধান্ত তথা ভাগ্যের লিখনের কারণে হয়েছে। লোকেরা বলে বেড়ায়, তার উপর চোখ লেগেছে। আমি বলি, এ কথা ভুল। মূলত এটি এটি তার حجر [হাজার তথা পাথর] এর গন্ডগোলের কারণে হয়েছে"। [শাকের মাহমূদ আবদুল মুনইম রচিত 'ইবনে হাজার আসকালানী রহ. : ১৭৮]

হাফেজ বুলকীনী রহ.

আল্লামা আমর ইবনে রাসলান বুলকীনী রহ. হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর উস্তাদ ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাঁর যে সকল উস্তাদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন, উপকৃত হতেন; তাঁদের মধ্যে হাফেজ যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. আল্লামা বুলকীনী রহ. এবং হাফেজ মুলাক্কিন রহ. প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আল্লামা বুলকীনী রহ. যদিও হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিলো ফেকাহ শাস্ত্রের সঙ্গে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁর থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেন, আমি যমযমের পানি পান করার সময় দু'আ করেছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে হাদীসের ক্ষেত্রে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এবং ফেকাহ শাস্ত্রে আল্লামা বুলকীনী রহ. মর্যাদা দিন। [হুসনুল মুহাদারাহ]

আল্লামা বুলকীনী রহ. মূলত সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু শৈশবেই তিনি মিশর চলে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে এখানেই বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘকাল তিনি দামেস্কে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু পরে পুনরায় মিসরে ফিরে আসেন। অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত এখানেই বসবাস করেন। তিনি এতটাই প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন যে, যখন তিনি কামিলিয়া মাদরাসায় আসেন, তখন মাদরাসার মুহতামিম সাহেবের নিকট থাকার জন্য একটি কামরা দেওয়ার অনুরোধ করেন। মুহতামিম তার অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। কিছুদিন পর মাদরাসায় এক কবি আসে। মুহতামিম সাহেবের গুণগান করে সেই কবি একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃতি করে শোনায়। সেই কবির আবৃতি শেষেই আল্লামা বুলকীনী রহ. বলেন, আমার সেই কবিতা মুখস্ত হয়ে গেছে। মুহতামিম সাহেব বললেন, যদি তুমি কবিতাটি মুখস্ত শোনাতে পার, তাহলে আমি তোমাকে কামরা দেবো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই কবিতা শুনিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি থাকার জন্য কামরা পেয়ে যান।

আল্লামা দারদের মালেকী রহ.

মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা আহমদ দারদের মালেকী রহ. সেই বুযুর্গ, যার লেখা মুখতাছারে খলীল এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মালেকী ফেকাহর মেরুদণ্ডের হাড় মনে করা হয়। তিনি হিজরি দাদশ শতকের বুযুর্গ। তিনি আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তাকে ফেকাহ ও তাসাওউফের ইমাম মনে করা হতো। এমনকি তাকে মালিক আস-সগীর বা ছোট ইমাম মালেক বলা হতো।

তাৎকালীন যুগে মরক্কোর বাদশা আযহারের ওলামায়ে কেরামের কাছে উপহার পাঠাতেন। একবার ১১৯৮ হিজরিতে তিনি আল্লামা দারদের রহ. -এর খেদমতে কিছু হাদিয়া প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে সে বছর বাদশাহর ছেলে হজে গিয়েছিলো। ফেরার পথে তিনি যখন মিশরে পৌছেন, তখন তার পাথেয় ফুরিয়ে যায়। আল্লামা দারদের রহ. সেই সংবাদ পেয়ে যান। তখন তিনি তার কাছে আগত হাদিয়ার সমপরিমাণ অংক পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী বছর বাদশা তাঁকে সেই অংকের দশগুন বেশি উপহার পাঠিয়ে

দেন। শায়েখ সেই অর্থ দিয়ে প্রথমে হজ করেন। বাকি অর্থ দিয়ে নিজের জন্য একটি মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানে পাঠদান ও লেখালেখি সংক্রান্ত খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যান। ১২০১ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

রাসূল সা. -এর সামনে মিথ্যা বলার পরিণাম

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর পাশে বসে বাম হাতে খাচ্ছিল। তিনি তাকে ডান হাতে খেতে বললেন। সে উত্তরে বলল, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। বাহ্যত বোঝা যায়, লোকটি মুনাফেক ছিলো। যেহেতু তার কোনো অপারগতা ছিলো না। অথচ সে মিথ্যা বললো। অনেকে নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না, বরং নিজের কথা ও কাজের উপর অটল থাকে। লোকটি সম্ভবত এ জাতীয় স্বভাবের ছিলো। রাসূল সা.-এর নির্দেশ শোনা সত্ত্বেও সে স্পষ্ট বলে দিলো, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। আল্লাহর রাসূলের সাথে মিথ্যা বলা আল্লাহ পছন্দ করলেন না। ফলে রাসূল সা. তাকে বদ দু'আ করে বললেন, لا استطعت (তুমি ডান হাতে খেতে পারবে না) হাদীসে রয়েছে, এ ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত কখনো ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারে নি। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত রাখূন।

নিয়ম হলো, মানুষ হিসেবে কোনো ভুল হয়ে গেলে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাহলে হয়ত আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু ভুল করে হঠকারিতা দেখানোও নবী সা.-এর সঙ্গে জঘণ্য অপরাধ। রাসূল সা. কারো জন্য বদ দু'আ খুব কমই করেছেন। এমনকি তিনি তার বিরুদ্ধে তরবারি কোষমুক্ত কারী এবং যুদ্ধকারী প্রাণের দুশমনদের জন্য বদদোয়া করেন নি; বরং তাঁর দু'আ ছিলো-

اللهم قومى فإنهم لا يعلمون

"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হেদায়েত দিন। তারা তো আমাকে চিনে না।"

অথচ আলোচ্য ওহীর মধ্যমে নবী সা. কে জানানো হয়েছে যে, সে অহংকার ও কপটতার কারণে ডান হাতে খেতে অস্বীকার করেছে। তাই

রাসূ সা. তার জন্য বদ দু'আ করেছেন। -সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং : ২০২১

এক অবসরপ্রাপ্ত লোকের নামায * V.V.I

হযরত ডা. আবদুল হাই সাহেব রহ. একদিন বলেন, এক ব্যক্তি অবসর জীবন-যাপন করছে। তার কোনো কিছুর অভাব নেই। পানাহারের সব কিছু প্রস্তুত। ব্যাংক ব্যালেন্সও পর্যাপ্ত। জীবন-যাপন কিংবা অর্থ উপার্জনের কোনো ফিকির নেই। তাকে ডিওটিতেও যেতে হয় না। ব্যবসাও করতে হয় না। দোকানও খুলতে হয় না। তার আমল ছিলো, আজান শুনতেই ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। মসজিদে পৌঁছে খুব ধীরস্থিরতার সাথে অযু করেন। এরপর তাহিয়্যাতুল অযুর দুই রাকাত আদায় করে সুন্নাত আদায় করেন। অতঃপর জামাতের অপেক্ষায় বসে বসে যিকির করতে থাকেন। জামাতে দাঁড়িয়ে গেলে পূর্ণ মনোযোগে নামায আদায় করেন। তার মন-মস্তিষ্ক নামাযের প্রতি ঝুঁকে থাকে।

যখন তিনি তেলাওয়াত করেন, তিনি খুব স্বাদ উপলব্ধি করেন। যিকির করলেও মজা অনুভব করেন। রুকু' সেজদাতেও ইবাদতের স্বাদ উপলব্ধি করেন। এভাবে পূর্ণ নামাজ আদায় শেষে পরবর্তী সুন্নাত নামাজ আদায় করেন। অতঃপর মন লাগিয়ে দু'আ করেন। অতঃপর ঘরে ফিরে এসে পরবর্তী নামাজের অপেক্ষায় থাকেন যে, কখন আযান হবে এবং কখন তিনি মসজিদে যাবেন। এই হলো এক ব্যক্তি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো, যার ঘর-সংসার রয়েছে, স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। যার অনেক কাজ ও দায়িত্ব রয়েছে। অনেকের হক আদায় করতে হয়। অন্যদের হক আদায় করার জন্য স্ত্রী সন্তানের জীবিকা নির্বাহের জন্য ঠেলাগাড়িতে বিভিন্ন সামান আওয়াজ করে বিক্রি করেন। লোকেরা ঠেলাগাড়ির আশে পাশে ভিড় করে জিনিস পত্র কেনার সময় আজান হয়ে যায়। এখন সে দ্রুত লোকদেরকে বিদায় করার চেষ্টা করেন। এমনকি জামাতের সময় ঘনিয়ে এলে দ্রুত ঠেলাগাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে তার উপর কাপড় ফেলে দিয়ে দ্রুত মসজিদে আসেন। জলদি ওযু করে ইমাম সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে দ্রুত নামাজের নিয়ত করে হাত বাঁধেন।

এমতবস্থায় তার অন্তর থাকে এক জায়গায়, দেমাগ থাকে আরেক জায়গায়। ঠেলাগাড়ির চিন্তা মাথায় ঘুরতে থাকে। ক্রেতাদের কথা মনে পড়তে থাকে। এতকিছু সত্ত্বেও সে আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। জামাতের সাথে নামায আদায় করেন। অতঃপর সুন্নাত নামায আদায় করে দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে ঠেলা গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ান। এই হলো দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থা।

অতঃপর হযরত বলেন, এই দু'ই ব্যক্তির মাঝে কার নামাযে রুহানিয়্যাত বেশি?

বাহ্যত মনে হয়ে, প্রথম ব্যক্তির নামাযে রুহানিয়্যাত বেশি। কেননা সে ধীরস্থিরতার সাথে ওজু কর তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে সুন্নাত আদায় করেন এবং জামাতের সাথে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নামায আদায় করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নামায রুহানিয়্যাতের নিকটবর্তী। যদিও সে পূর্ণ মনোযোগের সাথে নামায পড়তে পারে নি। কারণ, প্রথম ব্যক্তির কোনোকিছুর দায়িত্ব নেই। সকল প্রকার ব্যস্ততা থেকে অবসরপ্রাপ্ত। সে কারণে সে নামাজে স্বাদ অনুভব করে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের ঠেলাগাড়ি রাস্তার পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে এসেছে। সেই ঠেলাগাড়ির ওপর তার নিজের ও তার পরিবারের জীবিকা নির্ভরশীল। কিন্তু যখন আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে, সেই ঠেলাগাড়ি তাকে আল্লাহর দরবারে হাজিরার ক্ষেত্রে গাফেল করতে পারে না।

সে ঠেলাগাড়ি ছেড়ে জামাতে এসে দাঁড়িয়ে যায়। নামাজ আদায় করে। তার এ আমল যেমন কষ্টকর, তেমনি তা আল্লাহর দরবারে অধিক গ্রহণযোগ ও বেশি সওয়াবের হকদার। যদিও নামাযে তার বিভিন্ন খেয়াল আসে, নামাযে স্বাদ উপলব্ধি করে না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে বিনিময় প্রদানে কিছুই কমাবেন না।

কাজ তিন প্রকার

হযরত ইমাম গাযালী রহ. বলেন, দুনিয়াতে যত কাজ আছে, সেগুলো তিন প্রকার–

এক. সে সব কাজ, যার মাঝে কিছুটা ফায়েদা আছে; দুনিয়ার ফায়দা কিংবা দীনের ফায়দা।

দুই. সে সব কাজ, যার মাঝে আছে শুধু ক্ষতি; দীনের ক্ষতি কিংবা দুনিয়ার ক্ষতি।

তিন. সে সব কাজ, যার মধ্যে কোনো লাভ-ক্ষতি নেই; দুনিয়ার লাভ-ক্ষতি নেই, দীনেরও লাভ ক্ষতি নেই। সম্পূর্ণ অনর্থক কাজ।

এরপর তিনি বললেন, ক্ষতিকর কাজগুলো থেকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, কাজের তৃতীয় প্রকারেও কোনো লাভ নেই। ক্ষতিও নেই। আসলেও সেটা ক্ষতিকর কাজ। কারণ অহেতুক কাজে সে সময়টুকু ব্যয় হচ্ছে। সে সময়টুকু ইচ্ছে করলে কোনো ভালো কাজেও লাগানো যেতে পারে। সেসময়টুকু নষ্ট করে দিলে সময়ের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হলো।

দুনিয়া অনুগত হয়ে সামনে আসবে

আব্বাজান রহ.-কে আজীবন দেখেছি, কেউ কোনো বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অহেতুক ঝগড়া বাঁধলে তিনি সত্যের উপর থাকলেও বলতেন, আরে ভাই! জগড়া ছাড়ো। যার জন্য ঝগড়া করছো, তা নিয়ে যাও। এভাবে সব সময় তিনি নিজের হক ছেড়ে দিতেন। আর নবীজী সা. -এর হাদীসটি শুনাতেন–

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا

> নবীজী সা. বলেছেন, "ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে বাড়ি দেওয়ার জিম্মাদারি আমি নিচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দিয়েছে।" -আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৪৮০০

আব্বাজান সারা জীবন এই হাদীসটির উপর আমল করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে আমরা আফসোস করতাম, ভাবতাম, একটু জোর করলেই তিনি হকটি পেয়ে যেতেন। অথচ দেখেছি, তবুও তিনি নিজের হক ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে যেতেন। তার পরেও আল্লাহ তাঁকে দুনিয়া দান করেছেন।

এমন লোকের নিকটেই দুনিয়া দূর্বল হয়ে প্রতিভাত হয়। যথা হাদীস শরীফে এসেছে–

أتته الدنيا وهى راغمة

"অর্থাৎ যে একবার দুনিয়ার প্রত্যাশাবিমুখ হবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামনে দুনিয়াকে অবনত করে উপস্থিত করবেন।" -ইবনে মাজা, কিতাবুল যুহদ, হাদীস : ৪১৫৭

দুনিয়া তখন তার পদতলে এসে গড়াগড়ি করবে। তবুও তাঁর হৃদয়ে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ জাগাবে না।

অপরের জুতা সোজা করা

এক ভদ্রলোক আমার আব্বাজানের মজলিসে আসা যাওয়া করতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, লোকটি মজলিসে এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যের জুতা সোজা করে দিচ্ছে। এরপর থেকে তার প্রতিদিনের কর্মসূচী ছিলো মজলিসের লোকদের জুতা সোজা করে দিয়ে মজলিসে শরিক হওয়া। আব্বাজান এভাবে বেশ কয়েকদিন দেখতে পেলেন। পরে একদিন তিনি লোকটিকে কাজটি করতে নিষেধ করে দিলেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বললেন, আসলে বেচারা ধারণা করেছে, তার মাঝে অহংকারের রোগ আছে। আর এ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে অপরের জুতা সোজা করাকে সে বাছাই করে নিয়েছে। সে ভেবেছে, অপরের জুতা সোজা করলে তার অহংকার দূর হয়ে যাবে। অথচ লোকটির জানা নেই, তার এই কাজ হিতে বিপরীত হচ্ছে। ফায়দা তো দূরের কথা; বরং তার মাঝে অহংকার রোগের পাশাপাশি অহমিকার ব্যাধিও চলে আসছে। সে জুতা সোজা করার করার কাজ করে ভেবেছে, তার অহংকার মিটে গেছে এবং বিনয়ের পরিসীমায় প্রবেশ করেছে অথচ পরিণতিতে তার মাঝে অহমিকার রোগও সংযোজন হয়েছে। তাই তার জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলো।

বোঝা গেল, সাধারণ দৃষ্টি আর চিকিৎসকের দৃষ্টি এক নয়। দৃশ্যত লোকটির এ কাজ ছিল বিনয়ের কাজ। অথচ চিকিৎসক বুঝে ফেলেছেন,

তার কাজটি অহংকার সৃষ্টিকারী। বিনয়ের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই আত্মার ব্যাপারটি বড়ই নাজুক। মানুষ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো চিকিৎসকের দ্বারে যাবে। চিকিৎসকই বলবেন, কোন কাজটি আল্লাহ ও তার রাসূল সা. কর্তৃক নির্দেশিত আর কোনটি নির্দেশিত নয় এবং কোন কাজ কতটুকু করা যবে আর কতটুকু করা যাবে না।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ

আল্লাহ পাক কনস্টানন্টিনোপল জয়ের সৌভাগ্য উসমানী বংশের সপ্তম তরুণ খলীফা সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এই তরুণ শাহাজাদা বাইশ বছর বয়সে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন; কিন্তু খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার ফলে খুব দ্রুত তাঁর পুর্বসূরিদের ছাড়িয়ে যান। কনস্টান্টিনোপল জয়ের প্রতিবন্ধক বিয়ষগুলো তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করেন। দৃঢ় সংকল্প, নিপুন কৌশল ও অপূর্ব বীরত্বে তিনি যুদ্ধের এমন পরিকল্পনা করেন, যা শেষ পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

কনস্টান্টিনোপলের অধিবাসীরা যুদ্ধের সময় সাধারণত অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে যে সহায়তা পেতো, তা কৃষ্ণ সাগর থেকে বসফরাস প্রণালিতে প্রবেশ করে কনস্টান্টিনোপেলে পৌছতো। তাই কনস্টান্টিনোপলকে তার মিত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্য বসফরাস প্রণালির উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার আবশ্যক ছিলো।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাইজিদ ইলদিরাম বসফরাসের (এশিয়ান) পূর্ব উপকূলে একটি দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন। 'আনাযুল দূর্গ' নামে এটি প্রসিদ্ধ। আজো দূর্গটি বিদ্যমান আছে।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ উপলব্ধি করেন যে, শুধু এক তীরের এই দুর্গ বসফরাস প্রণালি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে তিনি এই দূর্গের বিপরীত দিকে ইউরোপিয়ান উপকূলে বিশাল এক দূর্গ নির্মাণ করেন। এটিকে রুমেলি দূর্গ বলা হয়। এই দূর্গ নির্মাণের পর বসফরাস প্রণালি হয়ে যাতায়াতকারী প্রত্যেকটি জাহাজকে উসমানীদের তোপের আওতায় পড়তে হতো।

কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরগুলো ধসিয়ে দেওয়ার জন্য সাধারণ তোপ যথেষ্ট ছিলো না; তাই মুহাম্মাদ ফাতেহ পিতল দিয়ে বিশেষ ধরনের তোপ নির্মাণ করেন। যার সমকক্ষ কোনো তোপ তৎকালীন যুগে পৃথিবীর বুকে ছিলো না। এর মাধ্যমে আড়াই ফুট ব্যাসের আটমণ ওজনের গোলা এক মাইল দূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করা যেতো। এই তোপ যখন প্রথম বার ব্যবাহার করা হয়, তার গোলা এক মাইল দূরে পতিত হয়ে ছয় ফুট মাটির নিচে গেড়ে যায়।

কনস্টান্টিনোপল বসফরাস প্রণালি, মর্মর সাগর ও গোল্ডেন হর্ণ [সোনালি সিং] উপসাগর দিয়ে পরিবেশিষ্টিত। শুধু এর পূর্বে সীমানা ভূমিবেষ্টিত। তাই সফল আক্রমণ করার জন্য একটি শক্তিশালী নৌবহর আবশ্যক ছিলো। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ এক শো চল্লিশটি জাহাজের সমন্বয়ে একটি নৌবহর গড়ে তোলেন।

এই বিশাল প্রস্তুতির পর মুহাম্মাদ ফাতেহ কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। তাঁর স্থলবাহিনী শহরের পূর্বে প্রাচীরের সামনে অবস্থান নেয়। নৌবহর বসফরাস প্রণালিতে ছড়িয়ে পড়ে। বসফরাস প্রণালির ছোট একটি শাখা শিঙের আকৃতিতে শহরের পূর্ব দিকে বয়ে যায়। একে গোল্ডেন হর্ণ বলা হয়। কনস্টান্টিনোপলের নৌবন্দর গোল্ডন হর্ণে অবস্থিত ছিলো। এ কারণে বসফরাস থেকে বন্দর অঞ্চল বা শহরের দক্ষিণ দিকে যেতে হলে গোল্ডেন হর্ণ হয়ে যেতে হতো। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের লোকেরা বসফরাস প্রণালি সংলগ্ন গোল্ডেন হর্ণ প্রবেশ করতে পারতো না। ফলে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের নৌবহর বসফরাস প্রণালিতে আটকে যায়। তাই জাহাজের মাধ্যমে বন্দর অঞ্চল অবরোধ করার কোনো সুযোগ হয় না। কেবল পূর্ব এলাকার স্থল পথে প্রাচীরের উপর আক্রমণ করার সুযোগ ছিল। এদিকে শহরের লোকেরা সমুদ্রের দিককে সম্পূর্ণ রক্ষিত মনে করে তাদের সম্পূর্ণ শক্তি পূর্ব প্রাচীর এলাকায় নিয়োজিত কর।

সুলতান মুহাম্মাদ বন্দরের দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য যে কোনো ভাবে তাঁর কিছু জাহাজ গোল্ডেন হর্ণের ভেতরে প্রবেশ করানোর প্রচেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু গোল্ডেন হর্ণের মুখে লোহার শেকল তো ছিলোই, তার আশপাশে গোলা নিক্ষেপের জন্য তোপও বসানো ছিলো। উপরন্তু লোহার

শেকল সংরক্ষণের জন্য গোল্ডেন হর্ণের মধ্যে বড়ো বড়ো বাইজানটিয়ান জাহাজও পাহারায় ছিলো। ফলে অনেকদিন অতিবাহিত হলেও গোল্ডেন হর্ণে প্রবেশ করার কোনো চেষ্টাই সফল হয় নি।

অবশেষে একদিন সুলতান মুহাম্মাদ এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা পৃথিবীর যুদ্ধের ইতহাসে একমাত্র বিরল ও বিস্ময়কর স্মরনীয় ঘটনা হয়ে আছে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁর জাহাজগুলোকে ১০ মাইল স্থলপথ অতিক্রম করানোর পর গোল্ডন হর্ণে প্রবেশ করাবেন। বসফরাস প্রণালির পশ্চিম তীর থেকে জাহাজ স্থল এলাকায় তোলে নিয়ে একটি ঘোরাপথে গোল্ডেন হর্ণের দক্ষিণ তীরে পৌছাবেন। (এ স্থানটিকে বর্তমানে কাসেম পাশা বলা হয়।) ওখান থেকে জাহাজগুলোকে গোল্ডেন হর্ণে নামিয়ে দেবেন। ঐতিহাসিক গিবনের বর্ণনামতে সেই দীর্ঘ ১০ মাইল স্থল পথটি ছিলো অসমতল, পাহাড়ি ও বন্ধুর। মুহাম্মাদ ফাতেহের দৃঢ় সংকল্প ও বিস্ময়কর কর্মদক্ষতা মাত্র এক রাতের মধ্যে তাঁর সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করে দেখায়। প্রথমে তিনি সেই স্থল পথে কাঠের তক্তা বিছিয়ে দেন। চর্বি ঘসে ঘসে তক্তাগুলো পিচ্ছিল করেন। তারপর দেখতে জাহাজের মত সত্তরটি নৌকা বসফরাস প্রণালি থেকে উপরে তোলে কাঠের পিচ্ছিল তক্তায় উঠিয়ে দেন। প্রতিটি নৌকায় দু'জন করে মাল্লা ছিল। বাতাসের সাহায্য পাওয়ার জন্য পাল উড়িয়ে দেওয়া হয়। মানুষ ও বলদ মিলে নৌকাগুলোকে টেনে টেনে ১০ মাইল পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে গোল্ডেন হর্ণে পৌছে দেয়। সত্তরটি নৌকার এই মিছিল সারারাত মশালের আলোয় পথ পাড়ি দেয়। বাইজানটাইনের সৈন্যরা কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর থেকে বসফরাস প্রণালির পশ্চিম তীরে মশালের আলোর দৌড়াদৌড়ি লক্ষ্য করে। কিন্তু অন্ধকারের কারণে ওখানে কী হচ্ছে, তার কিছুই তারা বোঝে ওঠতে পারে নি। অবশেষে ভোরের আলো যখন অন্ধকারের পর্দা উন্মোচন করে দেয়, ততক্ষণে সুলতান মুহাম্মাদের সত্তরটি নৌকা ও ভারী তোপটি গোল্ডেন হর্ণের উপরাংশে পৌছে গেছে।

স্থল পথে জাহাজ চালানোর এই অভূতপূর্ব কৃতিত্ব, যা ইতোপূর্বে কারো কল্পণাতেও আসেনি- এতোটাই বিস্ময়কর ঘটনা ছিলো যে, পাশ্চাত্যের কট্টরপন্থি ঐতিহাসিকরাও এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারে নি।

এডওয়ার্ড গিবনের মতো ঐতিহাসিকও এটিকে দৈব ঘটনা [Miracle] বলে উল্লেখ করেছেন।

উসমানী সেনাবাহিনীর নৌকাগুলো গোল্ডেন হর্ণে পৌছে যাওয়ার একটি সুবিধা হয় যে, গোল্ডেন হর্ণে পানি কম থাকায় বাইজানটাইনের বড়ো বড়ো জাহাজগুলো তাতে অবাধে চলা ফেরা করতে পারছিলো না; কিন্তু উসমানী বাহিনীর নৌকাগুলো তুলনামূলক ছোটো হওয়ায় স্বাধীনভাবে চলাচলে কোনো বাঁধা ছিলো না। ফলে এখানে নৌযুদ্ধে উসমানী বাহিনীর নৌকাগুলো কোনো জটিলতা সমস্যা ছাড়াই জয়লাভ করে। তার সঙ্গে সঙ্গে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ গোল্ডেন হর্ণের উপর একটি সেতু নির্মাণ করে তার উপর ভারি তোপটি বসিয়ে দেন।

কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব ও দক্ষিণ উভয় দিক থেকে অবরোধ শক্তিশালী হওয়ার পর ওসমানী বাহিনীর তোপ উভয় দিক থেকে নজর রক্ষা প্রাচীরের উপর গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। সাত সপ্তাহ ব্যাপী গোলা বর্ষণের পর প্রাচীরের তিন স্থানে বড় বড় ফাটল সৃষ্টি হয়। গীবনের ভাষায়-

> "বহু শতাব্দী ধরে যে প্রাচীরগুলো শত্রুর প্রতিটি আক্রমণের মোকাবেলা করছিলো, উসমানী বাহিনীর তোপ সব দিক থেকে তার আকৃতি বিকৃত করে দেয়। তাতে অসংখ্য ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং সেন্ট রোমানস ফটকের (ফটকটি পরে তোপ দরজা বা তোপ কাপি নামে পরিচিত হয়) কাছে চারটি মিনার মাটির সঙ্গে মিশে যায়।"

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ চূড়ান্ত আক্রমণের সফলতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান। তারপরও তিনি আক্রমণ করার আগে ১৪৫৩ খিস্ট্রাব্দের ২৪শে মে বাইজানটাইন সম্রাট কনস্টানন্টিনের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান যে, তারা অস্ত্র সমর্পণ করে শহর হস্তান্তর করলে প্রজাদের জীবন ও সম্পদের কোনো ক্ষতি করা হবে না। তার সঙ্গে মুরিয়া অঞ্চলও তাদের দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কনস্টনটিন সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। এর পাঁচ দিন পর সুলতান ফাতেহ সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

উসমানী সেনবাহিনীর ৮৫৭ হিজরির ২০ শে জুমাদাল উলা রাতটি যিকির-আযকার, তাসবীহ ও দু'আর মধ্যে কাটিয়ে দেন। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, যে সুলতান মুহাম্মাদ বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ! আমরা আয়া সোফিয়ার গির্জায় যোহরের নামায আদায় করবো।' তবে সেন্ট রোমাস ফটকের উপর (বর্তমানে এটাকে তোপকারি বলা হয়।) কঠিন আঘাত হানা হয়। কারণ, এ জায়গাটির প্রাচীর খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। পরিখা অতিক্রম করার জন্য তার উপর সিঁড়ি ও জাল ফেলা হয়। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত উভয় বাহিনীর মধ্যে ভীষণ আগুন-ঝরলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। বাইজানটাইন বাহিনীও সেদিন অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। দুপুর পর্যন্ত একজন উসমানী সৈন্যও শহরে প্রবেশ করতে পারে নি। অবশেষে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ তার বিশেষ ইয়ানচরি বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সেন্ট রোমাস ফটকের দিকে অগ্রসর হন। ইয়ানচিরি বাহিনীর অধিনায়ক আগা হাসান তার তিরশজন বীর যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে প্রাচীরের উপরে আরোহণ করেন। হাসান ও তার আঠারো জন সঙ্গীকে তৎক্ষণাৎ প্রাচীরের উপর থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয় এবং তারা শাহাদাতের সুধা পান করেন। অবশিষ্ট আরো বারজন প্রাচীরের উপর দৃঢ় অবস্থান নিতে সক্ষম হন। তারপর উসমানী সেনাবাহিনীর অন্যান্য দলও একের পর এক প্রাচীরে আরোহণ করে। এভাবে কনস্টানটিনোপেলের প্রাচীরের উপর চন্দ্র খচিত লাল পতাকা উড়ে।

বাইজানটাইন সম্রাট কনস্টানটিন এতক্ষণ বীরত্বের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের কিছু অসধারণ বীর যোদ্ধা হারানোর পর নিরাশ হয়ে পড়েন। উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন–

"আমাকে খুন করতে পারে এখন কোনো খ্রিস্টান কি নেই?"

কনস্টানটিন তার এই আহ্বানে সাড়া না পেয়ে রোম সম্রাটদের (কায়সারদের) বিশেষ পোশাক খুলে ফেলে দূরে নিক্ষেপ করেন। উসমানী সেনাবাহিনীর উচ্চঃস্বিত তরঙ্গে প্রবেশ করে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুতে ১০০০ বছরের বাইজানটাইনের রোম সম্রাজ্যের বিলুপ্ত ঘটে; যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো প্রথম কনস্টান্টিনের হাতে, তার বিলুপ্তিও ঘটে আরেক কনস্টান্টিনের হাতে, তার বিলুপ্তিও ঘটে

আরেক কনস্টান্টিনের হাতে। এরপর থেকে 'কায়সার' উপাধি ইতিহাসের উপাখ্যানে পরিণত হয়। এভাবেই ইহকাল-পরকালের সরদার মহানবী -এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়–

إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده

"কায়সারের ধ্বংসের পর আর কোনো কায়সার জন্মাবে না।"

যোহরের সময় সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ তাঁর উজির ও সরদারদের নিয়ে সেন্ট রোমানস ফটক অতিক্রম করে শহরে প্রবেশ করেন। সর্ব প্রথম কনস্টানটিনোপলের জগদ্বিখ্যাত গির্জা আয়া সোফিয়ার দূর্গে পৌছে ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। গির্জার প্রাচীরের চবির নকশা ও কারুকার্য ছিলো। সুলতানের নির্দেশে সেগুলো নষ্ট করে ধুয়ে পরিস্কার করে ফেলা হয়। সুলতানের নির্বাচিত মোয়াজ্জেন আজান দেন। শিরক ও কুফরের এই কেন্দ্রে প্রথমবারের মত "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" -এর সুমধুর ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সুলতান মুহাম্মাদ এখানে যোহরের নামায আদায় করেন। সেই সময় এই গীর্জা মসজিদে রূপান্তরিত হয়।

মসজিদে নববীর ভূমি বিনামূল্যে গ্রহণ না করা

রাসূলুল্লাহ সা. হিজরত করে মদিনায় আসার পর সর্বপ্রথম তিনি শুরু করেন মসজিদ নির্মাণের কাজ। মসজিদে নববী, যে মসজিদ প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সমান। মদিনায় বনু নাজ্জারের একটি খোলামেলা জায়গা ছিলো। রাসূলুল্লাহ সা. সেখানেই মসজিদ নির্মাণের চিন্তা করেন।

রাসূল সা. সংবাদ নিয়ে জানলেন, জায়গাটি বনু নাজ্জারের। বনু নাজ্জারের লোকেরা যখন জানলো যে, রাসূল সা. এই জামির উপর মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তখন তারা রাসূল সা.-এর কাছে এসে আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ তো বড় সৌভাগ্যের কথা যে, আমাদের জায়গার উপর মসজিদ নির্মাণ হবে। আমরা এই জায়গাটি বিনামূল্যে মসজিদের জন্য দিচ্ছি। আপনি এর উপর মসজিদ নির্মাণ করুন। রাসূল

সা. বললেন, না, বিনামূল্যে আমি মসজিদের জন্য জমি গ্রহণ করবো না। তোমরা এর মূল্য নির্ধারণ করো। মূল্যের বিনিময়ে আমি তা গ্রহণ করবো। বাহ্যত সৌভাগ্য অর্জনের আশায় লোকেরা বিনামূল্যে জায়গাটি দান করতে চাইলেও রাসূল সা. তা গ্রহণ করেন নি। ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, বনু নাজ্জারের লোকেরা চাঁদার পদ্ধতিতে যেভাবে বিনামূল্যে জমিন দান করেছিল, এ পদ্ধতিতে মসজিদের জন্য জমিন গ্রহণ করা জায়েয ছিল। এতে পাপের কোনোই আশংকা ছিল না। কিন্তু যেহেতু এটি মদিনায় সর্বপ্রথম ইসলাম ও মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণ হতে যাচ্ছিল। যে মসজিদ পরবর্তী ইতিহাসে কা'বা শরীফের পরবর্তী স্থান দখল করবে। যদিও কুবায় এর পূর্বে আরেকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, তাই দানকৃত জমিন গ্রহণ করাটা রাসূল সা. -এর পছন্দ ছিলো না। কারণ এতে হয়ত ভবিষ্যত মানুষদের জন্য নজীর হয়ে যাবে যে, মসজিদ নির্মিত হলে জমি ক্রয়ের পরিবর্তে তা বিনামূল্যে দান করতে হয়; এজন্যও রাসূল সা. জমিনটি বিনামূল্যে গ্রহণ করেন নি, যাতে লোকদের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মসজিদ নির্মাণের সময় অন্যের উপর জুলুম করে জমি দখল করা কিংবা অন্যের জমির উপর দৃষ্টি দেওয়া জায়েয হবে না। তাই রাসূল সা. নগদ মূল্যে তা ক্রয় করে মসজিদে নববীর ভিত্তি প্রস্তর করেন। যাতে লেনদেন পরিস্কার তাকে এবং পূর্বে বর্ণিত কোনো সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।

উত্তম ব্যবহারের অধিক হকদার

عن أبي هريرة رضـــ. قال : حاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله! من أحق الناس لحسن صحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من ؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. –جامع الأصول

সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবীজী সা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সারা বিশ্বের মানুষের মাঝে আমার পক্ষ থেকে সদাচরণ পাওয়ার অধিক হকদার কে? রাসূল সা. উত্তর দিলেন, তোমার মা। অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি হকদার তোমার মা। লোকটি

পুনরায় প্রশ্ন করলো, তারপর কে? নবীজী সা. উত্তর দিলেন, তোমার মা। লোকটি আবারো প্রশ্ন করলো, তারপর কে? নবীজী সা. এবারও উত্তর দিলেন, তোমার মা। লোকটি চতুর্থবারও একই প্রশ্ন করলো যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারপর কে? এবার রাসূল সা. বললেন, তোমার পিতা। -জামেউল উসূল

রাসূল সা. তিনবার মায়ের কথা বলেছেন। চতুর্থবারে পিতার কথা বলেছেন। তাই এ হাদীসের আলোকে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, পিতার চেয়ে মায়ের হক বেশি। কারণ সন্তানের লালন পালনে মায়ের ভূমিকা ও কষ্ট পিতার চেয়েও বেশি। পিতা মায়ের চারভাগের এক ভাগ কষ্টও করেন না। বিধায় মায়ের নাম নেওয়া হয়েছে তিনবার। আর পিতার নাম নেওয়া হয়েছে একবার।

এজন্য বুযুর্গানে দীন বলেছেন, পিতার তুলনায় মাতা হাদিয়া পাওয়ার অধিক উপযোগী। বুযুর্গানে দ্বীন আরো বলেছেন, এখানে মূলত বিষয় দু'টি। এক হলো, আজমত তথা মর্যাদা প্রদর্শন। দ্বিতীয় হলো, খেদমত তথা সদাচরণ। প্রথম বিষয়টিতে পিতা প্রাধান্য পাবে। দ্বিতীয় বিষয়টিতে মাতা প্রাধান্য পাবে। তা'জীমের অর্থ হলো, পিতার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান অন্তরে থাকা। যেমন– পিতার দিকে পা ছড়িয়ে বসবে না। তার মাথার নিকট বসবে। এ ছাড়া আদবের জন্য আরো যা করতে হয়, তা করবে। এ ক্ষেত্রে পিতার হক প্রাধান্য পাবে। আর খেদমতের ব্যাপারে মায়ের হক প্রাধান্য পাবে। এমনকি পিতার চেয়েও তিনগুন বেশি। এ আল্লাহর বিশেষ কুদরতের আলামত যে, সন্তান-মায়ের মাঝে এক বিশেষ গুণ রেখেছেন। যে গুণের কারণে সন্তানরা মায়ের সাথে যতটুকু সংকোচমুক্ত থাকে, পিতার সাথে ততটুকু থাকে না। মায়ের সাথে সন্তানের আন্তরিকতা বেশি বিধায় এমন কথা আছে, যা পিতার সামনে বলা যায় না। অথচ মায়ের কাছে নির্দ্বিধায় বলা যায়।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালীনী রহ. ফাতহুল বারীতে বুযুর্গানে দ্বীনের এই মূলনীতি আলোচনা করেছেন যে, পিতার আজমত হবে বেশি। আর মায়ের খেদমত হবে বেশি। এ মূলনীতির মাধ্যমে হাদীস শরীফেরও সঠিক ব্যাখ্যা ফুটে ওঠে।

"বেটা" শব্দ স্নেহের শব্দ

শায়খুল ইসলাম হযরত শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. অনেক বড় আলেম ও ফকীহ ছিলেন। তৎকালীন সময়ে শুধু পাকিস্তানে নয়; বরং গোটা বিশ্বে তাঁর মত আলেম ও গবেষক দ্বিতীয় কেউ ছিলো না। সারা বিশ্বে তাঁকে ইলমের লৌহমানব মনে করা হতো। তাই কেউ তাকে 'শায়খুল ইসলাম' নামে সম্বোধন করতেন, আবার কেউ তাকে আল্লামা বলে ডাকতেন। অনেক সম্মানসূচক শব্দ তাঁর শানে ব্যবহার করা হতো। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। তখন আমার দাদী জীবিত ছিলেন। আমার দাদী সম্পর্কে তাঁর মামী হতো। তাই দাদী তাঁকে 'বেটা' বলে ডাকতো। কারণ পৃথিবীর বুকে তাঁকে বেটা বলে ডাকার মতো আমার দাদী ছাড়া আর কেউ ছিলো না। দাদী তাঁকে দু'আ দিতেন, 'বেটা জিতে রাহো" (বেঁচে থাকো বেটা) যে সময় সারা বিশ্ব তাঁকে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধিতে সম্বোধন করতো, তখন দাদীর মুখে তাঁকে 'বেটা' বলে ডাকতে শুনলে আমাদের কাছে অদ্ভূত মনে হতো। কিন্তু আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. বলেন, আমি মুফতি সাহেব (মুফতি শফী সাহেব রহ.) ঘরে দু'টি উদ্দেশ্যে যাতায়াত করি।

এক. মুফতি সাহেবের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে।

দুই. পৃথিবীর বুকে 'বেটা' বলে ডাকার মতো দাদী ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। এই শব্দ শুনার জন্য তিনি দাদীর কাছে ছুটে আসতেন। বেটা শব্দ শোনার মাঝে যে পুলক রয়েছে, তার সামান্যতম ঝলকও অন্য কোন শব্দের মাঝে নেই।

আসলে মানুষের এমন মুহূর্তও আসে, যখন বেটা শব্দ শোনার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। এই শব্দের মূল্য ঐ ব্যক্তিই জানে, যে এই শব্দ শোনার জন্য পাগল হয়ে থাকে। এটি একটি অনেক বড় নেয়ামত!।

সোনারুপার চেয়েও যার কদর বেশি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রা. বলেন, আমি এমন কিছু মহামানবের সংস্পর্শ পেয়েছি অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের সংশ্রবে ধন্য হয়েছি। যেহেতু তিনি নিজে তাবেয়ী। তাই তাঁর উস্তাদ হবেন সাহাবায়ে কেরাম সা.। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে পেয়েছি। তাদের সঙ্গলাভে ধন্য

হয়েছি। তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেকে সোনা-রূপার দিনার দেরহামের চেয়েও অধিক কদর করতেন। অর্থাৎ সাধারণত মানুষ সোনা রূপার প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এগুলো অর্জনের প্রতি আগ্রহী থাকে। স্বর্ণ পেলে মানুষ খুব হেফাজত করে। চোখের নজর থেকে দূরে সারিয়ে রাখে। তা যত্রতত্র রাখেন না। অন্যথায় চুরি হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম সময়কে সোনা রূপার চেয়েও দামি মনে করতেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেকে হেফাজত করতেন। বেকার ও অবৈধ পথ থেকে সময়কে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তারা মনে করতেন, সময় আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। এ নেয়ামত স্থায়ী নয়। এর স্থায়ীত্বের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। তাই সময়কে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যয় করতেন।

যবানে তালা লাগাও

এক ব্যক্তির ঘটনা। আমার আব্বা মুহাম্মাদ মুফতি শফী রহ. -এর নিকট সে প্রায় আসা যাওয়া করত। কিন্তু আব্বাজানের সঙ্গে তার কোনো ইসলাহী সম্পর্ক ছিলো না। কথা শুরু করলে আর থামার কোনো নামও নিতো না। এক কথা শেষ তো অন্য কথা শুরু। আব্বাজান ধৈর্যসহ শুনতেন। লোকটি একদিন এসে আব্বাজানের নিকট দরখাস্ত পেশ করল, হযরত! আপনার সঙ্গে আমি ইসলাহী সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী। আব্বাজান দরখাস্ত কবুল করলেন। বললেন, ঠিক আছে। এবার লোকটি বলল, হযুর! আমাকে কিছু আমল অযীফা দিন। আব্বাজান বললেন, অযীফা তোমার একটাই। তুমি মুখে তালা দাও। যবানকে লাগামহীন ছেড়ে রেখো না। তাকে সংযত রাখো। এটাই তোমার আমল। এটাই তোমার অযীফা। পরবর্তী সময়ে দেখা গেলো, যবানকে সংযত রাখার মাধ্যমেই সে আত্মশুদ্ধি লাভে ধন্য হলো।

দুই রাকাত নফলের কদর

রাসূল সা. একবার একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময়ে সঙ্গী সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা যে মাঝে-মধ্যে তাড়াতাড়ি করে দু'রাকাত নফল নামায পড়ো, জানো, এর মূল্য কতো?

তোমরা তো মনে করো এটা মামুলি ব্যাপার। কিন্তু যারা কবরে শুয়ে আছে, এটা তাদের জন্য বিশাল ব্যাপার। সারা দুনিয়া ও তার মাঝে বিদ্যমান সকল বস্তুও তাদের কাছে এত দামি নয়, যত দামি এ দুই রাকাত নফল নামায।

যেহেতু কবরবাসী এই দুই রাকাত নফল নামাযের জন্য আফসোস করবে। বলবে, হায়! যদি আরো দুই মিনিট সময় পেতাম। তাহলে আরো দুই রাকাত নফল পড়তাম। আর নেকীর পাল্লা ভারী করতাম।

মহব্বত প্রকাশের মাঝেও রয়েছে সওয়াব

একলোক ইমাম আবূ হানীফা রহ. কে জিজ্ঞেস করলো, হযরত স্বামী স্ত্রী যদি হাসি গল্প করে, একে অপরের প্রতি মহব্বত দেখায়, আর সে মুহূর্তে তার এ কল্পনাও নেই যে, আমরা এ সব করছি আল্লাহর বিধান পালনার্থে। তাহলে তখন কি সওয়াব পাওয়া যাবে? উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, হ্যাঁ! সওয়াব পাবে। আল্লাহ তাআলা এতেও সওয়াব দান করবেন। এ ক্ষেত্রে শুধু একবার নিয়ত করলেই চলবে যে, হে আল্লাহ! আমি এ সব কিছু আপনার জন্যই করছি। আপনার বিধান পালনার্থে করছি। এই রূপ নিয়ত একবার করলেই ইনশাআল্লাহ! যথেষ্ট হবে। প্রতিবার বা প্রতি মুহূর্তে এ নিয়ত করা জরুরি নয়।

অন্তরের কাঁটা আল্লাহর দিকে

আমি আব্বাজান রহ.-এর একটি পত্র আমি দেখেছি। পত্রটি লিখেছিলেন, হযরত থানবী রহ.-এর নামে। সেখানে লেখা ছিলো,

"হযরত! আমি অন্তরের হালত অনুভব করছি, কম্পাসের কাটা যেমন সর্বদা উত্তর দিকে থাকে, অনুরূপভাবে আমার অন্তরের অবস্থা হলো, আমি মাদরাসায়, বাসায়, দোকানে কিংবা মার্কেটে যেখানেই অবস্থান করি না কেন, আমি অনুধাবন করি যে, আমার অন্তরের কাঁটা সবদা থানা ভবনের দিকে ফিরে আছে।"

আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা আমাদেরকে দান না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এর প্রকৃতি মর্ম আমরা কীভাবে বুঝবো? চেষ্টা সাধনার

মাধ্যমে এটা হাসিল হয়। মানুষ যখন চলাফেরা, উঠাবসা মোটকথা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মত্ত থাকবে, তখন ধীরে ধীরে এ অবস্থা সৃষ্টি হবে। যবানে কথা চললেও অন্তর থাকবে আল্লাহর দিকে। এরূপ অবস্থা আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন। -আমীন

হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ.

হযরত লইস ইবনে সা'দ রহ. একজন শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদ ছিলেন। এমনকি তাঁর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মন্তব্য হলো,

الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به

> "লাইস ইবনে সা'দ রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকেও অনেক বড় ফেকাহবিদ ছিলেন। তবে তাঁর শীষ্যরা তাঁর ফেকাহ গুরুত্বের সঙ্গে সংরক্ষণ করে নি।"

হাদীস বর্ণনা শাস্ত্রেও তিনি অনেক বড় ইমাম ছিলেন। তিনি এতটাই প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন যে, একবার তাঁর জনৈক শীষ্য তাঁকে বললেন, আমরা অনেক সময় আপনার মুখে এমন এমন হাদীস শুনতে পাই, যা আপনার রচনাবলিতে পাওয়া যায় না।

উত্তরে লাইস ইবনে সা'দ রহ. বললেন, তোমরা কী মনে কর যে, আমি আমার বক্ষের সব হাদীস আমার কিতাবগুলোতে লিখে দিয়েছি। বাস্তবতা হলো, আমার বক্ষে যতগুলো হাদীস সংরক্ষিত রয়েছে, যদি আমি তার সবগুলো লেখার উদ্বেগ নেই, তাহলে সেই কিতাবগুলো বহন করার জন্য এই বাহনগুলো যথেষ্ট হবে না।

মহান আল্লাহ তাঁকে ইলম ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে ধন-সম্পদও দান করেছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁর বার্ষিক আয় বিশ থেকে পচিশ হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা ছাড়িয়ে যেত। কিন্তু তিনি বদান্যতা, মহানুভবতা ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার চেতনার এমন বিমূর্ত প্রতীক ছিলেন যে, গোটা জীবনেও তাঁর উপর জাকাত ফরজ হয় নি; বরং তাঁর সন্তানদের বক্তব্য হলো, বছরের শেষ দিকে অনেক সময় তিনি ঋণী হয়ে পড়তেন। কুতাইবা রহ. বলেন, তিনি প্রতিদিন তিন শো মিসকীন-কে সদকা দিতেন।

একবার কতিপয় লোক হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. কাছ থেকে কিছু ফল ক্রয় করলো। ক্রয়ের পর তাদের মনে হলো, ফলের দাম বেশি হয়ে গেছে। এ জন্য তারা ফল ফেরৎ দিতে এলো। হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. ফল গ্রহণ করে তার মূল্য ফেরৎ দিলেন। তারা রওয়ানা হতেই তিনি তাঁর কর্মচারীদের বললেন, ওদেরকে আরো পঞ্চাশটির দেরহাম দিয়ে দাও। তাঁর ছেলে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন,

اللّهم غفرًا، إنه قد كانوا املوا فيها أملًا فاحببت أن أعوضهم من املهم بهذا

"আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। ঐ লোকেরা ফল ক্রয়ের মাঝে একটি আশা বেঁধেছিল (যা পূর্ণ হয় নি)। কাজেই আমি চাইলাম ওদেরকে ওদের প্রত্যাশার বিনিময়ে কিছু বিনিময় দিয়ে দেই।"

একবার এক নারী এসে বলল, আমার ছেলে অসুস্থ। ওর জন্য কিছু মধু দরকার। হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. মধু ভর্তি একটি চামড়ার থলে তাঁকে দিয়ে দিলেন। সেই থলেতে ১২০ রেতেল (প্রায় ৬০ সের) মধু ছিল।

সেই নারী যতই অস্বীকার করে বলছিলো যে, আমার তো অল্প পরিমাণ মধু প্রয়োজন। কিন্তু হযরত লাইস রহ. তার কোনো কথাই শুনলেন না। মধু ভরা থলে তাঁর বাড়ি পৌছে দিলেন।

সমাজের গুণীজন ও সাধারণ জনতা সবার কাছে তিনি পরম শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় ছিলেন। তৎকালীন শাসক পর্যন্ত তাঁর সামনে মাথা নত করে থাকত এবং তাঁর পরামর্শের উপর আমল করতে পারাকে নিজের পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করতো। একবার বাদশাহ মানসূর তাঁকে মিশরের গভর্নর হওয়ার প্রস্তাব পেশ করেছিল। কিন্তু তিনি সবিনয়ে নাকচ করে দেন।

তিনি প্রতিদিন চারটি মজলিসের আয়োজন করতেন। একটি মজলিসে হাজির হয়ে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন। দ্বিতীয় মজলিসটি হতো, হাদীস শাস্ত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য। তৃতীয় মজলিসটি হতো, হাদীস শাস্ত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য। মজলিসটি হতো ফতোয়ার জন্য। এই মজলিসে লোকেরা তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করতো। চতুর্থ মজলিসটি

হতো জনসাধারণের সাহায্য সহযোগিতার জন্য। এখানে সাধারণ মানুষেরা এসে তাদের প্রয়োজনগুলো ব্যক্ত করতো এবং তিনি তা পূর্ণ করার চেষ্টা করতেন।

সাহাবায়ে কেরামের বীরত্ব

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এমন ছিলো যে, এক যুদ্ধের ময়দানে এক সাহাবী তিন চারজন দুশমনের ঘেরাওয়ে পড়ে গেলেন। দুশমনরা ছিলো অস্ত্র সজ্জিত। তারা তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। ইতিমধ্যে আরো একজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হলে শত্রুবাহিনীর মাঝে দাঁড়িয়েও ঐ সাহাবী একটুও ঘাবড়ালেন না। তখন কেউ একজন তাঁকে বললো, তুমি যেহেতু একাকী, আর দুশনরা অনেক শক্তিশালী, তাই তোমার বাহিনী আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো। আপাতত এদেরকে আক্রমণ করো না। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি আমার ও জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। এসব কাফের তো আমার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ।

এ ছিলো সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা। তাঁরা মৃত্যু থেকে পালাতেন না; বরং আলিঙ্গন করতেন। কারণ রাসূল সা.-এর বরকতে তাদের অন্তর থেকে মৃত্যুভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। জান্নাত জাহান্নাম যেন তারা স্বচোক্ষে দেখতেন।

এক সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে দেখলেন, তাঁর সামনে কাফের বাহিনী। সকলেই অস্ত্র সজ্জিত। তাদের দেখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাঁর মুখ থেকে নিম্লোক্ত কবিতাটি বের হয়–

غدًا نلقى الأحبة + محمد وصحبه

"আহ! কী চমৎকার দৃশ্য! আগামীকাল আমি আমার প্রিয়তম মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হচ্ছি।"

আরেক সাহাবী তীর দ্বারা আহত হয়েছেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। তখন তিনি অবলিলায় বলে ওঠলেন,

فزتُ وربِّ الكعبة

"কাবার প্রভূর কসম! আজ আমি সফল হয়েছি।"

এ ছিলো সাহাবায়ে কেরামের দৃশ্য। যারা দুনিয়ার মুহব্বাত-কে অন্তর থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

একটি মূল্যবান বাক্য

আমরা আব্বাজান মুফতি শফী সাহেব রহ.-এর ইন্তেকালের আমি খুব ব্যাথিত হই। জীবনে এত বেশি কষ্ট আমি কখনো পাইনি। এই ব্যাথার ফলে আমি সহজে শান্তি ফিরে পাচ্ছিলাম না। চোখে অশ্রুও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বুকের ব্যাথাও দূর হাচ্ছিলো না। কেননা কখনো কখনো কাঁদার ফলে অন্তরের ব্যথা দূর হয়। তখন আমি আমার এই অবস্থা জানিয়ে আমার শায়খ হযরত ড. আবদুল হাই সাহেব রহ.-এর কাছে চিঠি লিখলাম। উত্তরে তিনি মাত্র একটি বাক্য লিখে দেন– আলহামদুলিল্লাহ! আজো সে বাক্যটি অন্তরে অংকিত হয়ে আছে। ঐ বাক্যটির মাধ্যমে আমি বর্ণনাতীত উপকৃত হয়েছি। ঐ বাক্যটি হলো–

صدمہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن غیر اختیاری امور اتنی پریشانی قابل اصلاح ہے

> “ব্যথা তো সস্থানে ঠিক আছে। (তা হওয়া উচিত)। কিন্তু বাধ্যগত বিষয়ে এত বেশি পেরেশানি, এই রোগের সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়।”

অর্থাৎ ব্যথা তো স্বস্থানে ঠিক আছে। তা হওয়া চাই। কেননা মহান পিতার বিচ্ছেদ ঘটেছে। তবে এটি একটি অনিচ্ছাকৃত বিষয়। তাই বলে এত বেশি বিচলিত হওয়া ঠিক হবে না। ভাগ্যলিপিতে সন্তুষ্ট থাকার বিধানের উপর আমল হচ্ছে না। এর আমল হচ্ছে না; বিধায় আমার পেরেশানি হচ্ছে।

বিশ্বাস করুন, এই একটি বাক্য পাঠের পর যেন আমার অন্তরে বরফ ঢেলে দেওয়া হয়েছে এবং আমার চোখ খুলে যায়।

আরেকটি ঘটনায় হযরত মাওলানা মাযীহুল্লাহ রহ.-কে আমি চিঠি লিখি যে, হযরত অমুক কারণে আমার খুব পেরেশানি হচ্ছে। উত্তরে হযরত এই বাক্য লিখেন,

جس شخص کا اللہ جل جلالہ سے تعلق ہوا، اس کا پریشان سے کیا تعلق.

"মহান আল্লাহ তাআলার সাথে যার সম্পর্ক আছে, সে পেরেশান হয় কী করে?"

অর্থাৎ পেরেশানি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক গভীর নয়। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর হলে তো পেরেশান হওয়া অসম্ভব। কারণ, যার ব্যাথা বা পেরেশানি হচ্ছে, সে যেন আল্লাহকে বলে, হে আল্লাহ! এই পেরেশানিকে দূর করে দাও। এরপর আল্লাহ যে ফায়সালা করেন, তার উপর সন্তুষ্ট থাকো। তাই নিজের সার্বিক অবস্থায় যদি ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস হয়ে যায়, তন-মনে যদি "ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা" প্রবেশ করে, তবে পেরেশানি আসতেই পারে না।

হুযুর সা.-এর শিক্ষা

عن ابی موسی رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : إن مثل بعثنی الله من الهدی والعلم کمثل غیثٍ أصاب أرضًا فکانت منها طائفة طیبة .... الخ. (صحیح بخاری، کتاب العلم، باب فضل من علم وعلم)

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'আমাকে যে হেদায়েত ও ইলমসহ প্রেরণ করা হয়েছে, এর উদাহরণ ঐ বৃষ্টির মতো, যা এমন ভূমির উপর বর্ষিত হলো, যার তিন ধরনের অংশ ছিলো।

প্রথম অংশ ছিলো, খুব উর্বর- পানি গ্রহণের উপযোগী। তাই সেখানে অনেক তৃণলতা ও শষ্য জন্মালো।

দ্বিতীয় অংশ ছিলো অনুর্বর- পানি গ্রহণের অনুপোযোগী। তাই উপরিভাগে পানি আটকে জলাশয়ের সৃষ্টি হলো। লোকেরা এবং জীবজন্তু এ থেকে উপকৃত হলো। তারা পান করলো। ক্ষেতে সিঞ্চন করলো এবং আবাদ করলো।

তৃতীয় অংশ ছিলো, এত কঠিন, যা পানি গ্রহণে সক্ষম নয় এবং পানি ধরনের সক্ষম নয়। তাই তাতে তৃর্ণলতা ও শষ্য জন্মালো না। লোকেরা এ থেকে উপকৃত হতে পারলো না; বরং বৃষ্টির পানিগুলো শুধুই গড়িয়ে গেলো।'

তারপর তিনি বলেছেন, আমি যে হেদায়েত ও শিক্ষাসহ এসেছি, তার দৃষ্টান্ত এই বৃষ্টির পানির মতো, এ হেদায়েতও শিক্ষা যাদের কাছে পৌঁছেছে, তারাও তিন শ্রেণিতে ভিক্ত।

প্রথম শ্রেণী হলো, তারা আমার আনিত হেদায়েত ও শিক্ষামালা নিজেরা গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছে। ফলে তাদের আমল ও চরিত্র শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং মানুষের জন্য তারা উত্তম আদর্শ বনে গিয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, যারা নিজেরা আমার শিক্ষামালা গ্রহণ করেছে এবং অন্যদেরও এর দ্বারা উপকৃত করেছে। নিজেরা শিখেছে এবং অপরকেও শিখিয়েছে। দরস, তাদরীস ওয়াজ নসীহত, দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণী হলো, যারা আমার শিক্ষামালার দিকে মাথা তুলেও তাকালো না; বরং এক কান দিয়ে ঢুকিয়েছে, অপর কান দিয়ে বের করে দিয়েছে। আমাকে যে হেদায়েতসহ প্রেরণ করা হয়েছে, তারা তা গ্রহণ করলো না এবং অন্যকেও এর দ্বারা উপকৃত করলো না। -সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলমি

উক্ত হাদীসের মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূল সা.-এর শিক্ষামালা হতে নিজে উপকৃত হতে হবে এবং এর দ্বারা অপরকেও উপকৃত করতে হবে অথবা কমপক্ষে নিজে উপকৃত হতে হবে। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ নেই। তৃতীয় পথটি হলো ধ্বংসের পথ, পতনের পথ। এ কথাটি অপর এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে—

كن عالمًا أو متعلمًا ولا تكن ثالثًا فتهلك

'দ্বীনের আলেম হও। নিজেও আমল করবে অপরকেও দাওয়াত দিবে অথবা দীনের ইলম শিক্ষা করো। এ ছাড়া তৃতীয়টা গ্রহণ করো। তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

বুযুর্গদের বিভিন্ন অবস্থা

জনৈক ব্যক্তি এক বুযুর্গের মুরিদ ছিলো। একবার সে তার শায়খকে বলল, হযরত! আমি শুনেছি যে, বুযুর্গানে দীন ও আউলিয়ায়ে কেরামের ভিন্ন ভিন্ন শান হয়। আমি দেখতে চাচ্ছি যে, তাদের শান কী রকম?

শায়খ বলেন, তুমি এ বিষয়ের পিছে পড়ো না। নিজের কাজে ব্যস্ত থাকো। তুমি কি তাদের অবস্থা ও শান অনুধাবন করতে পারবে?

মুরিদ সাহেব বলল, আপনার কথা সঠিক। কিন্তু আমার মন চায় যে, বুযুর্গদের অবস্থার বিভিন্নতা অনুভব করি।

বুযুর্গ বললেন, যদি এ বিষয়ের প্রতি তোমার এতো আগ্রহ হয়, আর তুমি যদি নাছোড়বান্দা হয়ে থাকো, তবে শোনো; অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে তুমি তিনজন বুযুর্গকে 'আল্লাহ আল্লাহ" যিকিররত অবস্থায় পাবে। তুমি গিয়ে তিনজনের কমরে এক একবার লাথি মারবে এবং পরবর্তী ঘটনা কি ঘটে তা তুমি আমাকে শোনাবে।

লোকটি মসজিদে গিয়ে তিনজন বুযুর্গকে বাস্তবেই যিকিররত অবস্থায় পেলো। শায়খের নির্দেশ মোতাবেক এক বুযুর্গের কমরে লাথি মারলে সেই বুযুর্গ পিছে ফিরেও তাকালো না যে, কে তাঁকে লাথি মরলো? নিজের যিকিরেই ব্যস্ত থাকলেন।

এরপর দ্বিতীয় বুযুর্গকে মারলে বুযুর্গ পিছে ফিরে তার হতে ধরে বলতে থাকলেন, ভাই! তোমার কষ্ট হয় নি তো? ব্যথা পাওনি তো?

তৃতীয় বুযুর্গকে মারলে সে সঙ্গে সঙ্গে পিছে ফিরে উল্টো তাকে লাথি মেরে আবার যিকিরে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

এই মুরিদ ব্যক্তি তার শায়খের দরবারে ফিরে এসে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন যে, প্রথম বুযুর্গকে মারার পর তিনি পিছে ফিরেও তাকালো না। দ্বিতীয় বুযুর্গকে মারলে তিনি উল্টো হাত বুলিয়ে দেন এবং তৃতীয় বুযুর্গকে মারলে সঙ্গে সঙ্গে বদলা দিয়ে নেয় এবং আমাকেও লাথি মারেন।

ঘটনা শুনে শায়খ বললেন, তুমি তো জিজ্ঞেস করেছিলে যে, বুযুর্গদের ভিন্ন ভিন্ন শান কি রকম হয়ে থাকে? ইতোমধ্যে তুমি তা পৃথক পৃথক দেখেও নিয়েছো।

প্রথম বুযুর্গের এক ধরনের শান। তিনি ভেবেছেন, আমি তো আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত আমি। যিকিরের যে স্বাদ ও মজা আমি পাচ্ছি, তা ছেড়ে কেন আমি পেছনে দেখবো যে, কে আমাকে মারলো?

দ্বিতীয় বুযুর্গের মাঝে সৃষ্টিজীবের প্রতি ভালবাসা প্রবল। তাই তিনি প্রতিশোধ না দিয়ে উল্টো তাঁকে বললেন, তোমার কোনো কষ্ট হয় নি তো?

তৃতীয় ব্যক্তি এই জন্য দ্রুত প্রতিশোধ নিলেন, যেন ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ না হয় এবং এই প্রতিশোধ নেয়ার কারণে আখেরাতের আজাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবেন।

জন্তু তিন প্রকার

ইমাম গাযালী রহ. 'ইয়াহ্ইয়া উল উলূম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তিন প্রকার জন্তু সৃষ্টি করেছেন। প্রথমতঃ যেগুলো মানুষকে শুধু উপকৃত করে। ক্ষতির ঘটনা তাদের দ্বারা সাধারণত ঘটে না।

যেমন গরু, ছাগল, ইত্যাদি। এগুলো মানুষকে দুধ দেয়। দুধ বন্ধ হলে মানুষ এগুলো জবাই করে খায়। সুতরাং নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হলেও এরা মানুষের উপকার করে। তবু এরা মানুষের ক্ষতি করে না।

দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল জন্তু, যেগুলো মানুষের শুধু ক্ষতিই করে। সাধারণত উপকার তারা করে না এবং বাহ্যত তাদের কোনো উপকার নেই। যেমন সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি। এগুলো মানুষ দেখলেই ছোবল মারে।

তৃতীয়তঃ ঐ সকল জন্তু, যেগুলো মানুষের উপকার করে না, ক্ষতিও করে না। যেমন, বন শিয়াল, বাগডাশা ইত্যাদি। এগুলোর মানুষের বিশেষ কোনো উপকার করে না, আবার ক্ষতিও করে না। জন্তুর ঐ তিন প্রকারের বর্ণনা শেষে ইমাম গাযালী রহ. মানবজাতির উদ্দেশ্যে বলেন, হে মানুষ! তুমি পৃথিবীর সর্বশেষ্ট সৃষ্টি। সকল জন্তুর চেয়ে তোমার মর্যাদা বেশি। তুমি যদি "মানুষ" হতে না পারো, তাহলে কমপক্ষে প্রথম শ্রেণীর জন্তু হও। অর্থাৎ গরু ছাগলের মত মানুষের উপকারী হও। কারো ক্ষতি করো না। যদি তুমি দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্তুর মতো মানুষকে কষ্ট দাও, তাহলে তোমার মাঝে আর সাপ বিচ্ছুর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

পবিত্র কুরআনে আমানত

এই আমানত সম্পর্কেই মহান আল্লাহ সূরা আহযাবের শেষ রুকুতে বলেছেন যে,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا. سورة الأحزاب اية ٧٢:

'আসমান, জমিন ও পাহাড়গুলোর উপর আমি এই আমানত পেশ করেছিলাম যে, তোমরা এই আমানতের বোঝা গ্রহণ করো। তখন তারা প্রত্যেকেই অস্বীকার করেছিলো। তারা বলেছিল, এটা আমাদের সহ্যসীমার বাইরে। আমরা এটি গ্রহণে ভয় করি।'

সেই আমানত কী ছিল?

সেই আমানত ছিলো এই যে, তাদেরকে বলা হয়েছিলো, আমি তোমাদেরকে বুদ্ধি দিবো, সমঝ দিবো, জীবন দিবো। এই বুদ্ধি, সমঝ ও জীবন তোমাদেরকে আমানত হিসেবে দান করবো। আমি বলে দিবো, তোমরা এগুলো কোথায় কাজে লাগবো এবং কোথায় কাজে লাগাবে না। তোমরা তোমাদের জীবন পরিচালনা করবে আমার এ বিধান মোতাবেক। তাহলে তোমরা জান্নাত পাবে। আর যদি আমার বিধি বিধানের বিরুদ্ধে জীবন পরিচালিত করো, তাহলে তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যেখানে তোমরা চিরস্থায়ী আজাব ভোগ করবে।

আসমান তখন উত্তর দিয়েছে, জানা নেই, এই আমানত গ্রহণ করার পরে সামাল দিবে পারবো কি না? যদি সামলাতে না পারি, তাহলে আপনি তো বলেছেন। জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবো। তার চেয়ে ভালো এই যে, আমাদের জন্য জান্নাত-জাহান্নাম কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। শংকা ও সম্ভাবনামুক্ত জীবনই আমাদের জন্য শ্রেয়।

জমিনকে আল্লাহ বলেছিলেন, তোমার দৈর্ঘ্য-প্রস্ত বিশাল। তোমার মাঝে পাহাড় আছে, সমূদ্র আছে, অসংখ্য গাছপালা ও পাথর আছে। সূতরাং তুমি এই আমানত গ্রহণ করো।

জমিন উত্তর দিয়েছিল, এর যোগ্য আমি নই। যদি এটি গ্রহণ করি, তাহলে না জানি, কী হাশর হয়। এই বলে জমিনও এই আমানত গ্রহণ করে নি।

তারপর আল্লাহ তাআলা পাহাড়কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তুমি আমার কঠোর প্রকৃতির সৃষ্টি। মানুষের কঠিন হৃদয়কে কঠোর পাহাড়ের সাথে তুলনা করা হয়। তুমি এই আমানত গ্রহণ করো।

পাহাড়ও বিনয়ের সাথে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। সে উত্তর দিয়েছিল, আমরা যেমন আছি, তাই ভালো। যদি পরীক্ষায় পড়ে যাই, তাহলে সফল হবো কিনা জানা নেই। যদি ব্যর্থ হই তাহলে তো মহা মসীবতে পড়ে যাবো।

তারপর আমরা মানুষ এই আমানত গ্রহণ করে বসলাম। হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির কয়েক হাজার পূর্বে অনাদি জগতে সৃষ্ট সকল রূহকে এক সাথে করেছিলেন। প্রতিটি রূহ ছোট পিপড়ার আকৃতিতে উপস্থিত হয়ে ছিল। তখন তাদেরকে বলা হয়েছিল। আসমান জমিন ও পাহাড়, কেউতো এই আমানত গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করল না। তোমরা এই আমানত নিবে? তখন মানুষ উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ, নেবো। এরপরই এই আমানত মানুষের কাছে এলো। সতরাং এই জীবন আমানত, এই দেহ আমানত, দেহের প্রতিটি অঙ্গ আমানত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমানত। যে আমানতগুলোর প্রতি যত্ন নিবে, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা পাবে। এই আমানতের কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অন্যত্র এভাবে বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে যে আমানত গ্রহণ করেছো এবং তাঁর রাসূল যে আমানত সম্পর্কে বিস্তারিত বাতলে দিয়েছেন, যেই আমানতে খেয়ানত করো না। তোমাদের কাছে সংরক্ষিত আমানতগুলো রক্ষা করবে।'

এটাই আমানতের প্রধান ব্যাখ্যা।

হুযুর সা. আমানতদারিতা

'আস-সাদিক' ও 'আল-আমীন'- এ দু'টি উপাধি ছিলো আমাদের নবীজি সা.-এর। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তিনি গোটা আরবে এ দু'টি অভিধায়

ভূষিত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত আমানতদার। তাঁর কাছে যে-ই আমানত রাখতো, পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে রাখতো। এমনকি মক্কার লোকেরা যে নবীজিকে পারলে পিষে মারতো, তারাও তাঁর কাছে আমানত রাখতো নিদ্বির্ধায় ও নিঃস্বংকচিত্তে। এ জন্য দেখা যায়, নবীজী সা. যখন হিজরত করেছেন, তখনও তার কাছে ছিলো মক্কা বাসীর কাড়ি কাড়ি সম্পদ। তখনও তিনি সেগুলো প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সে দিন তিনি এসব সম্পদ হযরত আলী রা.-এর হাতে উঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যদি আমি মক্কাবাসীদের এসব সম্পদ সরাসরি তাদের কাছে পৌঁছে দেই, তাহলে আমার হিজরতের রহস্য তাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়বে। এ জন্য এগুলো তোমার কাছে রেখে গেলাম। তুমি প্রত্যেকের সম্পদ পৌঁছে দিয়ে পরেও তুমিও মদিনায় চলে এসো। এই বলে তিনি সেদিন হযরত আলী রা.-কে নিজের বিছানায় শুইয়ে রেখে মদিনার পথে পাড়ি দিয়েছিলেন।

খায়বর যুদ্ধের ঘটনা

খায়বর ছিলো ইহুদিদের সম্পদ। রাসূলুল্লাহ সা. খায়বর যুদ্ধের সময় ইহুদিদের দুর্গগুলো অবরোধ করেছিলেন। ইহুদিরা রক্তে মুসলিমবিরোধী বিদ্বেষ পোষণ করতো। ষড়যন্ত্রের প্রতিটি কর্মসূচী তারা এই খায়বার নগরীকে পরিচালনা করতো। শহরটিতে ছিলো বেশ কয়েকটি দুর্গ। মূলত এ দুর্গগুলো পরিণত হয়েছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে। মুসলিম উম্মাহকে এহেন ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. শহরটিকে অবরোধ করলেন। ফলে ইহুদিরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়রো।

এভাবে যখন কয়েকদিন চলে গেলো, তখন ইহুদিদের একজন রাখাল- যার নাম ছিলো আসওয়াদ, সে ছাগল চরানোর উদ্দেশ্যে দুর্গের বাইরে এলো। সে লক্ষ্য করলো, খায়বরের বাইরে মুসলমানগণ তাঁবু ফেলেছে। সে ভাবলো, যাই না মুসলমানদের কাছে, দেখি তারা কী করে? তারপর সে ছাগল চরাতে চরাতে মুসলিম বাহিনীর কাছে গিয়ে পৌঁছলো। জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের নেতা কে? মুসলমানগণ বললেন, আমাদের নেতা

হযরত মুহাম্মাদ সা.। তিনি এই তাঁবুর ভেতরেই আছেন। প্রতমে সে কথাটি পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি। সে ভেবেছে, এত বড় একজন নেতা! এই ক্ষুদ্র তাঁবুর ভেতর কেমন করে থাকবেন। সে ভেবেছিলো, তিনি যখন এত বড় বাদশাহ, তখন নিশ্চয়ই জমকালো কোনো আসনে সমাসীন হবেন। কিন্তু এই তাঁবুর ভেতরেতো সামান্য খেজুর পাতার চাটাই বিছানো। অবশেষে সে বিষয়টি বুঝবার জন্য তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে সাক্ষাত করলো।

সাক্ষাত করে সে জানতে চাইলো, আপনি কী পয়গাম নিয়ে এসেছেন, আপনি কিসের দাওয়াত দেন? রাসূলুল্লাহ সা. তাকে ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে বললো, আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তাহলে আমার পরিণতি কী হবে? আমি এর বিনিময়ে কী পাবো? রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করলেন, এই জীবনটা ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুর পরে আরেক জীবন আসবে, যা হবে চিরস্থায়ী। ঐ চিরস্থায়ী জীবনে তুমি সুখে থাকবে।

তারপর রাখাল জানতে চাইলো, আমি যদি মুসলমান হই, তাহলে এই মুসলমানরা আমাকে কেমন চোখে দেখবে? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর তুমি তাদের ভাই হয়ে যাবে। তারা তোমাকে বুকে জড়িয়ে নেবে।

এ কথা শোনার পর রাখাল বললো, আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন? তারা কোথায় আর আমি কোথায়! আমি একজন সামান্য গোলাম মাত্র। আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তারা কীভাবে আমাকে আলিঙ্গন করবে?

রাসূলুল্লাহ সা. উত্তর দিলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা অবশ্যই তোমাকে আলিঙ্গন করবে। আল্লাহ তোমার কৃষ্ণ মুখকে আলোকিত করে দেবেন। তোমার শরীর থেকে বিচ্ছুরিত দুর্গন্ধকে তিনি সুগন্ধিতে পরিণত করে দেবেন।

এ কথা শোনার পর সে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলো এবং পাঠ করলো–

اشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله

ঈমান গ্রহণের পর সে হুযূর সা.-কে নিবেদন করে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো এখন ঈমান এনেছি। আমি এখন আপনার অনুগত। আপনি যে নির্দেশ দিবেন তা যথাযথ পালন করবো। তাই বলুন, এখন আমি কী করবো? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, প্রথমে একটা কাজ করো। তুমি তো ইহুদী রাখাল। তুমি ইহুদিদের যে ছাগলগুলো নিয়ে এসেছো, প্রথমে সেগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দাও। কারণ, সেগুলো তোমার হাতে তাদের আমানত। সুতরাং তুমি খায়বরের ভেতরে গিয়ে তা মালিকদের কাছে পৌঁছে দাও।

একটু ভেবে দেখুন! পরিস্থিতিটা ছিলো যুদ্ধের। দুশমনদের দুর্গ অবরোধ করে রাখা হয়েছে। অথচ গোটা বিশ্বে স্বীকৃত যুদ্ধনীতি হলো, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দুশমনের জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ বৈধ। তাছাড়া তখন মুসলমানদের হাতে পর্যাপ্ত রসদও ছিলো না।

এমনকি এই যুদ্ধে অনেক সাহাবা বাধ্য হয়ে নিজেদের গাধা জবাই করে খেয়েছিলেন। তারপর রাসূল সা. গাধার গোশত খাওয়া নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এ থেকে অনুমেয় হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম তখন কত অভাব-অনটনে সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু যেহেতু এই রাখাল ছাগলগুলোর মালিকের সাথে এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলো যে, সে এগুলোর শুধুই রাখাল। তার হাতে এগুলো আমানতমাত্র। তাই রাসূল সা. ছাগলগুলো ফিরিয়ে দিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন এবং এরপর তাঁর কাছে ফিরে আসতে বললেন।

ফলে রাখাল ছাগলগুলো নিয়ে দূর্গের ভেতরে চলে গেলো এবং ছাগলগুলো সেখানে রেখে এসে পূনরায় রাসূল সা.-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখন আমি কী করবো?

রসূলুল্লাহ সা. বললেন, দেখো! তুমি এখন একটি সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছো, যখন নামাযেরও সময় নয় যে, তোমাকে নামায পড়তে বলবো। রোজার মাসও নয় যে তোমাকে রোযা রাখতে বলবো। তোমার উপর যাকাত ফরজ নয় যে, তোমাকে যাকাত প্রদান করতে বলবো। এখন তো একটি মাত্র ইবাদত আছে, তা তরবারির ছায়াতলে পালন করা যায়। আর তা হলো "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ" (আল্লাহর পথে জিহাদ)। সুতরাং তুমি জিহাদে শামিল হয়ে যাও।

রাসূল সা. -এর মুখে এ কথা শুনে রাখাল বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই জিহাদে অংশ নিচ্ছি। কিন্তু যে ব্যক্তি জিহাদে অংশ গ্রহণ করে, সে হয়ত গাজী হয়, নয়ত শহীদ। যদি আমি শহীদ হই, তাহলে আমার কী হবে?

রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমি তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি, যদি তুমি শহীদ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে কৃষ্ণ অবয়বকে সুন্দর শুভ্র করে দেবেন এবং তোমার শরীরের দুর্গন্ধকে সুগন্ধিতে পরিণত করবেন।

অবশেষে আল্লাহর এই প্রিয় বান্দা উক্ত জিহাদে অংশ নিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন।

যখন খায়বর যুদ্ধ শেষ হলো, রাসূল সা. মাঠের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য বের হলেন। তিনি দেখতে পেলেন, এক জায়গায় কতিপয় সাহাবা ভিড় জমিয়েছেন। তাই তিনি কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, এ লোকটিকে তো আমরা চিনি না। কিন্তু লোকটি আমাদের পক্ষে লড়াই করেছে। তাঁর ক্ষতবিক্ষত লাশ পড়ে আছে। কিন্তু আমরা জানি না, লোকটি কে এবং কিভাবে শহীদ হলো?

রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, লোকটিকে আমাকে দেখাও! তিনি লোকটিকে দেখে বললেন, তোমরা একে চিনবে না। আমি চিনি। এ হলো সেই লোক, যে জীবনে আল্লাহর দরবারে একটি সেজদা করার সুযোগও পায় নি। আল্লাহর পথে একটি পয়সাও খরচ করার সুযোগ পায় নি। কিন্তু আমি স্বচোক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তাঁকে সোজা জান্নাতে পৌছিয়ে দিচ্ছেন। এর কৃষ্ণ অবয়বকে সুন্দর ও শুভ্র করে দিচ্ছেন। তাঁর গায়ের দুর্গন্ধকে মেশক আম্বরের চেয়ে অধিক সুঘ্রাণ দ্বারা ভরে দিচ্ছেন।

লক্ষ্য করুন! যুদ্ধ-পরিস্থিতেও রাসূল সা. যেখানে রণাঙ্গনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে, একে অন্যের প্রাণ কেড়ে নিতে বিভোর– সেখানেও রাখাল আমানতের খেয়ানত করবে, মুসলমানগণ ঐ সকল বকরিগুলো দখল করবে- তা সহ্য করেন নি; বরং তা ফেরৎ পাঠিয়েছেন।

এই হলো আমানতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য। যা রাসূল সা. নিজে পালন করে দেখিয়েছেন। সুতরাং আমনতের খেয়ামত করা মু'মিনদের কাজ নয়। তাই

হাদীসে এসছে, রাসূল সা. এরশাদ করেন, তিনটি বস্তু এমন রয়েছে, সেগুলোর যার মাঝে পাওয়া যাবে, সে পাক্কা মুনাফেক। কথা বললে মিথ্যা বলে। ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং তার নিকট কেউ আমানত রাখলে সে তা খেয়ানত করে।

এই তিনটি বিষয় যার মাঝে পাওয়া যাবে, তাকে মুমিন বলা হবে না; বরং সে মুনাফেক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আমানত রক্ষা করার এবং খেয়ানত থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন। -আমীন।

গোল্ড কোস্টে

আমার গোল্ড কোস্টে যাওয়ার কথা ছিলো। গোল্ড কোস্ট কুইন্সল্যান্ডের একটি উপকূলীয় শহর। এটি ব্রিসবেন থেকে প্রায় পচাত্তর কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গোল্ড কোস্ট একটি বড় পর্যটন কেন্দ্র। ব্রিসবেন থেকে বের হয়ে ওখানে পৌছতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেলো। উপকূলীয় এলাকা দিয়ে এই পথটি এগিয়ে ছিলো। পথের দুপাশে ছিল সবুজ প্রান্তর ও ছোটোছোট শহর। গোল্ড কোস্টে পৌছে আমরা যোহরের নামায আদায় করি। আল্লাহর মেহেরবানিতে ওখানে একটি সুন্দর মসজিদ আছে এবং এটি মুসলমানদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের জন্য সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। মসজিদের মেঝে অনেক বিস্তৃত। বিস্তৃত মেঝের মাঝে মুসলমানদের সাধারণ সভার জন্য অতি প্রশস্ত একটি হলকক্ষ আছে। মসজিদের সংলগ্ন একট পাঠাগার এবং মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একটি মাদরাসাও আছে। এই ইসলামিক সেন্টারের ধর্মীয় বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্বশীল মাওলানা আসাদুল্লাহ তারেক সাহেব। মাশাআল্লাহ! তিনি ব্যাপক ইলমের অধিকারী একজন আলেম। তিনি হযরত মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নৌরী রহ. -এর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি ভারতের জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নৌরী টাউন থেকে "তাখাসসুস ফিদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ"-এর বিশেষ পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করে প্রথমে ফিজি আইল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ড-এ কর্মরত থাকেন। এখন তিনি অস্টেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের মুসলমানদের ধর্মীয় দিকনির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন। ইংরেজি ভাষার উপর তাঁর পরিপূর্ণ দখল আছে। বক্তৃতাতেও তিনি

এখানে বেশ নাম কুড়িয়েছেন। আসাদুল্লাহ সাহেব খ্রিস্টধর্মের উপরেও ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন এবং খ্রিস্টান নারী পুরুষকে ইসলামে দীক্ষিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া মুসলমানদের সামগ্রিক সমস্যাগুলোর সমাধান প্রদানে তাঁকে এই এলাকায় মুসলমানদের প্রতিনিধি মনে করা হয়। তিনি আল্লাহর মেহেরবানিতে বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

একবার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অভিযুক্ত হওয়ার ফলে কয়েকজন যুবককে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মাঝে একজন মুসলমান যুবকও ছিলো। বাকিরা ছিল অমুসলিম। অমুসলিম যুবকদের আইনজীবি সম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে দাবি জানান যে, মূল অপরাধী ঐ মুসলিম যুবকটি। তিনি তার দাবির পক্ষে এই স্বাক্ষ পেশ করেন যে, মুসলমানরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে কট্টরপন্থি হয়ে থাকে। বিচারক অমুসলিম আইনজীবির কথামতো অমুসলিম যুবকদেরকে নির্দোষ ঘোষণা করে কেবল মুসলিম যুবকটিকে দণ্ডাদেশ দেন। বিচারক তাঁর রায়ে লেখেন যে, মুসলমানরা কট্টরপন্থি। কিন্তু মাওলানা আসাদুল্লাহ তারেক সাহেব বিচারকের বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ও আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। পত্রপত্রিকায় তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। বিষয়টি অনেক দূর গড়ায়। অবশেষে বিচারককে তার মন্তব্য ও আদেশের ব্যাপারে ভুল স্বীকার করতে হয় এবং এটাও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অস্টেলিয়ায় খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলের ছাত্রদেরকে মসজিদ প্রদর্শন করানোর প্রথাও প্রচলিত আছে। এসব ক্ষেত্রে মিশনারির শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতামূলক ও অন্ধত্ব নির্ভর পুরনো প্রশ্নগুলো শিখিয়ে পাঠান। খ্রিস্টানরা এই প্রশ্নগুলোকে বহু বছর ধরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে আসছে এবং সেগুলোকে বাতাসে ভাসিয়ে রেখেছে। যেমন, ইসলাম তরবারির শক্তিতে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে। ইসলাম নারীদের প্রতি অবিচার করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার মিশনারি ছাত্রদের মসজিদ পরিদর্শনকালে মাওলানা তারেক তাদের প্রশ্নের জবাবে এমন প্রভাবশালী ও যুক্তিযুক্ত উত্তর দেন যে, ছাত্রদের সঙ্গে আসা শিক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভুল স্বীকার করেন। তিনি

বলেন, আমাদের দীর্ঘদিনের মনোভাবের বিপক্ষে এই প্রথমবার সত্য উন্মোচিত হলো যে, ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এসব আপত্তি বিদ্বেষ ও অবিচার মূলক ও নিছক প্রোপাগান্ডার ফসল।

শুধু মাত্র "মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ" লেখার অনুমতি

হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নৌরী রহ. বলেন, তালাক সম্পর্কিত এক মাসআলা নিয়ে কাশ্মিরের ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতনৈক্য দেখা দিল। উভয় পক্ষ হযরত শাহ সাহেবকে বিচারক মেনে নিলেন। তিনি উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বেশ মনোযোগের সাথে শুনলেন। তাঁদের মধ্যে হতে একজন নিজের অবস্থানের স্বপক্ষে "ফাতাওয়ায়ে আহমদিয়া"-এর একটি ইবারত দ্বারা দলিল দিল। হযরত শাহ সাহেব বললেন, "আমি দারুল উলূমের লাইব্রেরীতে "ফাতাওয়ায়ে আম্মাদিয়া" -এর একটি হস্তাক্ষরে লেখা বিশুদ্ধ নুসখা পড়েছি। তার কোথাও এই ইবারত নেই। কাজেই হয়ত তার দেখা নুসখার মাঝে ভুল আছে অথবা এ লোক মিথ্যা বলছে।

এ ধরনের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তি যদি নিজের সম্পর্কে বড় কোনো দাবি করে বসতেন, তাহলে অবশ্যই কোনো না কোনো ভাবে তা সত্য বলে প্রমাণিত করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব সেই সীরাতে মুস্তাকীমের পথে যাত্রাকারী দলের একজন সদস্য ছিলেন, যারা من تواضع لله رفعه الله [আল্লাহর জন্য যে বিনয়ী হবে, আল্লাহ তার মর্যাদা আরো উন্নীত করবেন] হাদীসটি নিজের সকল জীবনাচারে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনাটি হযরত শাহ সাহেব যখন উভয় পক্ষের শুনানী শেষে হযরত বিন্নৌরী রহ.-কে নিজের রায় জানিয়ে দিয়ে লিখতে বললেন, তখন তিনি শাহ সাহেবের নামের সাথে الحبر البحر। [জ্ঞানসমূদ্র] এই দুই সম্মানসূচক শব্দ জুড়ে দিলেন, তখন হযরত শাহ সাহেব জোরপূর্বক তাঁর থেকে কলম ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই সে শব্দদ্বয় কেটে দিলেন এবং রাগতস্বরে হযরত বিন্নৌরী রহ. কে বললেন,

آپکے لئے صرف مولانا محمد انور شاہ لکھنے کی اجازت ہے

"আপনার জন্য শুধুমাত্র "মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ" লেখার অনুমতি রয়েছে।"

এরপর যখন তাঁর মত ব্যক্তিত্ব সর্বদা কিতাব নিয়েই ডুবে থাকেন, তখন তাঁর মুখ থেকে নির্গত এ ধরনের বাক্য কিতাবের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোন উচ্চস্তরকে নির্দেশ করে?

میں مطالعہ میں کتاب کو اپنا تابع کبھی نہیں کرتا،

بلکہ ہمیشہ خود کتاب کے تابع ہو کر مطالہ کرتا ہوں

"আমি পড়ার সময় কখনই কিতাবকে আমার অনুগামী বানাই নি; বরং সর্বদা আমি নিজেই কিতাবের অনুগত করে অধ্যয়ন করি।"

হযরত মাওলানা কারী তাইয়িব সাহেব রহ. বলেন, সফর হোক বা বাড়িতে হোক' আমরা কখনো হযরতকে শুয়ে কিতাব পড়তে দেখি নি। অথবা কিতাবের উপর কনুই এর ভর রেখে পড়তে দেখি নি; বরং কিতাব সামনে রেখে চূড়ান্ত ভদ্রতার সাথে এমনভাবে বসতেন, যেন কোনো বুযুর্গের সামনে বসে তাঁর থেকে কোনো বিষয়ে উপকৃত হচ্ছেন।

হযরত শাহ সাহেব রহ. এ কথাও বলেছেন, "আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো দ্বীনী কিতাব ওজু ছাড়া পারি নি। -হায়াতে আনওয়ার : ২৩৩

আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী রহ.-এর মেধা ও প্রজ্ঞার কয়েকটি ঘটনা

এক. ইমামুল আসর হযরত সাইয়িদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. ইলম ও প্রজ্ঞার বিচারে যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. তাঁর এক মজলিসে বলেছিলেন, এক খ্রিস্টান দার্শনিক লিখেছেন, "ইসলাম সত্য ধর্ম হওয়ার অন্যতম এক প্রমাণ হলো, ইমাম গাজালী রহ.-এর মত দূরদর্শী ব্যক্তি তা হক বলে বিশ্বাস করেন।" হযরত এ ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন, "আমাদের যুগে হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর অস্তিত্বই ইসলামের সত্যতার দলিল যে, এমন দূরদর্শী দার্শনিক আলেম ইসলামকে হক বলে মনে করেন এবং তার উপর ঈমান রাখেন।" -হায়াতে আনওয়ার : ১১৯

দুই. হযরত শাহ সাহেবকে আল্লাহ তা'আলা যে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও অভাবনীয় প্রত্যুৎপণ্যমতিত্ব দান করেছিলেন, তা নতুন করে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। আব্বাজান বলেন, এক সময় দারুল উলূম দেওবন্দে যুক্তি শাস্ত্রর প্রশিদ্ধ কিতাব "মোল্লা হাসান" পড়াবার দায়িত্ব আমার উপর ছিল। সেই সময় কোনো ইলমী প্রশ্ন দেখা দিলে হযরতের কাছে ছুটে গেলাম। তিনি উপর থেকে আমাকে আসতে দেখলেন। সালামের পর আমার আসার কারণ জানতে চাইলেন। আমি নিবেদন করলাম, হযরত "মোল্লা হাসান"-এর এক স্থানে প্রশ্ন জেগেছে। তার সমাধানের জন্যই আসা। আমার ধারণা ছিল, জবাবে হয়তো হযরত আমাকে উপরে ডাকলেন। কিন্তু হযরত ডাকার পরিবর্তে সেখানে বসেই বললেন, কোন স্থানে? ইবারত পড়ো। আমি ইবারত পড়লাম। প্রশ্নের কথা খুলে না বলতেই শাহ সাহেব বললেন, আচ্ছা এখানে হয়ত তোমরা মনে এ প্রশ্ন এসেছে। অতঃপর তিনি নিজেই প্রশ্ন খুলে বললেন এবং সেখানে বসেই জবাব জানিয়ে দিলেন। ততক্ষণে বিষয়টি আমার পুরোপুরি বুঝে এসেছে।

ঘটনাটি শুনানোর পর আব্বাজান বলেন, যদি কোনো তাফসীর বা হাদীস অথবা ফিকহের কিতাব হত, তাহলে এতটা আশ্চর্য হতাম না। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হলো, যুক্তি শাস্ত্রের এমন একটি কিতাবের ব্যাপারে আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, যা তিনি অনেক বৎসর আগে পড়েছেন বা পড়িয়েছেন। কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মনে হলো, হযরতের স্মরণ শক্তির মাঝে কিতাবটি পুরোপুরি সংরক্ষিত আছে।

তিন. আব্বাজান বলেন, একদিন সহীহ বুখারীর দরস চলাকালে কোনো এক প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মাহ সাহেব রহ. ফাতহুল কাদীরের দীর্ঘ একটি ইবারত এমন ভাবে মুখস্ত বললেন যে, মনে হলো কিতাব দেখে পড়ছেন। যখন ইবারত পড়া শেষ হলো, তখন সবাই তার দিকে অবাক বিস্ময়ের সাথে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ছাত্রদেরকে বিমুগ্ধ করে হযরত বললেন, জাহেলীন! মনে করছো যে, এই ইবারত রাতভর মুখস্থ করে এসেছি? ঘটনা হলো, আজ থেকে বেশ কয়েক বছর পূর্বে সম্ভবত "টুংক" -এর লাইব্রেরীতে "ফাতহুল কাদীর" সম্পূর্ণ মুতালাআ করেছিলাম। এই ইবারত সে সময় মুখস্থ করেছিলাম।

চার. আমি আব্বাজানের কাছ থেকে এবং শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নৌরী রহ.-এর কাছ থেকে শুনেছি যে, হযরত শাহ সাহেব রহ. ১৩২১ হিজরিতে আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. রচিত হেদায়া কিতাবের প্রশিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল ক্বাদীর" বিশ বা তার চেয়ে কয়েকদিন বেশি সময়ে মুতালাআ করেছিলেন এবং কিতাবুল হজ্জ পর্যন্ত তার সারসংক্ষেপও লিখেছিলেন। ইবনুল হুমাম রহ. হেদায়া গ্রন্থকারের উপর যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, তার উত্তরও লিখেছিলেন। এরপর সারাজীবন দ্বিতীয় বার ফাতহুল কাদীর পড়ার আর প্রয়োজন পড়েনি। তাৎক্ষনিক কোনো মুতালাআ ছাড়াই শুধু মাসআলা মাসায়েলই নয়' বরং দীর্ঘ দীর্ঘ ইবারতের হাওয়ালাও তিনি দরসে দিতেন। হযরত মাওলানা বিন্নৌরী রহ. বলেন, তিনি ১৩৪৭ হিজরিতে আমাদের কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন–

"২৬ বছর হয়ে গেল। কিন্তু পুনরায় তা পড়ার প্রয়োজন পড়ে নি। আমি ফাতহুল কাদীরের যে বিষয় বস্তু বর্ণনা করবো, যদি কিতাব খুলে দেখো, তাহলো ব্যবধান খুব কমই পাবে।"

পাচ. হযরত মাওলানা মানযূর নু'মানী সাহেব রহ. হযরত শাহ সাহেবের একজন ছাত্র। তিনি বলেন, দরস শেষে আমি যখনই হযরতের খেদমতে হাজির হতাম, পূর্ব লিখিত নানা প্রশ্নের সমাধান তার কাছে জেনে নিতাম। একবার আমি তিরমিযি শরীফের একটি ইবারতের হাওয়ালা দিলাম এবং আরজ করলাম যে, এই ইবারতে এই প্রশ্ন উত্থাপন হয়। অনেক চিন্তা-ভাবনার পরও এর কোনো সমাধান পাই নি। তিনি বললেন, মৌলবী সাহেব! আপনি ভুলে গেছেন। আমি ভুলি নি। যেই বছর আপনি দাওরা পড়তেন, তখন আমি বলেছিলাম, এই স্থানে তিরমিযীর অধিকাংশ নুসখায় ভুল আছে। কিন্তু লোকেরা সরসরি দৃষ্টিতে পড়ার কারণে বুঝতে পারে না। কিন্তু এই প্রশ্ন সবার মনেই আসা চাই। অতঃপর বলেন, বিশুদ্ধ ইবারত হলো, এই রকম। মাওলানা মানযূর নোমানী সাহেব লিখেন–

"আল্লাহ আকবার! এ কথাও তাঁর মনে আছে যে, অমুক বছর সবক পড়ানোর সময় তিনি এ কথা বলেছিলেন!"

ছয়. হযরত মাওলানা কারী তাইয়্যিব সাহেব রহ. বলেন, একটি প্রবন্ধ রচনার প্রেক্ষাপটে আবুল হাসান কাযযাবের জীবনী প্রয়োজন পড়লো। তার ইতিহাস আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অভ্যাস অনুযায়ী আমি শাহ সাহেবের

দরবারে হাজির হলাম, হযরত তখন মৃত্যুরোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভুগছিলেন- এর দুই তিন সপ্তাহ পরেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। শারীরিকভাবে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। প্রাথমিক কথাবার্তা শেষে আমি আমার আবেদন পেশ করলে তিনি বলেন, সাহিত্য ও ইতিহাসের কিতাবগুলোর অমুক অমুক স্থানগুলো মুতাআলা করে নেন। আনুমানিক তিনি ৮ থেকে ১০টি কিতাবের নাম বলেন। আমি বললাম, হযরত! এত কিতাবের নামও তো আমার মনে থাকবে না। নানা দায়িত্বের ভীড়ে এতটুকু সযোগও বা কোথায় যে, সামান্য আংশিক একটি বিষয়ের জন্য এত দীর্ঘ মুতাআলা করবো? আপনিই ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার দু একটি উদাহরণ পেশ করুন। ঐ উদাহরণগুলোকেই আমি আপনার হওয়ালায় কিতাবের অংশ বানিয়ে দিবো।

এরপর হযরত মুচকি হেসে আবুল হাসান কাযযাবের জন্মসন থেকে শুরু করে মৃত্যুপর্যন্ত বাৎসরিক সন উল্লেখ পূর্বক ঘটনা শুরু করেন। তার মিথ্যা বাদী হওয়ার বিস্ময়কর ও বিরল ঘটনাবলি বর্ণনা শুরু করেন। অবশেষে মৃত্যুসন উল্লেখ করে বলেন, এই ব্যক্তি মরতে মরতে মিথ্যা বলেছিল। তিনি তার মৃত্যুকালে মিথ্যা বলার ঘটনাও বর্ণনা করেন।

বিস্ময়ের বিষয় হলো, হযরত এমন ভাবে বর্ণনা করেছিলেন, যেন আজ রাতেই তিনি তার স্বতন্ত্র ইতিহাস মুতালাআ করেছেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, হযরত! হয়তো কিছুদিনের মাঝে তার জীবনী মুতালাআ করার সুযোগ এসেছিল।

স্বাভাবিকভাবে বললেন, জি না! আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। আমি মিশরে গিয়েছিলাম। "খাদিয়্" লাইব্রেরীতে মুতালাআর জন্য গেলাম। ঘটনাচক্রে আবুল হাসান কাযযাবের ঘটনা সামনে এলো। দীর্ঘক্ষণ মুতালাআ করলাম। তখনই তার সম্পর্কে যা কিছু পড়েছিলাম, তাই মুখস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আপনার প্রশ্নের ফলে কিছু মনে করে তা বললাম। -হায়াতে আনওয়ার : ২২৫-২২৮

সাত. হযরত মাওলানা কারী তাইয়িব রহ. বলেন, খেলাফত আন্দোলনের মাঝে যখন জনসাধারণের জন্য বিচারক নির্ধারণের বিষয় সামনে এলো, তখন মৌলবী সুহবানুল্লাহ খান সাহেব খোরখোপরী রহ.-এর কিছু দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে পূর্বর্তীদের কিছু ইবারত পেশ করেন, যার মাধ্যমে তার

দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন তো হয়, তবে তা ছিল জুমহুর উলামার পরিপন্থি। এ সকল ইবারত নিয়ে তিনি নিজেই দারুল উলূম দেওবন্দ চলে আসেন এবং ওলামা সমাবেশে তা পেশ করেন। আকাবেরে দারুল উলূমের সবাই হযরত সাহেব রহ.-এর কামরায় একত্র হন। সমস্যা ছিল, এ ইবারতের ভাষ্যকে প্রত্যাখ্যান করা যাচ্ছিল না, কারণ, তা পূবরর্তী এক মহান ব্যক্তিত্বের ইবারত। আবার তা গ্রহণও করা যাচ্ছিল না। কারণ তা জুমহুরের মাযহারে পরিপন্থী। ইবারতটি এতটা স্পষ্ট ছিলো যে, কোনোরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেও তা জুমহুরের মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হচ্ছিল না।

হযরত শাহ সাহেব ইস্তেঞ্জার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। ওজু করে এলে আকাবিরে দেওবন্দ উক্ত সমস্যা উপস্থাপন করেন। শাহ সাহেব রহ. অভ্যাস অনুযায়ী حسبنا الله [আল্লাহ ভরসা] বলে বসলন এবং একটু মনোযোগ দিয়ে ইবারতটি লক্ষ্য করে বললেন, এই ইবারতটিতে একটু হেরফের করা হয়েছে। দুই বাক্যকে এক বাক্যে পরিণত করা হয়েছে। মাঝের এক লাইনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তৎক্ষণাৎ কুতুবখানা থেকে কিতাব আনা হলো। দেখা গেলো, বাস্তবেই মাঝের এক লাইন বিলুপ্ত করা হয়েছে। মাঝের লাইনটি সংযোজন করার সাথে সাথেই বিষয়টি জমহুরের মাযহাবের অনুকূলে চলে আসে এবং সবার পেরেশানি দূর হয় যায়ে।

আট. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ারী সাহেব রহ. বর্ণনা করেন, একবার হযরত শাহ সাহেব রহ. কাশ্মীর যাচ্ছিলেন। বাসের অপেক্ষায় শিয়ালকোর্ট স্টেশনে বসে ছিলেন। একজন পাদ্রি এসে বলতে শুরু করল, আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি মুসলমানদের একজন বড় আলেম। হযরত বললেন, না আমি একজন তালেবে ইলম। [ছাত্র]। পাদ্রি বলল, আপনি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানেন? হযরত বললেন, অল্প কিছু।

অতঃপর হযরত শাহ সাহেব রহ. হযরত ঈসা আ.-কে শুলে চড়ানোর বিষয়ে বললেন, তোমরা ভুল বুঝেছো। ঐ আকৃতি তাঁর ছিল না। অতঃপর নবী করীম সা. -এর নবুওয়াতের সপক্ষে চল্লিশটি দলিল উপস্থাপন করেন। ১০টি দলিল কুরআন থেকে, ১০টি তাওরাত থেকে, ১০টি ইঞ্জিল থেকে

আর ১০টি যৌক্তিক দলিল। এ পাদ্রি শাহ সাহেব রহ.-এর কথা শুনে বললেন, যদি নিজের কল্যাণের চিন্তা না থাকতো, তবে আমি মুসলমান হয়ে যেতাম। উপরন্তু আমার নিজের ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু আপনার কাছে জানতে পারলাম।

এ কিতাবও এক প্রকার ব্যাধি

শ্রদ্ধেয় আব্বাজন রহ. বলেন, একবার হযরত শাহ সাহেব খুবই অসুস্থ ছিলেন। দীর্ঘদিন রোগাক্রান্ত থাকেন। একদিন সকালে গুজব উঠলো, হযরত ইন্তেকাল করেছেন। যেন সবার উপর যেনো বজ্রপাত হলো। ফজরের নামায পড়েই আমরা সবাই হযরতের বাসায় চলে এলাম। হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. ও সাথে ছিলেন। বাসায় পৌঁছে জানতে পারলাম, আলহামদুলিল্লাহ! সংবাদটি ভুল ছিল। অবশ্য হযরতের আগের মতই কষ্ট হচ্ছে। আমরা সবাই হযরতের শুশ্রুষা করার জন্য হযরতের কামরায় গিয়ে দেখলাম, হযরত নামাযের চকিতে বসে আছেন । সামনে বালিসের উপর কিতাব রাখা। অন্ধকারের কারণে হযরত ঝুঁকে মুতালাআ করছেন। দৃশ্যটি দেখে বিস্ময়ের সাথে সাথে আমাদের দুশ্চিন্তাও হলো, এমন অসুস্থ অবস্থায়ও এত কষ্ট সহ্য করে মুতাআলা করলে তো রোগ আরো বেড়ে যাবে। সেহেতু হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ সাহেব সাহস করে সুমিষ্ট ভাবে নিবেদন করলেন, "হযরত! বুঝে আসছে না, প্রথমতঃ এমন কোন বিষয় আছে, যা হযরত এখনো মুতালাআ করেন নি। আর যদি এমন কোনো বিষয় থেকেও থাকে, তাহলে এমন কি প্রয়োজন পড়ল যে, ক'দিন অপেক্ষা করা যাবে না। তারপরও যদি ধরে নেই, হঠাৎ কোনো মাসআলার প্রয়োজন পড়েছে, তাহলে আমরা খাদেমরা তো আর মরে যাইনি যে, আপনি কাউকে বলে দিলে সে মাসআলা দেখে এসে বলে দিত। কিন্তু এ অন্ধকারে এ সময় আপনি যেভাবে কষ্ট স্বীকার করছেন, তা আমাদের মতো খাদেমদের জন্য খুবই কষ্টকর।"

আব্বাজান বলেন, এর জবাবে হযরত শাহ সাহেব রহ. অনেক্ষণ অসহায়ের দৃষ্টিতে অকপট ভঙ্গিতে মাওলানা উসমানী সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর বললেন, ভাই! ঠিকই বলেছো? কিন্তু এই কিতাবও তো এক ব্যাধি। এ ব্যাধির জন্য কী করবো।

আমি এখন কী করবো?

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বলেন, হযরত শাহ সাহেব রাত দিন মুতালাআ ও ইলম চর্চার মাঝে এতটাই ডুবে থাকতেন যে, দুনিয়ার কোনো কিছুই তাঁকে ছুঁতে পারত না। পার্থিব হট্টগোল নাক গলানো ছিল হযরত শাহ সাহেবের মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। দারুল উলূম দেওবন্দের পরিচালনা পর্ষদ ও শাগরেদরা তা জানতেন। এ জন্য হযরতের ঘরোয়া কাজকর্ম তারাই সম্পন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. বলেন, একদিন হযরত মসজিদে বসেছিলেন। এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিল, হযরত! আপনার কামরার ছাদ ভেঙ্গে পড়ে গেছে। তার সংবাদ প্রদানের ভঙ্গি এমনই ছিল যে, শুনেই হযরতের ব্যতিব্যস্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু হযরত বেশ সরলভাবে বললেন, "ভাই! আমি এখন কী করবো? মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব (তৎকালীন মুহতামিম) কে গিয়ে বলো।" তখন হযরত হাবীবুর রহ. -কে সংবাদ দেওয়া হলো যে, তিনি কামরা মেরামতের যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দিলেন।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান প্রায়শই বলতেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত শাহ সাহেবকে সব শাস্ত্রেই গভীর পাণ্ডিত্য দান করেছিলেন। হযরত শাহ সাহেব বলতেন, আমি ইচ্ছা করলে মাওলার অনুগ্রহে হারীরীর মত আরবি সাহিত্যের সাথে সহজেই প্রতিযোগিতা করতে পারবো। জমখশারী ও জুরজানীর চেয়েও ভালো গদ্য লিখতে পারবো। কিন্তু দু'টি কিতাব, যার মত লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়– ১. হেদায়া, ২. গুলিস্তা

হযরত শাহ সাহেবের দৃষ্টিতে তাফসীরে কাবীর

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বলতেন, হযরত শাহ সাহেব রহ. ইমাম রাজি রহ. রচিত "তাফসীরে কাবীর" সম্পর্কে বলতেন, "এটি কুরআনে কারীমের নজম তথা পদ্য সাহিত্যেমান বিশ্লেষণের উপর একটি উন্নত মানসম্পন্ন তাফসীর গ্রন্থ। সন্দেহ নেই, ইমাম রাজি রহ. যুক্তি বিদ্যাচ্ছন্ন ছিলেন। এ

কারণেই অনেকের মুখে এ মন্তব্য চলে এসেছে যে, কিতাবটির মাঝে তাফসীর ছাড়া আর সবই আছে। কিন্তু বাস্তব হলো, যদি ইনসাফের সাথে এটি অধ্যায়ন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, তিনি নজমে কুরআনের উপর অসাধারণ দূরদর্শিতার সাথে কাজ করেছেন। তিনি এর বিশ্লেষণে প্রচুর মেহনত করেছেন। হ্যাঁ, কিছু কথা নিয়ে মতনৈক্য রয়েছে, সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাফসীরের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি অসাধারণ তাফসীর গ্রন্থ। এ ছাড়াও তার তাফসীরের মাছে এমন কিছু হাদীস আছে, যা হাদীসের প্রচলিত কিতাবদির মাঝে নেই। এর থেকে বুঝে আসে, হাদীসশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তার গভীর পাণ্ডিত্ব ছিল।"

চার মাযহাবের সত্যতা

শ্রদ্ধেয় আব্বাজন রহ. বলেন, হযরত শাহ সাহেব রহ. বলেছেন, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী; এই চার মাযহাবের প্রত্যেকটি সত্য।" অর্থ হলো, তাদের প্রত্যেকের ইজতেহাদ স্বস্থানে সঠিক ও যথার্থই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। তাদের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুকাল্লিদের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য। কিন্তু মৌলিক বস্তবতার বিচারে এগুলোর মধ্যে সত্য একটাই। সে একটিকে চিহ্নিত করার কোনো উপায় নেই। পৃথিবীতে না পারার কারণ হলো, নবুওয়াতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাওয়া। অবশ্য পরকালে সে বাস্তবতা উন্মুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয় আল্লাহ তা'আলা তা করবেন না। কারণ, হলো আল্লাহ তা'আলার রহমত। সে সকল ফুকাহায়ে কেরাম সততা ও সিঃস্বার্থের সাথে ইজতেহাদ করে দীনের অনেক খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাদের কারো ভূল প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলা হাশরের ময়দানে তাদেরকে কীভাবে লাঞ্ছিত করবেন? সেহেতু বাস্তব হলো, সে সত্য কে চিহ্নিত করা আখেরাতেও সম্ভব নয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শরিয়ত ও সুন্নাতের উপর অবিচল থাকা

হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর গভীর ইলম, অন্যান্য প্রজ্ঞা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির গুণাবলি এতবেশি প্রশিদ্ধি পেয়েছিল যে, এর

কারণে হযরতের অন্যান্য গুণাবলি ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। অন্যথায় খোদাভীরুতা, আল্লাহ নির্ভরতা, আত্মশুদ্ধি ও সাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমহীমায় ভাস্কর।

হযরত শাহ সাহেব রহ. নিজেই একবার হযরত আল্লামা মনযূর নু'মানী সাহেব রহ.-এর কাছে বর্ণনা করেছেন, একবার আমি কাশ্মীর যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো। যিনি পাঞ্জাবের এক প্রশিদ্ধ পীর সাহেবের মুরিদ ছিলেন। সে লোকটি আমার কাছে খুবই কাতরতার সাথে অবদার করলো, আমিও যেন সেই পীর সাহেবের কাছে হাজির হই। ঘটনাচক্রে আমার যাত্রাপথেই সেই পীর সাহেবের বাড়ির অবস্থান। এ জন্য আমি সেখানে হাজির হওয়ার নিয়ত করলাম। আমরা যখন সেই পীর সাহেবের কাছে পৌঁছি, লোকটি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে পীর সাহেবের কাছে পৌছে লোকটি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে পীর সাহেবের সামনে বসলো। কিছুক্ষণ কথা হলো। অতঃপর পীর সাহেব মুরিদদের উপর তার অন্তরদৃষ্টি ফেরাতে শুরু করলেন। যার ফলে তারা চেতনা হারিয়ে লাফ ঝাপ মারতে শুরু করল। আমি এসব দৃশ্য দেখছিলাম। তখন আমি বললাম, আমার মন চাইছে যদি হযরত আমার উপরেও অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার ভেতরেও এই অবস্থা সৃষ্টি করতেন। তখন পীর সাহেব আমার উপর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ফেলতে শুরু করলেন আর আমিও আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামের ধ্যান করে বসে গেলাম। বেচারা বহুত চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমার ভেতর তার কোনো প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হলো না। কিছুক্ষণ পর সে নিজেই বলল, আপনার উপর এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না।

হযরত মাওলানা মনযূর নো'মানী রহ. বলেন, এই ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত শাহ সাহেব বেশ অস্বাভাবিক উত্তেজনার সঙ্গে বললেন–

"এসব কিছুই না। এগুলো হচ্ছে মানুষের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা এক ম্যাজিক মাত্র। এ সব মন্ত্রের সাথে আল্লাহকে পাওয়া কোনো সম্পর্কই নেই। কারো যদি যোগ্যতা ও সংকল্প থাকে, তাহলে আল্লাহ চাহেন তো তিন দিনের ভেতরত তার হৃদয়ের ভেতর এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে যে, সেখান থেকে "আল্লাহ আল্লাহ" শব্দ শোনা যাবে। কিন্তু এগুলো কিছুই না। আসল হলো, মাকামে এহসানের চেতনা সৃষ্টি করা এবং শরিয়ত ও সুন্নাতের উপর অবিচল থাকা।

হযরত শাহ সাহেব রহ.-এর কারামত

ভাওয়ালপূর মোকাদ্দামা; এটা প্রথম মোকাদ্দামা, যেখানে কাদিয়ানীদেরকে প্রথমবারের মতো বিচার বিভাগীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছিল। মোকাদ্দামার রায় নিজেদের পক্ষ নিয়ে আসার জন্য কাদিয়ানীরা তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করেছিল। এদিকে হযরত শাহ সাহবে যখন সংবাদ পেলেন, মোকাদ্দামার মাঝে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনা হবে, তখন তিনি সেখানে স্বশরীরে উপস্থিত হওয়ার সংকল্প করলেন। এ কাজে তিনি বেশ ক'জনকে সাথে নেওয়ার জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তাদের মাঝে শ্রদ্ধেয় আব্বাজানও ছিলেন। ঘটনাক্রমে সে সময় শ্রদ্ধেয় আব্বাজানও ছিলেন। ঘটনাচক্রে সে সময় শ্রদ্ধেয় দাদাজান (হযরত মাও. ইয়াসিন সাহেব) -এর অসুস্থতার কারণে আব্বাজন মানসিকভাবে ভীষণ চিন্তিত ও হতবিহ্বল ছিলেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব ভাওয়ালপুর যাওয়ার জন্য নির্দেশ করা মাত্রই তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ভাওয়ালপুর অবস্থানকালে হঠাৎ আব্বাজানের নামে একটি তার বার্তা আসে, "আপনার আব্বাজানের অবস্থা খুবই নাজুক, আপনি দ্রুত চলে আসুন।

আব্বাজান উক্ত বার্তা হযরত শাহ সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। অব্বাজান বলেন, আমি সে সময় খুবই দোটানায় ছিলাম। একদিকে শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের স্বাস্থ্যহানির দুশ্চিন্তা, সাথে সাথে এই তারবার্তার ভাষ্য হলো, "এক মুহূর্ত দেরি না করে চলে আসা হোক।" আর অপরদিকে এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে আল্লাহ তা'আলা আমাকে হযরত শাহ সাহেবের সাথে থাকার সৌভাগ্য দিয়েছেন, যা ছাড়তে মন চাচ্ছিল না। আমার ধারণা ছিল, হযরত তার বার্তা দেখে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিবেন। কেননা আমাদের আকাবিরগণ সাধারণত এ সমস্ত বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু সেদিন হযরত শাহ সাহেবের কারামত প্রকাশ পেয়েছিল। হযরত তার বার্তার বিষয়াদী শুনে বেশ দৃঢ়তার সাথে বললেন, "আমরা আপনার আব্বাজানের জন্য দু'আ করবো। আল্লাহ চাহেন তো তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।"

আব্বাজান রহ. বলেন, শাহ সাহেবের একথা শুনে আমার অন্তর প্রশান্ত হয়ে গেল। সমস্ত চিন্তা ও পেরেশানি দূর হয়ে গেল। অতঃপর হযরত

নিজেই একটি ফিরতি তারবার্তা আব্বাজানের নামে পাঠিয়ে দিলেন, "আমরা সবাই আপনার সুস্থতার দু'আ করছি। মৌলবী মুহা. শফী সাহেবের এখানে খুবই প্রয়োজন। তাই আমি তাঁকে আসতে বারণ করেছি।" অবশেষে দেখা গেল, আল্লাহ তা'আলার এহসান ও অনুগ্রহে আব্বাজানের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

সবচেয়ে বড় পুঁজি

এই ভাওয়ালপুরের মোকাদ্দামায় হযরত শাহ সাহেব যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেখানে তিনি ইলম ও মা'রেফতের সাগর বইয়ে দিয়েছিলেন। বক্তৃতার সময় উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর সকলই সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। জজ সাহেবের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, অবাক হয়ে হযরত শাহ সাহেবের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার গত্যান্তর ছিলো না। আদালতের পক্ষ থেকে রেকর্ডকারীরা কিছুক্ষণ হযরতের কথার সাথে সাথে লিখতে পেরেছেন। কিন্তু খানিক বাদে হযরত যখন স্বরূপে আবির্ভূত হন, তখন তারা লিখনী বন্ধ করে হযরতের চেহারা দেখতে শুরু করে দিলেন। বক্তৃতা শেষে জজ সাহেব বললেন, বক্তব্য যেহেতু রেকর্ড করা যায় নি, তাই আগামীকাল এই বক্তব্য লিখিত আকারে পেশ করা হোক।

আদালত থেকে ফিরে এসে ঘরে বসে হযরত শাহ সাহেব, হযরত মাওলানা মুর্তাজা হাসান সাহেব সহ অন্যান্যরা আলোচনা করতে লাগলেন, হযরতের পক্ষ থেকে এ বক্তব্য কে লিখবে? পরামর্শ শেষে আমাকে লিখতে হবে; এ সিদ্ধান্ত হয়। হযরত শাহ সাহেব নিজেই আমাকে লিখতে বললেন। তখন শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বলেন, হযরত! আপনার পক্ষ থেকে আপনার মতো করে বক্তব্য লেখা আমার সাধ্যের বাইরে। অবশ্য প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দেশ পালন করতে আমি প্রস্তুত। হযরত বললেন, "আমরা দু'আ করবো, আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করে দিন।

আব্বাজান বলেন, দিনের বেলায় তো লেখার সুযোগই ছিল না। রাতে কামরায় লিখতে বসলাম। সারা রাত জেগে বয়ান লিখলাম। যখন শেষ লাইন লিখছি তখন বাইরে ফজরের আজান হচ্ছিল। ঠিক সে সময় হযরত শাহ সাহেবের কামরা উন্মুক্ত ছিল। হযরত ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,

কাজ কতদূর হলো? জবাবে আমি নিবেদন করলাম, আলহামদুলিল্লাহ! এই মাত্র শেষ করলাম। যখন হযরত বয়ান দেখলেন ও জানলেন, এর জন্য সারারাত জাগতে হয়েছে, তখন তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এত দু'আ করলেন যে, আজও তার স্বাদ অনুভূত হয়। আর সে দু'আই অধমের সবচেয়ে বড় পুঁজি।

বাহ্যিক এই সাদৃশ্যের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করি

এ ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে অধমের কোনো ঘটনা জুড়িয়ে বলা নেহায়েত বেমানান হবে। তারপরও بلبل ہمیں قافیہ گل شود بس است কে সামনে রেখে বলছি– "১৯৭৩ খিস্টাব্দে হযরত শাহ সাহেবের প্রিয় ছাত্র হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী রহ.-এর নেতৃত্বে খতমে নবুওয়াত আন্দোলন চলছিল। যখন জাতীয় সংসদে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং মির্যা নাসির প্রমুখ নিজেদের বক্তব্য পেশ করে, তখন এ ধরনের একটি বক্তব্য পেশ করার জন্য হযরত বিন্নৌরী রহ. আমাকে রাওয়ালপিন্ডি আসতে বলেন। সে সময় শ্রদ্ধেয় আব্বাজান অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। এ সময় আমাকে তিনি কোথাও যেতে দিতে চাইতেন না। কিন্তু কাজের জন্য তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি প্রদান করেন।

আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রওয়ালপিন্ডি পৌছে হযরত বিন্নৌরী রহ.-এর নির্দেশনায় কাজ শুরু কে রদিলাম। বক্তব্যের একাংশ আমাকে, অপরাংশ হযরত মাওলানা সামিউল হক সাহেবকে সংকলনের দায়িত্ব দেয়া হয়। সেহেতু স্বল্প সময়ের ভেতর গোটা বক্তব্য সংকলন করার তাগাদা ছিল; সেহেতু এ কাজের পিছনে এক সপ্তাহ রাত দিন একাকার করে খাটতে হয়। ঘটনাচক্রে কোনো রাতই ঘুমাতে পারি নি। হযরত বিন্নৌরী রহ. তা জেনে অধমের জন্য অনেক দু'আ করেন এবং পরদিনই আব্বাজানকে ফোন করে বলেন, "হযরত! ভাওয়ালপুর মোকাদ্দামার স্মৃতি তাজা হচ্ছে। হযরত শাহ সাহেব আপনাকে ডেকেছিলেন আর আমি তকী মিয়াকে ডেকেছি। আপনি বক্তৃতা সংকলনে একরাত জেগেছেন, আর এদিকে সেও রাতভর এক মুহূর্তও ঘুমায় নি।

বাহ্যিক এই সাদৃশ্যের জন্য মহান আল্লাহর যত শুকরিয়া আদায় করি, তা কম হবে। আল্লাহ তা'আলা সে বুযুর্গদের বরকতে এই সাদৃশ্যকে বাস্তবিক সাদৃশ্য করে দিন এবং কবূল করে নিন। আমীন, ছুম্মা আমীন!–

আমরা অবশ্যই তাঁর পা টেনে ধরব

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান প্রায় সময় এ ঘটনা শুনাতেন, (সম্ভবত কাদিয়ানী ফেৎনা নির্মূল অভিযানে) হযরত শাহ সাহেব লাহোরে এলেন। হযরতের সাথে আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ. সহ আমিও ছিলাম। হযরত শাহ সাহেব ও হযরত উসমানী রহ. শুভাগমনের উপর সংবাদ পরিবেশন করে সে সময়ের পাঞ্জাবের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিষ্ট মোহর এবং মরহুম সালেক সেদিন কার পত্রিকার শিরোনাম দেন– "লাহোরে ইলম ও মা'রিফাতের বৃষ্টি।"

পরে তারা সাক্ষাতকার নিতে হাজির হন। আলোচনা চলতে চলতে এক সময় সুদ নিয়ে কথা উঠলো। মরহুম সালেক হযরত আল্লামা উসমানী রহ.-এর কাছে প্রশ্ন রাখলেন, প্রচলিত ব্যাংকিং ইন্টারেস্টকে সুদ বলে অবিহিত করার কারণ কী? হযরত উসামনী রহ. তার জবাব দেন। কিন্তু তিনি আবার প্রশ্ন করেন। এভাবে অনেক্ষণ প্রশ্নোত্তর চললো। আল্লাাম উসমানী রহ. সব প্রশ্নের জবাব সবিস্তার প্রদান করেন। কিন্তু তারা পুনরায় ফাঁক বের করে প্রশ্ন করেন। তারা তাদের বক্তব্যে সে সব লোকদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, যাদের অভিমত হলো, 'যদি ব্যাংকিং ইন্টারেস্টকে ওলামায়ে কেরাম জায়েজ বলেন, তাহলে সম্ভবত মুসলমানদেরই বেশি উপকার হবে।'

সে মজলিসে হযরত শাহ সাহেব ছিলেন। তিনি সাধারণত প্রয়োজন না পড়লে কথা বলতে যেতেন না। আত্মগরিমা প্রকাশের বিন্দু আভিলাষও তাঁর ছিল না। সে কারণে তিনি হযরত উসমানী রহ. -এর আলাপচারিতা যথেষ্ট মনে করে চুপ ছিলেন। কিন্তু আলোচনা প্রলম্বিত হতে দেখে হযরত নিঃসংকচে বলে ফেললেন, দেখো ভাই মালেক! আমার কথা খারাপ মনে করো না। কথা হলো আল্লাহর বানানো জাহান্নাম অনেক বড়। যদি কেউ কেউ সেখানে যেতে চায় তাহেল সে অসংখ্য পথ পাবে। আমরা তাকে রুখবার কে? হ্যাঁ, যদি কেউ আমাদের পা রেখে জাহান্নামে যেতে চায়, তাহলে আমরা অবশ্যই তার পা টেনে ধরব।

মেহনত আমাদের, সওয়াব এই ব্যক্তির

কাদিয়ানীদের সম্পর্কে হযরত শাহ সাহেবের নির্দেশে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আরবি ও উর্দূতে বেশ কটি বই লিখেছেন। হযরত মাওলানা আশরাফ খান সাহেব ও মাওলানা ইউসুফ খান সাহেব লুধিয়ানবী রহ. -এর প্রবন্ধে যার তালিকা পাওয়া যাবে। তন্মধ্যে হতে একটি আরবি কিতাব– التصريح بما تواتر في نزول المسيح অন্যতম। কিতাবটি রচনার ইতিহাস হলো, সে সব মুতাওয়াতির হাদীসের মাঝে হযরত ঈসা মাসীহ আ.-এর আসমান হতে আবতরণের আকীদা প্রমাণিত হয়, সে সকল হাদীসসমূহ হযরত শাহ সাহেব একত্র করতে চাচ্ছিলেন। ঐ লক্ষ্যে তিনি প্রাথমিক তথ্য ও সংগ্রহ করে নিজ ডায়েরীতে সংকলন করছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে সে সংগ্রহকে কিতাবিরূপ দেওয়ার মতো অবসর পাচ্ছিলেন না। অবশেষে সে ডায়েরী শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের হাতে সোপর্দ করে তার উপর ভিত্তি করে আরবিতে একটি গ্রন্থ লিখতে বললেন। আব্বাজান অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নির্দেশ পালন করেন। রাত-দিন খেটে কিছু দিনের ভেতর তা লিখে ফেললেন।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বলতেন, কিতাবটি লেখার সময় যখন আমি লাইব্রেরী থেকে কিতাবের স্তুপ উঠিয়ে উঠিয়ে আমার রুমে নিয়ে আসতাম এবং শাহ সাহেবের রুমের সামনে দিয়ে যেতাম, তখন হযরত খুবই খুশি হতেন। অবশেষে যখন কিতাব রচনার কাজ সমাপ্ত হয়, তখন তার পাণ্ডলিপি হযরতের খেদমতে পেশ করলাম। সে সময় তিনি আমার জন্য অনেক দু'আ করেন এবং উপস্থিত সুধীদেরকে বলেন, "দেখো ভাই! মেহনত করেছি আমি আর সওয়াব নিচ্ছেন উনি।"

হযরত শাহ সাহেব ও আব্বাজান

প্রথিতযশা হাদীস বিশারদ আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী রহ. বলতেন, হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী সাহেব হযরত শাহ সাহেবের সে সকল শাগরেদদের একজন যাদের উপর তিনি সব সময় সন্তুষ্ট থেকে ছিলেন। কোনো দিন মনোমালিন্যের সন্দেহ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নি। অথচ দারুল উলূম

দেওবন্দে এমন অনেক ফেৎনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিলো, যার কারণে দেওবন্দের উস্তাদবৃন্দ দু'দিনে বিভক্ত হয়ে যান। যার পরিণতিতে হযরত শাহ সাহেব পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ সময়েও হযরত মুফতি সাহেব হযরত শাহ সাহেবের পক্ষাবলম্বন না করে হযরত থানভী, হযরত মিয়াঁ সাহেব ও হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান রহ.-এর সাথে ছিলেন। কিন্তু এ মতনৈক্য হওয়া সত্ত্বেও হযরত মুফতি সাহেব হযরত শাহ সাহেবের দারবারে নিয়মিত স্বসম্ভ্রমে আসা যাওয়া করতেন। হযরত শাহ সাহেব রহ.ও অত্যন্ত মহব্বত ও মায়ার দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতেন।

তিনি বলেন, আমার বেশ মনে আছে, এ সময় একদিন হযরত মুফতি সাহেব হযরত শাহ সাহেবের দরবারে কিছু হাদিয়া নিয়ে উপস্থিত হলে হযরত তা বড় ঔদার্যের সাথে গ্রহণ করে নেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. ছিলেন একজন আনসারী সাহাবী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন আরবের অন্যতম জনপ্রিয় কবি। গোটা আরবে তার কবিতা ছিল ব্যাপক সমাদৃত। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রীতিমত কবিতা চর্চা ছেড়ে দেন। এক জিহাদের ঘটনা– 'নবী করীম সা.-এর সঙ্গে তিনিও সফর করেন। হঠাৎ নবীজী নিজ থেকেই তাঁকে বললেন, হে ইবনে রাওয়াহা! তুমি তোমার কবিতা দিয়ে যাত্রীদলকে উষ্ণ করে তোলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো ওসব ছেড়ে দিয়েছি। হযরত ওমর রা. তাঁকে শুধরে দিলেন। বললেন, নবী করীম সা. -এর কথা শুনে তা মানা উচিত। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. বিদ্যমান পরিস্থিতির সঙ্গে যুৎসই একটি কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন–

يا رب لولا انت ماهتدينا ÷ ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينةً علينا ÷ وثبت الاقدام إن لا قينا

ان الكفار قد بغوا علينا ÷ وإن ارادوا فتنةً أبينا

"হে আমাদের প্রভু! আপনার তৌফিক না পেলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, আমরা ছদকা করতেও পারতাম না, নামায পড়তেও পারতাম না।

আপনিই আমাদের উপর চির প্রশান্তি অবতরণ করুন। আমাদের পদযুগল সত্যের উপর অবিচল রাখুন। নিশ্চয়ই কাফেররা আমাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারা যদি বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায়, আমরা তা কখনো হতে দেবো না।"

নবী করীম সা. ওমরাতুল কাজা আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন এবং তাওয়াফের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. নবীজী সা.-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি নবীজী সা. -এর জন্য পথ করে দিচ্ছিলেন।

নবী করীম সা. তাঁকে বেশ কিছু যুদ্ধাভিযানের সেনাপতি বানিয়েছেন। সর্বশেষ মুতার যুদ্ধে তিনি ছিলেন অন্যতম সেনানায়ক। সেই যুদ্ধে তাঁর রক্তস্নাত শহীদী স্পৃহা ও প্রাণোৎসর্গী ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

হযরত যায়দ ইবনে হারেছা রা.

হযরত যায়দ ইবনে হারাছা রা.-এর এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিলো, যা তাঁকে অন্যান্য সাহাবী থেকে বিশিষ্ট করেছে। সমস্ত সাহাবীর মধ্যে এই স্বতন্ত্র গুণ একমাত্র তাঁরই রয়েছে যে, তাঁর নাম পবিত্র কুরআনে এসেছে। সূরা আহযাবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

فَلَمَّا قَضَى زيد منها وطرًا

অন্য কোনো সাহাবী এমন মর্যাদায় ভূষিত হন নি।

হযরত যায়দ রা. -এর দ্বিতীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, নবী করীম সা. তাঁকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেই ঘটনাটিও খুব বিস্ময়কর।

হযরত যায়দ ইবনে হারেছা রা. -এর জনক [হারেছা] বনু কবি কা'ব বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁর মা 'সুদা' ছিলেন বনু মা'ন বংশের মেয়ে। হযরত যায়দ রা.-এর শৈশবে একবার তাঁর মা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাবার বাড়ি যান। তখন ছিলো জাহেলিয়াতের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। বিভিন্ন বংশের

মাঝে মারামারি কাটাকাটি লেগেই থাকতো। হযরত যায়দ রা.-এর নানার বাড়ির উপর হঠাৎ তাদের এক দুশমন বংশ আক্রমণ করে এবং সেই যুগের নীতি মোতাবেক তারা হযরত যায়দ রা.-কে বন্দি করে নিয়ে যায়। যুদ্ধবন্দি হিসেবে তারা তাঁকে দাস বানিয়ে ফেলে। অসহায় এই শিশু পিতার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে দাসত্বের জীবন কাটাতে থাকে।

এর বেশ কিছু দিন পর একবার 'উকায' মেলায় হযরত যায়দ রা.-এর মুনিব তাঁকে বিক্রয় করতে নিয়ে আসে। ঘটনাচক্রে সেখানে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা রা.-এর ভাতিজা হযরত হাকিম ইবনে হিযাম রা. উপস্থিত হন। সম্পর্কে তিনি ছিলেন, নবীজী সা.-এর দুধ ভাই। তিনি হযরত যায়দ রা.-কে আপন ফুফু হযরত খাদীজা রা.-এর জন্য চারশ দেরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে আসেন।

পরবর্তী কালে হযরত খাদীজা রা. যখন নবীজী সা.-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন তিনি নবীজীর সার্বক্ষণিক খেদমতের জন্য হযরত যায়দ ইবনে হারেছাকে গোলাম হিসেবে উপহার দেন। এখানে তিনি রীতিমত নবীজীর গোলাম হয়ে যান।

ওদিকে হযরত যায়দ রা.-এর পিতা হারেসা সন্তানের সন্ধানে সব জায়গায় পাগলের মত ঘুরছিলেন। কোথাও তাঁর কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না। সন্তানের স্মৃতিকাতরতার এই কষ্টময় দিনগুলোতে এ কবিতাও লিখেছিলেন–

بكيتُ على زيدٍ ولم ادر ما فعل ÷ أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل

"এই পোড়া চোখ কেঁদেই চলেছে প্রিয় যায়েদের তরে
জানিনে আমি, ওই অভাগাটা কোথায় যে কী করে?
জীবিত আছে কি? তার তরে তবে পথ চেয়ে রবো আমি
নাকি কোনো বিজন মরুতে মরণ গিয়েছে চুমি।"

এর কিছুদিন পর হজের মৌসুমে বনু বংশের কিছু লোক হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকারকামায় আসে। হঠাৎ তারা সেখানে হযরত যায়দকে দেখতে পেয়ে চিনে ফেলেন। হযরত যায়দ রা. তাদেরকে চিনতে পারেন। তিনি তাদেরকে বলেন, আমার ঘরের লোকদের কাছে আমার এ কবিতা পৌছে দেবেন।

أحن إلى قومي وان كنت نائيًا ÷ بأني قطين البيت عند المشاعر

এখনো আমি স্মরণ করি আমার জাতির কথা
যদিও আমার প্রবাসজীবন, দূরের আকুলতা॥
এখন আমার ঠাই হয়েছে অনেক দিনের পরে
পবিত্র সেই মৃত্তিকা পরে, সেথায় প্রভুর ঘর॥

তারা দেশে ফিরে হযরত যায়দ রা.- এর পিতার কাছে গোটা ঘটনা খুলে বলেন। তারা তাকে হযরত যায়েদের ঠিকান জানিয়ে দেন। তখন হারেছা এবং হযরত যায়দ রা. -এর চাচা কা'ব হযরত যায়দ রা. -এর খোঁজে মক্কা মুকাররমায় এসে হাজির হন। তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, সে নবী করীম সা.-এর খেদমতে আছে। তারা তখন লোকদের জিজ্ঞেস করে, নবী সা.-এর খেদমতে এসে হাজির হন। নবীজী সা. তখন মসজিদে হারামে অবস্থান করছিলেন। তারাকাছে এসে নিবেদন করলেন, আপনি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান? তিনি ছিলেন, আপন জাতির সরদার। আমরার কা'বার তত্ত্বাবধায়ক। লোকেরা আপনার এগুণের কথা খুব চর্চা করেছে যে, আপনি গোলাম আজাদ করেন। বন্দিদের আহার করান। আমার ছেলে আপনার গোলাম। আমরা আপনার সঙ্গে তার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। আপনি আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি ওর মুক্তিপণ হিসেবে যাই চাইবেন, আমরা তা আদায় করতে প্রস্তুত। আপনি মুক্তিপণ নিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দেন। আমার ছেলে যায়দকে আপনি ছেড়ে দিন।

নবী করীম সা. বললেন, এখানে কঠিন কিছু নেই। আমি তাঁকে এখনি ডেকে দিচ্ছি। তার কাছ থেকে তার ইচ্ছে জেনে নিন। যদি সে আপনার সঙ্গে যেতে চায়, তাহলে আমি কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই আপনাদের হাতে তুলে দেবো। কিন্তু যদি সে আমার সঙ্গেই থাকতে পছন্দ করে, তাহলে জেনে নিন, যে আমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছুক, তাকে তাড়িয়ে মুক্তিপণ নেওয়া আমাকে দিয়ে হবে না।

তারা বলল, আপনি তো আমাদের অর্ধেক সমস্যা সামাধান করে দিয়েছেন। (তারা ভেবেছিল, হযরত যায়দ রা. অবশ্যই বাবা-চাচার সঙ্গে যেতে চাইবে।)

নবী করীম সা. হযরত যায়দ রা.-কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এদের দু'জনকে চিনো?

হযরত যায়দ রা. বললেন, জি হ্যাঁ! ইনি হচ্ছেন আমার বাবা, আর তিনি হলেন আমার চাচা।

নবীজী সা. বললেন, তুমি আমার সঙ্গে অনেক দিন ছিলে। এখন আমি তোমাকে এখতিয়ার দিচ্ছি, চাইলে আমার সঙ্গে থাকতে পারো, আর চাইলে তাদের সঙ্গে চলে যেতে পারো।

যায়দ রা. বললেন, আমি আপনার উপর কাউকে প্রধান্য দিতে পারি না। আপনিই আমার বাবা। আপনিই আমার চাচা।

হযরত যায়দ রা.-এর বাবা ও চাচা তাঁর উত্তর শুনে চিৎকার করে বললো, যায়দ! তোমার কী হয়েছে? তুমি মুক্ত জীবনের উপর দাসত্বের জীবন প্রাধান্য দিচ্ছো? তুমি একজন অচেনা লোককে জন্মদাতা বাবা ও চাচা; এমনকি ঘরের লোকদের উপর প্রধান্য দিচ্ছো?

হযরত যায়দ রা. বললেন, জি হ্যাঁ! আমি এই মহান ব্যক্তির কাছে এমন জিনিস দেখেছি, যার পর আমি তাঁর উপর অন্য কাউকে প্রধান্য দিতে পারি না।

নবী করীম সা. হযরত যায়দ রা.-এর আলাপচারিতা শুনে তাঁর হাত ধরে তাঁকে হাতিমের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি উচ্চ শব্দে ঘোষণা করলেন, হে লোক সকল! তোমরা সাক্ষি থেকো, আজ থেকে যায়দ আমার ছেলে ও আমার উত্তরাধিকারী হবে। আমিও ওর উত্তরাধিকারী হবো।

হযরত যায়দ রা.-এর পিতা ও চাচা এ দৃশ্য দেখে শান্ত হয়ে গেলেন। তারা তখন সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরে যান। তখন থেকে লোকেরা হযরত যায়দ রা.-কে যায়দ ইবনে হারেছা না বলে যায়দ ইবনে মুহাম্মাদ বলতে শুরু করল। যার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনে কারীমের সূরা আহযাবে বেশ কিছু আয়াত অবর্তীণ হয়। যেখানে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দত্তক সন্তানকেও তাঁর জন্মদাতা পিতার দিকে সংযুক্ত করে ডাকতে হবে।

নবী করীম সা. হযরত যায়দ রা.-এর হাতে অনেকগুলো যুদ্ধাভিযানে নেতৃত্ব তুলে দিয়েছিলেন। বস্তুত এর মাধ্যমে তিনি উম্মতকে এই শিক্ষা

দিয়েছেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র খোদাভীরুতাই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপনের মাপকাঠি গোলাম বা আজাদী নয়। এমনকি সর্বশেষ অভিযান মুতার যুদ্ধের নেতৃত্বের দায়িত্বভারও তাঁর হাতে অর্পন করেছিলেন। যেই হযরত যায়দ রা. নবী করীম সা. -এর সঙ্গ ও সান্নিধ্যের লোভে নিজের জন্মদাতা বাবা ও চাচাসহ গোটা পরিবার ছেড়ে দিয়েছিলেন, আল্লাহর দীনের জন্য সেই তিনিই নবী করীম সা. থেকে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) কিলোমিটার দূরের প্রবাসভূমিতে শায়িত আছেন। হে আল্লাহ! আপনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকেও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট বানিয়ে দিন।

হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রা.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. -এর নাম হযরত বেলাল রা.-এর মাজারের কাছ ঘেঁষেই একটি কবরের সমাধিক ফলকে খোদাই করা রয়েছে। তিনি ছিলেন নবী করীম সা.-এর দ্বিতীয় মোয়াজ্জেন। যে যুগে তিনি প্রায় সময় ফজরের আজান দিতেন। মূলত তিনি ছিলেন মক্কা মুকাররিমার বাসিন্দা। বংশীয়ভাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রা.-এর মামাতো ভাই ছিলেন। শৈশবেই তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। যার ফলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। যখন মক্কা থেকে মুসলমানদের হিজরতের কার্যক্রম শুরু হয়, তখন নবী করীম সা.-এর পূর্বেই তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় পাড়ি জমান। তাঁর সম্পর্কে কুরআনে কারীমে দু'টি আয়াত অবর্তীণ হয়েছে।

সূরা নিসার ৯৫ নম্বর আয়াত প্রথম দিকে এমন ছিলো,

لا يستوى القاعدون من المومنين والمجاهدين فى سبيل الله

> "মুজাহিদদের মধ্য হতে যে সকল লোক জিহাদ থেকে বিরত থাকে, তারা আর আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা সমান হতে পারে না।"

এই আয়াত অবর্তীণ হওয়ার পর হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রা. খুবই দুঃখিত হন। কারণ, দৃষ্টিশক্তির সমস্যার কারণে তিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারছেন না। তখন তিনি নবী করীম সা.-এর কাছে নিজের সমস্যার কথা ব্যক্ত করেন। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতাংশ অবতীর্ণ হয়–

غير أولى الضرر

"তবে সে সকল লোকের কথা ভিন্ন, যাদের সমস্যা রয়েছে।"

তদ্রূপ সূরা আবাসার প্রারম্ভের কিছু আয়াতেও হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। নবী করীম সা. মক্কার নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে দাওয়াত পৌঁছাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে ইবনে উম্মে মাকতুম রা. কোনো একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসেন। অন্ধ হওয়ার কারণে তিনি দেখতে পান নি যে, নবীজীর কাছে কারা বসে আছে? এ জন্য বারবার নবীজীকে সম্বোধন করে প্রশ্ন ছুঁড়ছিলেন। (তার সঙ্গে অকৃত্রিম সম্পর্ক থাকার কারণে) তিনি তাঁর কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না) সেই সব সব লোকদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াতের কাজে নিমগ্ন থেকে গেলেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়–

عَبَسَ وَ تَوَلّٰىٓ ۙ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۙ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ۙ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۙ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۙ وَ مَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۙ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۙ وَهُوَ يَخْشٰى ۙ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۚ

"সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো। কারণ, তাঁর কাছে অন্ধ লোকটি এলো। তুমি কেমন করে জানবে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে উপদেশ তাঁর উপকারে আসতো। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছো। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই। অন্যপক্ষে যে, তোমার কাছে ছুটে এলো, আর যে (আল্লাহ কে) ভয় করে, তুমি তাকে উপদেশ করলে। -সূরা আবাসা, আয়াত : ১-১০

উল্লিখিত 'অন্ধজন' বলতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. উদ্দেশ্য। খোদ কুরআনুল কারীম যার খোদাভীরুতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ব প্রমাণের জন্য আর কোনো দলীল লাগবে? মদিনা মুনাওয়ায় হিজরতের পর থেকে যখনই নবী করীম সা. জিহাদ ইত্যাদির প্রয়োজনে মদিনার বাহিরে যেতেন, অধিকাংশ সময় হযরত ইবনে উম্মে

মাকতুম রা. কেই মদিনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যেতেন। এভাবে তিনি তের বার মদিনায় নবীজী সা.-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। -আল ইসাবা : ২/৫১৬-৫১৭

যদিও কুরআনুল কারীমে তাঁকে জিহাদের ফরজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তার মাঝে জিহাদী স্পৃহার প্রাবল্য এতটাই ছিলো যে, অনেকগুলো জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং যুদ্ধের আমীরের কাছে এই আবেদন করেছেন যে, পতাকা আমার হাতে দিন। কেননা অন্ধ হওয়ার কারণে আমি পালাতে পারবো না। -তাবকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৫৪

সে মতে যখন হযরত ওমর ফারুক রা.-এর শাসনামলে ইরানের পরাশক্তির সঙ্গে ঐতিহাসিক কাদিসিয়া যুদ্ধ বাঁধে, সে যুদ্ধে তিনিও অংশ গ্রহণ করেন। সেই যুদ্ধে তাঁর হাতে কালো রঙ্গের একটি পতাকা ছিল। বুকের উপর লৌহবর্ম চাপিয়ে তিনি জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। -তবকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৫৫

কাদিসিয়ার যুদ্ধের পর তাঁর যুদ্ধে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে ইতিহাস নিশ্চুপ। কারো বক্তব্য হলো, তিনি সেই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। অপর পক্ষের অভিমত হলো, সেখান থেকে তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন। এখানেই বসবাস করেন। মদিনাতেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। -আল ইসাবা : ২/৫১৬, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১/৩৬৫

হযরত থানবী রহ.-এর একটি ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার তিনি উপস্থিত লোকদেরকে ব্যক্তিগত একটি ঘটনা শোনালেন। বললেন, আল্লাহ তা'আলা আজ পরীক্ষার এক আশ্চর্য সুযোগ আমাকে দান করলেন। আজ ঘরে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীর সাথে কথা হলো। তখন একটা বিষয়ে সে আমাকে একটু আধটু বকাঝকা করলো। আমি তখন একটু রেগে গিয়ে বললাম, বিবি! তোমার এ জাতীয় আচরণ আমার অসহ্য মনে হচ্ছে। যদি বলো যে, আমি আজ থেকে খানকায় থাকার ব্যবস্থা করি। একটি চৌকি ফেলে সেখানে আজীবন কাটিয়ে দেই। তবুও তুমি এ জাতীয় ব্যবহার আমার সাথে করো না।

হযরত থানবী রহ. বলেন, বিবিকে তো এতো কাঠিন করে কথা বলে দিলাম। কিন্তু এরপর আমি ভাবলাম, আসলেই কি আমি এটা করতে পারবো? খানকায় আজীবন কাটিয়ে দেওয়ার দাবি মিথ্যা হয়ে যায় নি তো? যদি বিবি বলে দিত, যান। আপনার ইচ্ছা পূরণ করুন। তাহলে সত্যিই কি বিবিকে ছেড়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম? আলহামদুলিল্লাহ! এভাবে নিজেকে নিয়ে আমি ভেবে দেখলাম এবং অনুভব করলাম যে, আমি পারবো। কেননা এসব ভালবাসাতে আল্লাহর জন্যই। আর আল্লাহর মহব্বতের খাতিরেই যে কাউকে আমি ছাড়তে পারবো, এতে আমার কষ্ট হবে না।

প্রকৃত পক্ষে এত বড় দাবি তিনিই করতে পারেন, যিনি দুনিয়ার সব ভালবাসাকে حب لله তথা আল্লাহর ভালবাসার অধীনে করে নিয়েছেন। দীর্ঘ মেহনত ও অনুশীলনের মাধ্যমেই এই স্তরে পৌঁছা সম্ভব।

ডা. আবদুল হাই রহ.-এর সতর্কতা

আব্বাজান যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন ডা. আবদুল হাই রহ. সমবেদনা প্রকাশের জন্য এলেন। আব্বাজানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতা কতটুকু তা বলে বুঝানো যাবে না। আমার মনে হলো, অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিলাম। তাই আমি আব্বাজানের সালসা নিয়ে এলাম। হযরতের সামনে পেশ করে বললাম, হযরত! এখান থেকে একটু পান করে নিন। দুর্বলতা কেটে যাবে। হযরত বললেন, এটা কেন আনলে? এটা তো উত্তরাধিকারী সম্পদের অংশ। তোমার আব্বার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক তুমি একা নও যে, কাউকে দিতে পারবে। এমনকি সামান্য অংশ কাউকে দেওয়ার মালিক তুমি একা নও। আমি বললাম, হযরত! আব্বার সন্তানেরা সবাই এখানে আছে। আপনি পান করলে সবাই খুশি হবেন। তখন হযরত সালসাটি নিলেন।

আমরা আপনার জন্য গৌরব বোধ করি

এটি আমেরিকার সপ্তম সফর ছিলো। প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম, মুসলমানদের দীনি চেতনা আগের চেয়ে আরো বেগবান হয়েছে।

তিন ঘন্টা ভ্রমণের পর আমরা সাতটার কাছাকাছি সময়ে সান্তাক্লারায় প্রবেশ করি। এটি উচ্চশিক্ষিত ও বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের শহর। বহু সংখ্যক মুসলমানও এখানে বসবাস করেন। তাঁরাও সবাই উচ্চ শিক্ষিত। মুসলমানগণ এখানে একটি চমৎকার কমিউনিটি সেন্টার বানিয়েছেন। এতে মসজিদ আছে, মিলনায়তন আছে এবং মুসলমানদের সমাজিক কর্মকাণ্ডের এরা কিছু ঘর আছে। মাগরিবের নামাযের পর কমিউনিটি সেন্টারের মিলনায়তনে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। আমি যখন মঞ্চে পৌছি, শ্রোতাদের সব আসন ছিল পরিপূর্ণ। ব্যবস্থাপকগণ আমার আলোচ্য বিষয় ঠিক করে দিয়ে ছিল, Islamic Judicial System (ইসলামে ন্যায় বিচার ব্যবস্থা)। উপস্থিত সুধী মণ্ডলীর মধ্যে পাকিস্তান ও ভারতের মুসলমান ছাড়াও আরব ও আমেরিকার মুসলমানও ছিলো। তাই সবাই বুঝতে পারেন এমন ভাষা ছিল কেবল ইংরেজি। কাজেই ইংরেজিতেই আমি ভাষণ প্রদান করি। প্রায় এক ঘন্টায় আমার ভাষণ শেষ হয়। আমি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিকে আমার আলোচনার ভিত্তি হসিবে গ্রহণ করি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন–

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِتَحۡکُمَ بَیۡنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىکَ اللّٰہُ ؕ وَ لَا تَکُنۡ لِّلۡخَآئِنِیۡنَ خَصِیۡمًا

"আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি– যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন, সে মোতাবেক মানুষের মাঝে বিচার মীমাংসা করো এবং বিশ্বাসঘাতকদের সমর্থনে তর্ক করো না। -সূরা নিসা : ১০৫

আমি নিবেদন করি যে, এই আয়াত ন্যায় বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত মৌল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা (Legisatlure) বিচার বিভাগ (Judiciary) এবং আইন ব্যবসায় (Bar) তিনটির মৌলিক দিকনির্দেশনা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসে যে, আইন সব সময় পরিবর্তনশীল (Dunamie) হওয়া উচিত না কি এমন কিছু আইনও থাকা উচিত, যেগুলো সর্বাবস্থায় এবং সর্বযুগে একই রকম থাকবে? যদি কিছু আইনের অপরিবর্তন হওয়াই উচিত হয়,

তাহলে সে আইনগুলো কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে? আলহামদুলিল্লাহ! আমার আলোচনা সবাই মনোযোগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে শুনেন। আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী খুব আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বও অনেকক্ষণ ধরে চলে। এক কমিউনিটি সেন্টারের প্রধান একজন আরব ভদ্রলোক। আমি মঞ্চ থেকে নেমে এলে তিনি আমার কপালে চুমু খান এবং বলেন,

نحن فاخرون بك

"আমরা আপনার জন্য গৌরব বোধ করি।"

রাত দশটার দিকে এশার নামায হলো। নামাযের পর লোকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে অনেক সময় লেগে গেলো। আমেরিকার প্রায় সব জায়গায় এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় যে, মুসলমানদের নিজেদের দীনের সংরক্ষণ এবং তাঁদের ইসলামী স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রাখার চিন্তা মাশাআল্লাহ! এত দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে যে, নির্ভেজাল মুসলিম দেশগুলোতেও অনেক সময় তা পরিলক্ষিত হয় না।

হীরা ভাঙ্গতে পারে, হুকুম ভাঙ্গতে পারে না

আমার শায়খ ড. আবদুল হাই একট ঘটনা শুনিয়েছেন। বড়ই শিক্ষামূলক ঘটনা। বিখ্যাত বিজয়ী বাদশাহ সুলতান মাহমূদ গজনবী, তার এক প্রিয় গোলাম ছিল। গোলামটিকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন। নাম ছিল, আয়ায। এ কারণে মানুষ বলাবলি করত, আয়ায সুলতানের মুখরা গোলাম। আর সুলতান এ গোলামকে বড় বড় ব্যক্তির উপরও অধিক গুরুত্ব দিতেন। এ নিয়ে দরবারে খুব কানাঘোষা চলত। তাই সুলতান ভাবলেন, এর একটা বিহিত সমাধান হওয়া দরকার। ওযীর আমীরের চাইতে এ গোলামকে গুরুত্ব দেওয়ার রহস্যটা সকলের সামনে উন্মোচন করে দেওয়া প্রয়োজন।

সুলতানের কাছে উপহার স্বরূপ একটি মূল্যবান হীরা এসেছিল। হীরাটি দেখতেও খুবই চমৎকার ছিল। সুলতান দরবারে উপবিষ্ট। উপহারটি সুলতানের দরবারে পেশ করা হলো। সকলেই আগ্রহ ভরে হীরাটি দেখতে লাগলো এবং প্রশংসাও করল।

সুলতান তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে কাছে ডেকে বললেন, আপনি কি হীরাটি দেখেছেন? কেমন দেখলেন? প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিল, জাঁহাপনা! অতুলনীয়। গোটা পৃথিবীতে এমন হীরা পাওয়া ভার। এবার সুলতান বললেন, হীরাটি মেঝেতে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেলুন। এ নির্দেশ শোনা মাত্রই প্রধানমন্ত্রী করজোড়ে বলল, জাঁহাপানা! হীরাটা অত্যন্ত দামি। স্মারক হিসেবে এটা আপনার কাছে সংরক্ষিত থাকবে। এটা আপনি ভাঙ্গতে বলছেন কেন? আমি বিনয়ের সঙ্গে আরজ করছি, এটি ভাঙ্গবেন না।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, আপনি বসুন। তারপর ডাকলেন এক মন্ত্রীকে। তাকেও একই নির্দেশ দিলেন। সেও হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে গেল। মিনতি ঝরা কণ্ঠে বলল, জাঁহাপনা! আপনি এ মূল্যবান সম্পদটি ভাঙ্গতে বলছেন, আমার দরখাস্ত হলো, এটি স্মৃতিস্বরূপ আপনার কাছেই রেখে দিন। এভাবে তিনি একের পর এক মন্ত্রীকে ডাকলেন। প্রত্যেককে একই নির্দেশ দিলেন। কিন্তু প্রতেকেই একই কথা বলল।

সকলের শেষে সুলতান ডাকলেন আয়াযকে। আয়ায উত্তর দিল, জি জাহাপনা! সুলতান বললেন, এই হীরাটি তুলে আছাড় মারো।

আয়ায সঙ্গে সঙ্গে হীরাটি হাতে তুলে নিল এবং মেঝেতে আছাড় মেরে চুরমার করে ফেলল।

সুলতান যখন দেখলেন, আয়ায সত্যি সত্যিই হীরাটিকে ভেঙ্গে ফেলেছে, তখন রাগতস্বরে বললেন, তুমি হীরাটিকে ভেঙ্গে ফেললে! কেন এমন করলে? এত বড় বড় মন্ত্রীকেওতো আমি ভাঙ্গতে বলেছিলাম। তারা তো ভাঙ্গল না। তুমি কেন এমন করলে? তোমাকে বললাম আর অমনি তুমি এত মূল্যবান হীরাটিকে টুকরো টুকরো করে ফেললে?

আয়ায প্রথমে বিনয়াবনত হয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, জাহাপনা! ভুল হয়ে গেছে।

সুলতান বললেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু ভাঙ্গলে কেন? আয়ায কিছুটা সাহস সঞ্চার করে উত্তর দিল, জাহাপনা! আমার মন বলছিল, এটা তো সেরেফ একটা হীরা। এর মূল্য যতই হোক, এটা ভাঙ্গার মতো বস্তু। কিন্তু আপনার নির্দেশ তো ভাঙ্গার মতো নয়। আমার কাছে আপনার নির্দেশ

হীরা ভাঙ্গার চাইতে অধিক দামী। তাই আমি ভেবেছি, নির্দেশ ভাঙ্গার চাইতে হীরা ভাঙ্গাটাই আমার জন্য সহজ। এ জন্যই আমি এমনটি করেছি।

এবার সুলতান উপস্থিত মন্ত্রীদের লক্ষ্য করে বললেন, এটাই হলো আপনাদের ও আয়াযের মাঝে পার্থক্য। আপনাদেরকে যখন কোনো নির্দেশ দিই, তখন তার তাৎপর্য ও তলব করেন। আর আয়ায হলো হুকুমের গোলাম। তাকে যা বলা হয়, সে তা-ই পালন করে। তার কাছে কারণ ও যুক্তির কোনো মূল্য নেই।

চিন্তা করুন! সুলতান মাহমূদ গজনবীর একটি নির্দেশের মূল্যই বা কতটুকু? তাঁর বিবেক-বুদ্ধি সীমিত। সীমিত তাঁর মন্ত্রীদের ও আয়াযের বিবেক বুদ্ধিও। এই মর্যাদার প্রকৃত অধিকারী তো সেই সত্তা, যিনি এই বিশ্ব ভূবনের স্রষ্টা, হীরা ভাঙ্গা যেতে পারে, অন্তর ভাঙ্গ যেতে পারে, ভাঙ্গা যেতে পারে মানুষের আবেগও। স্বপ্ন ও কামনা বাসনাও ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাঁর হুকুম তো ভাঙ্গা যায় না। এ মর্যাদার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সূতরাং তাঁর কোনো হুকুমের মাঝে যুক্তি ও কারণ খোঁজ করা নিরেট বোকামী ছাড়া আর কী হতে পারে? আর এর মূল কারণ হলো গুনাহ। মানুষ যত গুনাহ করে, তার বিবেক-বুদ্ধিও ততটা কমতে থাকে। সার কথা হলো, গুনাহের কারণে বুদ্ধি-বিবেক হারিয়ে যায়।

এক আনছারী সাহাবী কর্তৃক অপর সাহাবীকে প্রাধান্য দেওয়া

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এক আনসারী সাহাবীর নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে প্রাধান্য দেয়ার ঘটনার প্রশংসা করে ইরশাদ করেন–

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَىٰٓ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سورة الحشر :

"অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রচণ্ড প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা অপরকে প্রাধান্য দেয়। -সূরা হাশর : ৯

হয়ত আপনি জেনে থাকবেন, এক সাহাবী র ঘটনা। রাসূল সা.-এর একজন মেহমান এক আনসারী সাহাবীর ঘরে এলো। কিন্তু খাবার পরিমাণে কম ছিল। এই পরিমাণ খাবার ছিলো যে, মেহমান খেলে তাদের

হবে না, আবার তারা খেলে মেহমানের হবে না। ঘরে সামান যা ছিল, তাই তিনি মেহমানের সামনে পেশ করলেন। তারপর ভাবলেন, যদি মেহমানের সাথে বসে খাবারে শরিক না হই, তবে মেহমানের মাঝে প্রশ্ন জাগবে (?) যে, আমরা কেন খাচ্ছিনা? তাই তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন এবং মেহমানকে এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যে, তিনি নিজেও খাচ্ছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্তি আয়াত নাজিল হয়। অর্থাৎ তারা চরম অভাব অনটনেও অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। একবার এই আয়াতের উপর আমল করেই দেখুন! অপর মুসলমান ভাইকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়ায় যে সাধ ও শান্তি, মজা ও স্থিরতা অনুভূত হয়, তা হাজার কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যাল্যান্স সঞ্চয় করেও অর্জন হয় না। তাই হুযুর সা. আনসারী ও মুহাজির সাহাবীর মাঝে এই ইচ্ছার (তথা অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া) -এর মাধ্যমে বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার হিম্মত ও তাওফীক দান করুন। -আমীন।

হযরত শুআইব আ.-এর জাতির অপরাধ

হযরত শুআইব আ. আল্লাহর এক প্রেরিত নবী। নিজ কওমের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। তাঁর জাতি ছিলো এক অকৃতজ্ঞ জাতি। কুফর, শিরক, মূর্তিপূজাসহ নানা অপরাধে তারা নিমগ্ন ছিলো। এ ছাড়াও একটি অপরাধ তাদের মাঝে ব্যাপক ছিলো। তা হলো তারা মাপে কম দিতো। এ ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট দূর্নাম ছিলো। আরেকটি অপরাধও তারা করতো। তা হলো পথচারীদের মালামাল লুটপাট করে খেয়ে ফেলতো। হযরত শুআইব আ. তাদেরকে বুঝালেন। কুফর ও শিরক থেকে তাদেরকে সতর্ক করলেন। তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানালেন। ওজনে কম না দেওয়ার ও পথচারীদের নিরাপদে যেতে দেওয়ারও নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর জাতি ছিলো নিজেদের কুকর্মে অটল। তারা হযরত শুআইব আ. -এর দরদ মাখা কথার কোনো পাত্তা দিলো না; বরং বললো–

أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟

"আপনার নামায কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা ঐ সব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষরা যার যার পূজা

করে আসছে, আর আমাদের ধন -সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম- সবই কি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করতে হবে।" -সূরা হুদ : ৮৭

হযরত শুআইব আ. তাদের যতই বুঝান, কোনো কাজ হলো না। দুর্ভাগ্য তাঁর জাতির। অবশেষে তাই ঘটলো, যা নবীদের কথা অমান্য করলে ঘটে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত শুআইব আ.-এর জাতির উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দিলেন। তিনদিন পর্যন্ত এ শাস্তি অব্যাহত ছিলো। সে এক অসহনীয় জ্বালা। আসমান থেকে যেন আগুন পড়ছিলো। আর জমিন থেকে যেন আগুন উথলে বের হচ্ছিলো। ফলে তারা ঘরের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেতো না। তিনদিন পর হঠাৎ সেই জনপদের উপর গাঢ় মেঘ দেখা দিল। এ মেঘের নীচে সুশীতল বায়ু ছিলো। গরমে অস্থির জাতি দৌড়ে সেই মেঘের নিচে জমায়েত হয়ে গেলো, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে আগুন নিক্ষেপ শুরু করলো। ফলে সবাই ছাই ভস্ম হয়ে গেলো। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ

"তারপর তারা শুআইব আ.-কে মিথ্যাবাদী বললো, ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করলো।" -সূরা শুআরা : ১৮৯

অন্যত্র তিনি বলেছেন–

فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلًا وكنا نحن الوارثين

"আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন-যাপনে মদমত্ত ছিলো। এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ি, তাদের পর এগুলোতেই মানুষ সামান্যই বসবাস করছে। অবশেষে আমি মালিক রয়েছি।" -সূরা কাসাস : ৫৮

যে ব্যক্তি ওজনে কম দেয়, সে তো মনে করে, এর দ্বারা আমার সম্পদ বাড়ছে। অথচ এগুলো কিছুই তো তার কাজে আসবে না।

রাতে শোয়ার পূর্বে তওবা করবে

বাবা নাজম আহসান রহ. ছিলেন, একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ। হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর অন্যতম খালিফা। চমৎকার মানুষ ছিলেন তিনি। যারা তাঁকে দেখেছে, তাঁর সম্পর্কে তারা খুব ভালো জানেন। বিরল প্রতিভার অধিকারী, বিচক্ষণ ও দৃঢ়চেতা ছিলেন তিনি। সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন। একদিন তিনি তওবা সম্পর্কে বয়ান করছিলেন। আমিও কাছেই ছিলাম। মাঝে মাঝে তিনি ছোট ছোট চুটকি শুনাতেন। বয়ান চলাকালীন স্বাধীনচেতা এক যুবক তাঁর কাছে এলো। যুবক তার নিজের কোনো প্রয়োজনেই এসেছিলো। কিন্তু এ বুযুর্গ তো সব সময় একই ফিকিরে থাকতেন যে, কিভাবে মানুষকে দীন-ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া যায়। এই জন্য ঐ যুবককে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, শোন! মানুষের ধারণা হলো, দীনের উপর চলা খুব কঠিন। আসলে দীনের উপর চলা খুব সহজ। রাতের বেলা একটু বসে আল্লাহর দরবারে একটু তওবা করে নেবে। ব্যস! এটাতে তো দীন।

যুবকটি চলে যাওয়ার পর আমি হযরতকে বললাম, হযরত! আসলে বিস্ময়কর এক তওবার সন্ধান আপনি যুবকটিকে দিয়েছেন; কিন্তু মনে হয়ত খটকা দেখা দিয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী খটকা? আমি বললাম, শুনেছি, তওবার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা–

১. কৃত গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়া,

২. গুনাহটি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া,

৩. ভবিষ্যতে না করার অঙ্গীকার করা।

এই তিনটি শর্তের মধ্যে প্রথম দু'টি শর্ত পূরণ তো খুব কঠিন নয়। তবে সমস্যা হলো, তৃতীয় শর্তটি নিয়ে। কারণ, কে জানে অঙ্গীকার টেকসই হবে কি না? আর অঙ্গীকার শুদ্ধ না হলে তওবা তো শুদ্ধ হবে না। সুতরাং গুনাহটিও মাফ হবে কি না, এ ব্যাপারে খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি।

আমার উক্ত কথার উত্তরে বাবা নাজম আহসান রহ. বললেন, যাও মিঁয়া! তোমরা তো অঙ্গীকারের অর্থ কি, সেটাই বুঝো না। অঙ্গীকারের অর্থ হলো, নিজের পক্ষ থেকে এই নিয়ত করা যে, ভবিষ্যতে গুনাহটি আর

করবো না। এখন অঙ্গীকার করার সময় অন্তরে যদি এ খটকা থাকে যে, অঙ্গীকার পূরণ করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে কি না, তবে এটা অঙ্গীকারের পরিপন্থি নয়। হ্যাঁ, নিয়তটা হতে হবে নির্ভেজাল। আর খটকার জন্য একটা চিকিৎসা আছে। তা হলো আল্লাহর কাছে দু'আ করো যে, "হে আল্লাহ! আমি তওবা করছি। ভবিষ্যতে গুণাহটি না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। কিন্তু আমি ও আমার ওয়াদাই বা কতটুকু? আমি নিতান্তই দুর্বল। জানা নেই, ওই ওয়াদার উপর টিকে থাকতে পারবো কি না? হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ওয়াদার উপর মজবুত ও স্থির রাখুন।" এভাবে দু'আ করলে উদ্ভূত খটকা আপনা আপনিই দূর হয় যাবে। ইনশাআল্লাহ।

সত্য বলতে কী, বাবা সাহেবের উক্ত কথাগুলো শুনে আমার অন্তর শান্তিতে ভরে গেলো।

নয়নাভিরাম দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

মাওলানা রূমী রহ. দুনিয়া সম্পর্কে একটি চমৎকার উপমা পেশ করেছেন। উপমাটি এত চমৎকার যে, এটি মাথায় থাকলে দুনিয়া সম্পর্কে কেউ কখনো ভুল বুঝবে না। তিনি বলেন, দুনিয়া হলো পানির মতো। আর মানুষ হলো নৌকার মতো। পানি ছাড়া যেমন নৌকা চলতে পারে না, নৌকার জন্য পানি যেমন অপরিহার্য বিষয়, অনুরূপ দুনিয়ার ধন সম্পদ ও কামাই রোজি ছাড়া কেউ চলতে পারে না। অতঃপর বলেন, পানি ততক্ষণ পর্যন্ত নৌকার জন্য উপকারী, যতক্ষণ তা নৌকার পার্শ্বে ও নিচে থাকে। যদি পানি নৌকার ভেতর চলে আসে, তাহলে তা উপকারের জায়গায় নৌকা ডুবে যাওয়ার কারণ হবে। মাওলানা রূমী রহ. বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া মানুষের আশপাশে থাকবে, মানুষ তার মাধ্যমে তার প্রয়োজনাদি পূরণ করবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তা তার জন্য উত্তম পুঁজি বলে বিবেচিত হবে এবং তা হবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহ। তবে যেই দিন দুনিয়া তার অন্তর নৌকায় প্রবেশ করবে, প্রতিটি মুহূর্তে তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত ও ফিকির এমন ভাবে ছেয়ে যাবে যে, তার অন্তর চক্ষু দিয়ে দুনিয়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না, তখন এই দুনিয়া তাকে ধ্বংস করে ফেলবে।

লক্ষ্য করুন! এই দুনিয়া হলো "متاع الغرور" ধোকার সামগ্রী, ফেৎনা। এই দুনিয়া হলো মৃত লাশ আর এর আর ঐ দুনিয়া অন্বেষণকারী হলো কুকুর। যে তার অন্তর নৌকায় দুনিয়াকে স্থান দিয়েছে।

তোমাদের পদতলে যখন গালিচা বিছানো থাকবে

এক হাদীসে এসেছে, একবার নবীজী সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, যখন তোমাদের পদতলে গালিচা বিছানো থাকবে, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরামের মাজে বিস্ময়ভাব ফুটে উঠলো। কারণ গালিচা তো কল্পনাবিলাস বৈ কিছু নয়। যেখানে খেজুর পাতার চাটাই ভাগ্যে জোটে না, মাটিতে শুয়ে হয়, সেখানে গালিচা তো স্বপ্নের বস্তু। কোথায় গালিচা আর কোথায় আমরা? তাই তারা নবীজী সা.-কে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সা.!

أين لنا الأنبار، قال إنها ستكون

"আমরা গালিচা পাবো কোথায়? হুযুর সা. উত্তর দিলেন, যদিও এখন গালিচা তোমাদের নিকট স্বপ্নের বস্তু মনে হয়; কিন্তু সে দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তোমাদের নিকট গালিচাও থাকবে। [বুখারী শরীফ,কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং : ৩৬৩১]

এজন্যই হুযূর সা. বলেছেন, তোমাদের ব্যাপারে আমি দরিদ্রতার ভয় করছি না। তবে আমি সময়ের ভাবনায় সন্ত্রস্ত, যেই সময় তোমাদের পদতলে কার্পেট-গালিচা বিছানো থাকবে। অর্থবৈভব তোমাদের আশেপাশে সরগরম থাকবে আর তোমাদের আল্লাহকে ভুলে যাবে। দীনের বিস্মৃতির কারণে দুনিয়া তোমাদের উপরে বিজয় লাভ করবে।

হযরত মুফতি সাহেব রহ. সম্পর্কিত মুবাশশিরাত

কিছু কিছু লোক আব্বাজান মুফতি সাহেব রহ. সম্পর্কে চমৎকার স্বপ্ন দেখেছেন। যেমন একজন রাসূলুল্লাহ সা.-কে আব্বাজনের আকৃতিতে দেখেছেন। এ ধরনের আরো সুন্দর স্বপ্ন আব্বাজান সম্পর্কে তারা দেখেছেন। যারা এ সব স্বপ্ন দেখেছেন, তারা অনেকেই আব্বাজানকে

অবহিত করেছেন। তিনি সেগুলো একটি খাতায় সংরক্ষিত করে রেখেছেন। খাতাটির শিরোনাম ছিল মুবাশশিরাত তথা সুসংবাদ জাগানিয়া স্বপ্ন। তবে খাতাটির প্রথম পৃষ্ঠায় যে কথা গুলো লিখেছেন, তা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' দিয়ে লিখেন–

এই খাতায় ঐ সকল স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করছি, যেগুলো আল্লাহর নেক বান্দাগণ আমার সম্পর্কে দেখেছেন। এগুলো নিছক মুবাশশিরাত ও নেক লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করছি। আল্লাহ এ সব স্বপ্নের বরকতে আমাকে সংশোধন করে দিন। তবে আমি সকল পাঠককে সর্তক কর দিচ্ছি যে, ভালো স্বপ্ন কখনো মর্যাদার মানদণ্ড হতে পারে না। এ সব স্বপ্নের ভিত্তিতে আমার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। জাগ্রত অবস্থায় কাজকর্ম কথাবার্তাই হলো মূল মাপকাঠি। তাই এ সব স্বপ্নের কারণে কেউ আমার ব্যাপারে ধোকায় লিপ্ত হবেন না। নিজেও না, অন্যকেও করবেন না। স্বপ্নের হাকিকত মূলত এতটকুই।

প্রকৃত নিঃস্ব কে?

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার হুযূর সা. সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, নিঃস্ব হলো ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কোনো টাকা নেই। রাসূল সা. বললেন, না এ প্রকৃত নিঃস্ব নয়; বরং প্রকৃত নিঃস্ব হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজের নিজের আমল নামায় অসংখ্য নেকী, নামায, রোযা, যিকির-আযকার ও অনেক তাসবীহ নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হবে। কিন্তু যখন কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তখন লোকজন তার চারপাশ ভীড় ধরে থাকবে। একজন বলবে, সে আমার অমুক অমুক হক বা সম্পদ নিয়েছে। আরেকজন বলবে, সে আমার হক নষ্ট করেছে। অন্য একজন বলবে, সে আমার অমুক অধিকার লুণ্ঠন করেছে। সেখানে তো কোনো স্বর্ণ-রূপা কিংবা টাকা পয়সা থাকবে না যে, তাদেরকে দিয়ে হক পূরণ করবে। সেখানে তো পুঁজি হবে নেকীসমূহ। তাই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করবেন যে, তাদের হকের পরিবর্তে এই লোকের নেকীসমূহ দিয়ে দেওয়া হবে। তখন কেউ তার নামাযের নেকী নিয়ে চলে যাবে, কেউ রোযার নেকী নিয়ে

যাবে, কেউ তার যিকির আযকার নিয়ে যাবে। এভাবে এক পর্যায়ে তার সকল নেকী শেষ হয়ে যাবে। তবু লোকদের হক আদায় হবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) নির্দেশ করবেন, যেহেতু নেকী শেষ হয়ে গেলো, তাই পাওনাদারদের গুনাহ সমূহ তার আমল নামায় দিয়ে তাদের হক আদায় করে দাও।

পরিশেষে তার অবস্থা হবে, যেখানে সে নেকী নিয়ে ভরপুর হয়ে এসেছিল। এখন শুধু নিঃস্ব হাতে ফিরে যাচ্ছে এমন নয়; বরং গুনাহর বোঝা নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত নিঃস্ব হলো এই ব্যক্তিই। -তিরমিযী, বাবু সিফাতিল কিয়ামা, হাদীস নং : ২৫৩৩

শয়তান নিজের জন্য খাবার হালাল করতে চায়

হযরত হুযায়ফা রা.বর্ণনা করেন, একবার খাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে হাজির ছিলাম। ইতোমধ্যে এক কিশোরী দৌড়ে এলো। তাকে খুব ক্ষুধার্ত মনে হলো। কেউ তখনো খাওয়া শুরু করেনি। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সা. এখনো খাওয়া শুরু করেন নি, মেয়েটি তাড়াতাড়ি করে খাবারের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সা. খপ করে তার হাত ধরে ফেললেন এবং খাওয়া থেকে বিরত রাখলেন এবং কিছুক্ষণ পর এক গ্রাম্য ব্যক্তি এলো। তাকে ক্ষুধায় কাতর মনে হলো। খাবারের দিকে সেও হাত বাড়াচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সা. তার হাতও ধরে ফেললেন এবং খাবার থেকে বিরত রাখলেন। এরপর উপস্থিত সাহাবীদের সম্বোধন করে বললেন–

إنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أنْ لا يُذْكَرَ اسمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَإنَّهُ جَاءَ بِهذِهِ الجارية لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهذا الأعرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَاخذْتُ بِيَدِهِ ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا

"অর্থাৎ, শয়তান খাবারে এভাবে ভাগ বসাতে চায়, যাতে তাতে আল্লাহর নাম না নেওয়া হয়। তাই সে এ মেয়ের মাধ্যমে খাবার হালাল করার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর শয়তান খাবার হালাল করার উদ্দেশ্যে এক

গ্রাম্য ব্যক্তির রূপ ধরে এলো। কিন্তু এবারো সে আমার কাছে ধরা খেয়ে গেলো। আল্লাহর কসম! এ মেয়েটির হাতের সাথে এ মুহূর্তে শয়তানের হাতটাও ধৃত রয়েছে।" -কিতাবুল আশরিবাহ, হাদীস : ৪০১৭

যিয়ারতের যোগ্যতা কোথায়

মুফতি শফী সাহেব রহ.-এর নিকট এক ব্যক্তি আসা যাওয়া করতেন। একদিন তিনি এসেই বললেন, হযরত! আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলুন, যার বরকতে প্রিয় নবী সা.-কে স্বপ্নে দেখার সৌভগ্য লাভ করতে পারি। মুফতি সাহেব রহ. বললেন, ভাই স্পর্ধা তো কম নয়। নবীজী সা. -এর যিয়ারতের তামান্না তুমি করছো! এই কামনা করার মত দুঃসাহস তো আমার নেই। কেননা নবীজী সা. কে দেখার মতো যোগ্যতা আমার কথায়? কেথায় আমরা আর কোথায় তার যিয়ারত? এত বড় সাহস তো আমি করতে পরিনি, বিধায় এধরনের আমল শেখার চিন্তাও আসেনি। যদি যিয়ারত নসীব হয়, তাহলে আমরা তাঁর আদব, হক, মর্যাদা রক্ষা করতে পারবো কি? হ্যাঁ! আল্লাহ যদি দয়া করেন এবং প্রিয় নবী সা.-এর যিয়ারত নসীব করেন- সেটা ভিন্ন কথা। তখন সেটা হবে এক মহান পুরস্কার। পুরস্কার যখন দিবেন, পুরস্কারের যোগ্যতাও তিনি দিবেন। তবে নিজে স্বয়ং এ হিম্মত করতে পারি নি। প্রত্যেক মুমিনের একান্ত তামান্না থাকে, প্রিয় নবী সা. কে স্বপ্নে হলেও দেখার। সেই তামান্না অবশ্য আমার আছে। তবে এর জন্য চেষ্টা সাধনা করার মত স্পর্ধা আমার নেই।

পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতার পরিণাম

ইউরোপে নারীদের সাথে প্রতারণা করা হলো। তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া হলো। মুখরোচক নাম দেওয়া হলো "নারী স্বাধীনতা"। এই চতুরতার মাধ্যমে অবলা নারীদেরকে ঘরের বাইরে আনা হলো। পরিণামে যা হলো, তা এই, স্বামী ভোরে আপন কর্মস্থলে চলে যায়, স্ত্রীও নিজ কর্ম স্থলে চলে যায়। ঘরে ঝুলে থাকে তালা। যদি শিশু সন্তান থাকে, তাকে কোনো চাইল্ড কেয়ারে রেখে আসা হয়। পিতার স্নেহ ও মাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত

শিশু অন্যদের হাতে প্রতিপালিত হতে থাকে। যেই সন্তান পিতার স্নেহ ও মাতার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত, অন্যের হাতে প্রতিপালিত হয়, সে সন্তানের হৃদয়ে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও মায়ের প্রতি ভালবাসা আসবে কী করে?

এর ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, বাবা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন তখন সন্তান তাকে নিয়ে যায় 'ওল্ড এজ হোম'-এ। বাবা এই সন্তানের জন্মের পর রেখে এসেছিলো 'চাইল্ড কেয়ার'-এ। তাই এই সন্তান বাবাকে রেখে আসে 'ওল্ড এজ হোম'-এ।

একটি ওল্ড এজ হোম'-এর এক বাবার এমনই এক ঘটনা শুনেছি। হোমের ম্যানাজার পুত্রের কাছে ফোন করেছে, আপনার পিতা মারা গেছে, আপনি এসে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করুন। ছেলে উত্তর দিলো, বাবার মৃত্যুতে আমি আন্তরিকভাবে শোকাহত। কিন্তু আমার জরুরী কাজ আছে বিধায় আসতে পারবো না। দয়া করে আপনি তার শেষ কৃত্যটা সেরে ফেলুন। আমি এসে বিল পরিশোধ করে দেবো।

হযরত জাবের রা. -এর বিবাহ

রাসূল সা.-এর এক ঘনিষ্ট সাহাবীর নাম জাবের রা.। যিনি আনসারী ছিলেন। তিনি রাসূল সা.-কে জানালেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এক মহিলাকে বিয়ে করছি। রাসূল সা. জানতে চাইলেন, তুমি কুমারী বিবাহ করেছো, নাকি বিধবা? জাবের রা. উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছোট ছোট ছয়টি বোন আছে। তাদের জন্য একজন অভিজ্ঞ নারী দরকার ছিলো, যেন সে তাদেরকে লালন-পালন করতে পারে। যদি আমি কুমারী বিয়ে করতাম, তাহলে একাজটি সে আঞ্জাম দিতে পারত না। তাই আমি একজন বিধবা নারীকে বিয়ে করেছি। এ কথা শুনে রাসূল সা. তাঁর জন্য বরকতের দু'আ করে দিলেন।

এভাবে গভীর ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, হযরত জবের রা. নিজের বিয়েতে রাসূল সা.-কে দাওয়াত করেন নি। এনিয়ে কোনো অভিযোগ করেন নি। বিয়ে সম্পর্কে ইসলামের নীতি এটাই, যা রাসূল সা. আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ আজকাল বিয়ে-শাদী মানেই আনুষ্ঠানিকতার ঝড়

তুফান। মূলত আমাদের বিয়ে-শাদীতে প্রচলিত এসব রুসম রেওয়াজ ও লম্বা চৌওড়া আনুষ্ঠানিকতা হিন্দু খ্রিস্টানদের থেকে ধার করা। যার ফলে একটি সাদাসিধে বিষয় আজ মহাআজাবে পরিণত হয়েছে।

সার কথা হলো, ইসলাম বিবাহের সম্পূর্ণ বিষয়টি সহজ করেছে। যেন মানুষ সুষ্ঠু পন্থায় নিজের স্বভাব চাহিদা মেটাতে পারে। বিয়ে পরিত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বনের আমন্ত্রণ ইসলাম জানায় নি।

চতুর্দিক থেকে শয়তানের আক্রমণ

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলতেন, আল্লাহ তা'আলা যখন শয়তানকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন, তখন বিদায় নেওয়ার সময়ে সে প্রার্থনা করেছিল, হে আল্লাহ আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত আয়ু দান করুন। আল্লাহ তার আবেদন কবুল করে নিলেন। তারপর অহমিকা প্রদর্শন করে সাথে সাথ বলে উঠেছিল, সে আদমের কারণে আমাকে জান্নাত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তার সন্তানদের আমি এভাবে গোমরাহ করবো যে,

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ۗ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ

অর্থাৎ এই মিশন নিয়ে আমি তাদের কাছে যাবো। অগ্র-প্রশ্চাত, ডান-বাম চতুর্দিক থেকে তাদেরকে আক্রমণ করবো।

হযরত থানবী রহ. বলেন, বুঝা গেল শয়তানের আক্রমণ চতুর্মুখী হয়ে থাকে। সামনে-পেছনে, ডানে-বামে তার আক্রমণ চলে। কিন্তু দু'দিকের কথা শয়তান ভুলে গেছে। উপরের দিক এবং নিচের দিকের কথা। সুতরাং উপরের দিকও নিরাপদ, নিচের দিকও নিরাপদ। উপরের দিক নিরাপদ হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার সথে সম্পর্ক গড়ে তোলা। তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া। বলো, হে আল্লাহ শয়তান আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আপনি দয়া করে আমাকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন।

নিচের দিক নিরাপদ হওয়ার অর্থ হলো, তোমরা নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে চলো। তাহলে ইনশাআল্লাহ! শয়তানের চর্তুমূখী আক্রমণ থেকে নিরাপদে

থাকবে। কাজেই অকারণে ডানে-বামে ইতি উতি করবে না। দৃষ্টিকে অবনত রাখবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

সারকথা হলো, দৃষ্টির ফেৎনা মানুষের চরিত্রকে অবক্ষয়ের দিয়ে নিয়ে যায়। আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে, আমাদের সমাজে এটা এখন এক মহামারীর রূপ নিয়েছে। কেউ এর থেকে নিরাপদ নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. -এর আত্মশুদ্ধি

অসংখ্য হাদীসের বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা রা.। যিনি ছিলেন, সূফী প্রকৃতির বুযুর্গ সাহাবী। একবার তাঁকে বাহরাইনের গভর্নর বানানো হয়ছিল। ফলে দিনের বেলায় রাষ্ট্রীয় কাজ করতেন। যখন সন্ধ্যা নেমে আসতো, তখন লাকড়ির বোঝা মাথায় করে নিয়ে বাজারে বিক্রি করতেন। কেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এ কাজ করেন কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমার নফস খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। আমার ভয় হয়, গভর্নর হওয়ার কারণে সে অহংকারী হয়ে পড়ে কি না? তাই আমি তাঁকে বার বার বোঝাতো চাই যে, এই হলো তোমার প্রকৃত অবস্থান।

এক তন্ত্রগুরুর ভয়াবহ ঘটনা

আমি স্বচক্ষে একটি ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছি। একবার এক মসজিদে গিয়ছিলাম। জানতে পারলাম, এখানে একজন তন্ত্রগুরু আসবেন। নামায ও সুন্নাত পড়ে বের হয়ে দেখলাম, বাইরে দুই লাইন সারিবদ্ধ হয়ে অনেক লোক অপেক্ষামান দাঁড়িয়ে আছে। তন্ত্রগুরু মসজিদ থেকে বের হলেন। আর লোকজন লাইনে দাঁড়ানো অবস্থাতেই মুখ খুলে রাখলো। তারপর তন্ত্রগুরু এক এক করে সবার মুখে থুথু নিক্ষেপ করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। একবার ডান দিকে, আবার বাম দিক থুথু নিক্ষেপ করছেন। শেষে দেখলাম, কিছু লোক বালতি, পেয়ালা, জগ ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তারা অপেক্ষায় আছে, তন্ত্রগুরু থুথু ফেলবেন, আর তারা তা সংগ্রহ করে বরকত হাসিল করবে।

এই হলো পরিস্থিতি। লোকেরা এই তন্ত্র গুরুকে নিজেদের "পীর সাহেব" বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা কত নিচু মানের ভণ্ডামী। তারা তা অনুভব

করছে না। এই ভণ্ডামীর আমদানী তো তাবিজ-তুমার ও ঝার-ফুঁকের অবৈধ পথেই হয়েছে।

বাঁকা চুল সোজা করার অদ্ভূত তাবিজ

হযরত রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. -এর একটি ঘটনা। এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললো, যখন আমি চুল আঁচড়াই, তখনও চুল সোজা হয় না। এমনি সব সময় বাঁকা থাকে। এটার জন্য আপনি একটা তাবিজ দিন। হযরত বললেন, আমি তাবিজ দেই না। তা ছাড়া বাঁকা চুল সোজা করার তাবিজ তো আমি জানি না।

কিন্তু মহিলা কোনা ভাবেই মানতে রাজি নয়। হযরত বলেন, অবশেষে উক্ত মহিলার খুব পীড়াপীড়ির কারণে আমি একটি কাগজে লিখে দিলাম–

بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم

তারপর বললাম, এটা তাবিজ বানিয়ে পরবে। আশা করি, তোমার বাকা চুল সোজা হয়ে যাবে।

অনেক সময় মহান আল্লাহ কিছু বান্দার সাথে এমন আচরণ করেন যে, তাদের মুখ থেকে কোনো কথা বের হলে তা সত্যে পরিণত করে দেন। বিভিন্ন বুযুর্গ সম্পর্কে যে শোনা যায়, তারা অমুক কাগজে এই লিখে দিয়েছেন, আর তাতেই কাজ হয়ে গিয়েছে। আসলে রহস্য এটাই। এটা অন্য কিছু নয়। সেরূপ এই মহিলার চুল সোজা হয়ে গিয়েছিল।

একটি অভিনব তাবিজ

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. -এর কাছে এক গ্রাম্য লোক এলো। তার ধারণা ছিলো, তাবিজ না জানলে সে তো মৌলবী নয়। তাই সে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-কে বড় আলেম মনে করে এলো। এসে বললো, মাওলানা সাহেব! আমাকে একটা তাবিজ দিন। গাঙ্গুহী রহ. বললেন, আমি তো তাবিজ জানি না। লোকটি বলল, হুযুর! আমাকে একটা তাবিজ দিলে কী হয়? গাঙ্গুহী রহ. এবারও একই উত্তর দিলেন। কিন্তু লোকটি কোনো ভাবেই বিশ্বাস করতে রাজি নয় যে, গাঙ্গুহী রহ.

তাবিজ দিতে জানেন না। অবশেষে গাঙ্গুহী রহ. নিজেই বলেন, লোকটি কোনোভাবে আমার কথা বিশ্বাস করছিলো না। তাই বিরক্ত হয়ে আমি একটি কাগজ তলে নিয়ে লিখে দিলাম–

یا اللہ! یہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں، آپ نے فضل و کرم سے اسکا کام کر دیجئے

"হে আল্লাহ! এই লোক মানে না। আমি জানি না। আপনি দয়া করে তার কাজটা করে দিন।"

এটা লিখে লোকটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এটা ঝুলিয়ে দিন। কিন্তু কী আশ্চর্য! এতেই লোকটির কাজ হয়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা তার কাজটি পূরণ করে দিলেন।

থানাভবনের খানকার নিয়ম

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর মাদরাসা ও খানকার নিয়ম হলো, উস্তাদগণের জন্য ঘণ্টা নির্ধারণ করা ছিলো। অমুক সময়ে অমুক উস্তাদ আসবেন ও অমুক কিতাব পড়াবেন। এভাবে একটা নিয়ম করা ছিলো। কিন্তু এর জন্য মাদরাসার পক্ষ থেকে কোনো আইনি পাবন্দি ছিলো না। কিন্তু প্রত্যেকের মেজাজ গড়ে উঠেছিল। ফলে দেখা যেত, কোনো উস্তাদ দেরিতে সবকে এলে তিনি স্বেচ্ছায় তা রেজিস্ট্রি বইয়ে লিখে রাখতেন। ঘণ্টার মাঝখানে কোনো বন্ধু-বান্ধব কিংবা সাক্ষাৎ প্রার্থীর সাথে সময় ব্যয় করলে তাও নোট করে রাখতেন। তারপর মাসের শেষে নিজেই দরখাস্ত দিতেন যে, আমি এই পরিমাণ সময় ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেছি। সুতরাং এই পরিমাণ বেতন কেটে রাখা হোক। এভাবে প্রত্যেক উস্তাদ মাসের শেষে আবেদন করে নিজের বেতন কাটিয়ে নিতেন।

শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী রহ.

হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী রহ. ইতিহাসের অন্যতম মহান সূফী সাধক হিসেবে জ্ঞানী মহলে পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি ৫৬০ হিজরিতে তৎকালীন উন্দুলুসের [স্পেন] মুরসিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখান থেকে "ইশবিলিয়া" -এ চলে আসেন। সেখানে তিনি

জনৈক রাজার দরবারে কেরানির কাজ করতেন। পরবর্তীতে তাঁর মাঝে দুনিয়াবিমুখ চেতনা প্রাবল্য সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততা ছেড়ে এক আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যান। বাদশাহ তাঁর উপহার হিসেবে একটি বাড়ি দিয়েছিলেন। তৎকালীন বাজারদর অনুযায়ী বাড়িটির মূল্য ছিল এক লক্ষ দিরহাম। কথিত আছে, একবার তাঁর কাছে এক ভিক্ষুক আসে। তখন তাঁর কাছে দেয়ার মত কিছুই ছিলো না। ঐ ভিক্ষুককে তিনি বাড়িটি দান করে দেন।

ইশবিলিয়া থেকে মুহিউদ্দীন রহ. সফর করে হজের উদ্দেশ্যে হারামাইন শরীফাইন হাজির হন। মিশর, ইরাক ও সিরিয়া সফর করেন। এ সময় তিনি মিসরে অনেকদিন অবস্থান করেন। অনেকগুলো কিতাব লিখেন। যেহেতু তার রচনাবলির মাঝে বাহ্যিকভাবে শরিয়ত পরিপন্থি মনে হয় - এমন অনেক কথা থাকতো, এ জন্য মিশরে লোকেরা তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে যায়। এ জন্য তাকে বন্দিও করা হয়। কেউ কেউ তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলতে উদ্ধত হয়। অবশেষে আলী ইবনে ফাতাহ আল-বাজায়ী তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। যেখান থেকে মুক্ত হয়ে তিনি দামেস্কে চলে এসে এখানেই বসবাস করেন। ৬৩৮ হিজরিতে এখানেই ইন্তেকাল করেন।

হযরত শায়খ ইবনে আরাবীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞানীমহল একমত নন। তাঁর কিতাবাদির মাঝে শরিয়ত পরিপন্থি যে সব কথা পাওয়া যায়, সেগুলোর কারণে অনেক মুহাদ্দিস ও ফেকাহবিদ তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত। তবে অনেকেই তাঁকে অপারগ মনে করে দায়মুক্তি দিয়ে কিতাবাদিও লিখেছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছেন। নাম, তাম্বীহুল গাবী ফি তারবিয়াতি ইবনে আরাবী। সেখানে তিনি লিখেছেন–

"والقول الفيصل فى ابن عربى اعتقاد ولايته وتحريم النظر فى كتبه، فقد نقل عنه أنه قال : نحن قوم يحرم النظر فى كتبنا، ... وذلك لأن الصوفية تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معان غير المعانى المتعارفة منها، فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل الظاهر كفر، نص على ذلك الغزالى فى بعض كتبه"

"আল্লামা ইবনে আরাবী সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, তাঁর ব্যাপার অলি হওয়ার বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে তাঁর রচনাবলি দেখা না জায়েয ঘোষণা করতে হবে। কেননা, খোদ তার থেকেই বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমরা এমন শ্রেণীর লোক, (যারা আমাদের অভিরুচি সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাদের জন্য) আমাদের বই পড়া জায়েয নয়। তার কারণ হলো, সুফিয়ায়ে কেরাম নিজেদের বলয়ে এমন কিছু পরিভাষা নির্ধারণ করে রেখেছেন, প্রচলিত অর্থের বাইরে সেগুলোর তারা ভিন্ন অর্থ নিয়ে থাকেন। এখন যদি তাদের সেই পরিভাষাগুলোর গায়ে প্রচলিত অর্থের জামা পরিয়ে নেন, তাহল তো কাফের হবেই। ইমাম গাজালী রহ. তার বেশ কিছু রচনার মাঝে সে কথা লিখেছেন।"

শায়খ ইবনে আরাবী রহ. সম্পর্কে এটি বেশ ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. আল্লামা ইবনে আরাবী রহ.-কে দায়মুক্তি দিয়ে একটি পুস্তিকা লিখছেন। 'তাম্বীহুত তাবারী ফি তানযিহী ইবনিল আরাবী।" নামে সেই পুস্তকটি প্রকাশিতও হয়েছে। সেখানে হযরত হাকীমুল উম্মত আশরীফ আ্লী থানবী রহ. সেই অভিমতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

আসল কথা হলো, সুফিয়ায়ে কেরাম যে বিশেষ ভাবাবেগ ও অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যান যদি কোনো ব্যক্তি সেই বিশেষ মনোজাগতিক চলচিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকেন- তাহলে তার পক্ষে সেটি অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। কাজেই আমাদের মতো লোকদের ক্ষেত্রে জনৈক কবির সেই কবিতা বেশ যুৎসই।

تو نہ دیدی گہے سلیمان را   چہ شناسی زبان مرغان را

"যখন তুমি দেখোনি সুলাইমানের রূপ
তবে কীকরে বুঝবে তুমি কী বলে হুদহুদ?"

কাজেই তাঁদের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষাণ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা তাঁদের সামগ্রিক জীবন ছিল, নবীজী সা. এর

সুন্নতের অনুসরণের কাঠামো দিয়ে তৈরী। অন্য দিকে তাদের সেই রচনাবলিও অধ্যয়নের প্রয়োজন নেই। নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য শরীয়ত ও সুন্নাতের আলোকে রচিত গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। সেগুলোর হক আদায় করলেই অনেক। সেই কণ্টকাকীর্ণ গুপচিতে ঢু মারার কোনো প্রয়োজন নেই।

হযরত আবূ সুলাইমান দারানী রহ.

হযরত আবূ সুলাইমান দারানী রহ.-এর প্রকৃত নাম, আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে আতিয়্যা আল আবাসী। তিনি একজন তাবয়ে তাবেয়ী, যুগবিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ও উচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। জন্মগ্রহণ করেছিলেন সিরিয়ায়। এরপর কিছু দিনের জন্য ইরাক গমন করেন। পরবর্তীকালে সিরিয়াতেই ফিরে এসে বসবাস করতে থাকেন। এখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। তার অধিকাংশ সময় যিকির ও মুরাকাবায় ব্যস্ত থাকতেন। দাওয়াত ও তারবিয়াতের কাজও সমানভাবে অব্যাহত থাকতো। ইমাম আবূ নাঈম ইস্পাহানী রহ. তাঁর স্মৃতিচারণে বেশ দীর্ঘ একটি নিবন্ধ লিখেছেন। যেখানে তিনি তাঁর অনেকগুলো অমিয় বাণী উল্লেখ করেন। তা থেকে নির্বাচিত কয়েকটি বাণী তুলে ধরা হলো−

১. তিনি বলেন, দুনিয়া সবসময় তার কাছ থেকে পলায়নকারীর পেছনে ছোটে। যদি সে পলায়নকারীকে সে ধরতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে রক্তাক্ত করে ছাড়ে। আর দুনিয়া লোভী তাকে ধরলে সে তাকে হত্যা না করে ক্ষান্ত হয় না।

২. তিনি আরো বলেন, দুর্বল প্রকৃতির লোকেরা খুব বেশি ওয়াসওসা ও স্বপ্নের শিকার হয়ে থাকে। যদি পূর্ণ নিষ্ঠা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে স্বপ্ন ও ওয়াসওসা, দুটোই বন্ধ হয়ে যায়। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, অনেক সময় আমার কায়েক বছর পেরিয়ে যায়। অথচ কোনো স্বপ্ন দেখি না।

৩. তিনি বলেন, যদি কখনো তোমার কোনো নফল ইবাদতও ছুটে যায়। তাহলে তারও কাজা করে নাও। এ কল্যাণে আশা করি আগামীতে সেটাও তোমার ছুটবে না।

৪. তিনি বলেন, অনেক সময় আমার করআনুল কারীমের একটি আয়াত ভাবতেই পাঁচ পাঁচ রাত কেটে যায়। যদি আমি নিজ থেকে তার উপর

ভাবনা ক্ষান্ত না করি, তাহলে আমার পক্ষে তার সামনে এগুলো অসম্ভব হয়ে উঠে।

৫. একবার তাঁকে তার জনৈক শিষ্য বলেন, বনী ইসরাঈলের উপর আমার বেশ ঈর্ষা হয়। তারা অনেক দীর্ঘ জীবন পেয়েছে। তারা এত বেশি ইবাদত করতো যে, তাদের গায়ের চামড়া সংকুচিত হয়ে পুরতন মশকের মতো হয়ে যেতো। তখন দারানী রহ. বলেন, আল্লাহর শপথ! মহান আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে এ প্রত্যাশা করেন না যে, আমাদের চামড়া হাড্ডির উপর শুকিয়ে যাক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছ থেকে নিয়তের সততা ছাড়া আর কিছুই চান না। যদি আমাদের কোনো ব্যক্তি দশ দিনের মধ্যে সেই সততা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে আল্লাহর কাছে সেই মর্যাদাপূর্ণ স্তর পেয়ে যেতে পারে, যা বনী ইসরাঈল গোটা জীবন খেটে অর্জন করেছিল।

৬. তিনি বলেন, এর নাম ইবাদত নয় যে, তুমি পা শক্ত করে (নামাজে) দাঁড়িয়ে থাকবে। আর অন্য কোনো তোমার আয় রোজগার করে দেবে; বরং প্রথমে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করে নাও। অতঃপর ইবাদতে মশগুল থাকো। [হুলইয়াতুল আওলিয়া লি আবি নাঈম : ১/২৫৪-২৬৪]

সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ.

সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. কে মুসলিম শিশুরা পর্যন্ত চেনে। তিনি ছিলেন, নুরুদ্দীন যঙ্গী রহ.-এর শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের একজন। নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ. তাকে তার চাচা শেরকোহ-এর সঙ্গে একটি যুদ্ধাভিযানে অংশ্রগহণ করার জন্য মিসরে পাঠান। সেখানে তিনি রণনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ফিরিঙ্গিদের অনেকগুলা আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেন। অনন্তর নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ.-এর পক্ষ থেকে তিনি মিসরের শাসক নিযুক্ত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় মিশর থেকে ফাতেমী শাসনের অবসান ঘটে। নূরুদ্দীন যঙ্গী রহ. (যার রাজধানী ছিলো শাম) এর ইন্তেকালের পর শামবাসী তাঁকে অখণ্ড শামের শাসনভার গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। এভাবে তিনি একই সময় মিসর ও শাম, এই দুই দেশের শাসকের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি তাঁর শাসনামলে একদিকে অসংখ্য ভবন নির্মাণ করেন। অপরদিকে তিনি এমন এক ক্রান্তিকালে দেশের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন, যখন

খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করে একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছিলো। সুলতান সালাহ উদ্দীন রহ. সেই যুদ্ধগুলোতে ইউরোপের সম্মিলিত শক্তির দাঁত ভেঙ্গে দেন। সে সময় বাইতুল মুকাদ্দিস ছিলো খ্রিস্টানদের দখলে। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী রহ. ৫৮৩ হিজরিতে মুসলমানদের এই প্রথম কেবলাকে তাদের দখল থেকে উদ্ধার করে সেখানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। শামের যতোগুলো এলাকা ক্রুসেডাররা দখল করে নিয়েছিলো, তিনি তার সব কটিকেই পুনরায় মুক্ত করেন। তাঁরও গোটা জীবন যুদ্ধের মাঝে কেটে গিয়েছিল। ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা, খোদাভীরুতা ও কল্যাণকামিতার তিনি ছিলেন, নূরুদ্দীন যঙ্গী রহ.-এর উত্তরসূরী। তিনি মিসরে ২৪ বছর ও শামে ১৯ বছর দেশ শাসন করেন। কিন্তু ৫৮৯ হিজরিতে যখন তিনি ইন্তেকাল করেন, তখন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্থাবর অস্থাবর, স্বর্ণ-রৌপ্য, নগদ-বাকি কোনো কিছুই ছিলো না। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অফুরক্ত রহমত বর্ষণ করেন।

সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর আজ আটশো বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। মুসলমানদের হাত থেকে তাদের সেই প্রথম কেবলা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আজো মুসলিম উম্মাহ আরেক জন সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর অপেক্ষায় আছে এবং গোটা মুসলিম বিশ্ব কাতর কণ্ঠে তাঁকে ডাকছে–

ইমাম শাফেয়ী রহ.

ইমাম শাফেয়ী রহ. জন্ম গ্রহণ করছিলেন ইয়ামানের এমন একটি পরিবারে, যা বংশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও কুলীন ছিল; কিন্তু অর্থনৈতিক বিচারে ছিল হত দরিদ্র। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হয়েছিলেন। তখন তাঁর মা তাঁকে মক্কা মুকাররমায় নিয়ে আসেন। এখানেই তিনি বেড়ে ওঠেন এবং সমস্ত বিদ্যা অর্জন করেন। এরপর মদিনা মুনাওয়ারায় ইমাম মালেক রহ.-এর কাছে চলে যান। সেখানে তিনি তাঁর সংস্পর্শ থেকে প্রচুর উপকৃত হন। এরপর তিনি নাজরানের একটি প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হন। দীর্ঘদিন তিনি সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন

করেন। কিন্তু বড়দের পরীক্ষাও অনেক বড় হয়ে থাকে। তৎকালীন শাসক (হারুন-উর রশীদ) কে ই সংবাদ জানানো হয় যে, ইয়ামানে হযরত আলী রা.-এর বংশের কিছু লোক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নাজরানের গভর্নর শত্রুতা করে হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ.-কে জড়িয়ে এ গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, আলী রা.-এর বংশের সেই লোকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে। সেই কানকথা শুনে খলীফার মনে সন্দেহ দানা বাঁধে এবং সেই অভিযোগে ইমাম শাফেয়ী রহ. কেও গ্রেফতার করে বাগদাদে নিয়ে আসে।

সে সময় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর শিষ্য হযরত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী রহ. বাদশাহর দরবারে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. যখন হারুন-উর-রশীদের কাছে পৌছেন, তখন তিনি আত্মরক্ষার্থে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর নাম নিয়ে বলেন, তিনি আমাকে চেনেন। বাদশাহ হারুন-উর-রশীদ তখন তাঁর সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কাছে জানতে চান। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আমি তাঁকে চিনি। তিনি একজন উঁচু মাপের আলেম। তাঁকে জড়িয়ে যে সব কথা ছড়ানো হয়েছে, তা তাঁর থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। তখন বাদশাহ ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-কে বললেন, আপনি তাঁকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান। আমি তাঁর ব্যাপারে চিন্তা করে পরে সিদ্ধান্ত জানাবো।

বিদ্রোহের অভিযোগে যাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছিলো, তাদের মধ্য হতে একমাত্র ইমাম শাফেয়ী রহ. এভাবে বেঁচে যান। এটি ১৮৪ হিজরির কথা। তখন ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর বয়স ছিলো ৩৪ বছর। এই পরীক্ষার মাঝে আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় প্রজ্ঞা ছিলো। ইমাম শাফেয়ী রহ. এতদিন নাজরানের প্রশাসনিক পদের বিভিন্ন কাজ-কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। উক্ত ঘটনার মাধ্যমে তিনি দ্বিতীয়বার খালেস ইলমের মাঝে মনোনিবেশ করার সুযোগ লাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ এতদিন পর্যন্ত তিনি ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-কে চিনতেন মাত্র। কিন্তু এখন রীতিমত তাঁর শিষ্যদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। যার কল্যাণে এখন ইরাকবাসীদের ইলম তাঁর দিকে সম্বোন্ধিত করা হয়। এভাবেই ইমাম শায়েয়ী রহ. হিজায ও ইরাক উভয় কেন্দ্রে থেকে ইলম অর্জন করতে সক্ষম হন।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ.-কে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। একবার ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ঘোড়ায় চড়ে বাদশাহর দরবারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য ইমাম শাফেয়ী রহ. আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। গোলামকে বললেন, খলীফার কাছে গিয়ে আমার এখন আসার অপরাগতার কথা জানিয়ে এসো। ইমাম শাফেয়ী রহ. বললেন, আমি অন্য এক সময় আসবো। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তাঁর এ কথা শুনলেন না। তাঁকে বরং সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

এভাবে তিনি প্রায় দুই বছর বাগদাদে অবস্থান করেন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে বিভিন্ন ভাবে জ্ঞান আহরোণ করে তিনি মক্কা মুকাররমায় ফিরে যান। সেখানে ৯ বছর অবস্থান করেন। সে সময় তিনি ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি সংকলন করার মনস্থ করেন। তখন ১৯৫ হিজরিতে দ্বিতীয় বার বাগদাদে আগমণ করেন। সেখানে তিনি তাঁর الرسالة (আর রিসালা) কিতাবটি রচনা করেন। জীবনের পড়ন্ত বেলায় মিশনেরর প্রশাসকের আহ্বানে মিসর চলে আসেন। অবশেষে ২০৪ হিজরির রজব মাসে এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

মহান আল্লাহ ইমাম শাফেয়ী রহ. কে বিশেষ প্রতিভা ও মেধা শক্তি দিয়েছিলেন। তিনি মাত্র ৭ বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম হিফজ করেন। ১০ বছর বয়সে গোটা মুয়াত্তা মালেক মুখস্থ করেন। তীরন্দাযের নৈপূণ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলো না। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, যদি আমি ১০টি তীর নিক্ষেপ করি, তাহলে এর মধ্য হতে একটি তীরও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে না। তিনি এমন যাদুভরা কণ্ঠে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতেন যে, শ্রোতামণ্ডলীর হৃদয় প্রচণ্ড ভাবাবেগে সিক্ত হয়ে যেত। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর সমবয়সী এক ব্যক্তির সূত্রে খতীব বাগদাদী রহ. বর্ণনা করেছেন, লোকটি বলে, যখন আমরা কান্না করতে চাইতাম, তখন একে অপরকে বলতাম, চলো, কুরাইশ বংশীয় সেই যুবকের কাছে গিয়ে তাঁর তেলাওয়াত শুনি। যখন আমরা তাঁর কাছে পৌছতাম এবং তিনি নিজ থেকে তেলাওয়াত শুরু করতেন, তখন তার সামনে লোকজন চোখের অশ্রু সংবরণ করতে পারতো না। চিৎকার করে সবাই কেঁদে উঠতো। সে সময় তেলাওয়াত থামিয়ে দিতেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইলমের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ মার্গের বাগ্মীতা দান করে ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের বড় বড় আলেমদের সঙ্গে বিভিন্ন ফেকহী মাসাআলা নিয়ে বিতর্ক করেছেন। কিছু কিছু বিতর্কসভার বিবরণ তিনি নিজেই তাঁর الأم (আল উম্ম) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি এমন এখলাসের অধিকারী ছিলেন যে, তিনি নিজেই বলেন,

ما نظرت احدًا فأحببت أن أخطى

"আমি যার সঙ্গেই বিতর্ক করেছি, কখনোই আমার মনে খাহেশ উঠেনি যে, আমার প্রতিপক্ষের ভুল প্রমাণিত হোক।"

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর রচনাবলি ইলমে ফিকাহ ও ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে দালিলিক গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। তাঁকে তো 'ইলমুল উসূল"-এর আবিস্কারক মনে করা হয়। তারপরও তিনি লিখেন,

وردتُ انَّ الناسَ لو تعلموا هذا الكتبَ، ولم ينسبوها...؟؟

"হায়! লোকেরা যদি এই কিতাবগুলো পড়ে উপকৃত হতো, কিন্তু সেগুলোকে আমার দিকে সম্বোন্ধিত না করতো।"

জাতির যে শ্রেষ্ঠ সন্তানের মাঝে এ পরিমাণ এখলাস, তাঁর এলমের মাঝে কেনই বা বরকত আসবে না? তাঁর বিদ্যা কেন পৃথিবীর চর্তুপ্রান্ত ছড়িয়ে পড়বে না? এ কারণে অনেক গুণীজন তাঁকে হিজরি তৃতীয় শতকের মুজতাহিদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে তার রহমতের আঁচলে আবৃত করে নিন।

হযরত ইকবা ইবনে আমের রা.

যহরত উকবা ইবনে আমের রা একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। নবী করীম সা. যখন হিজরত করে মদিনা মুনাওয়ারা আগমন করেন, তখন তিনি নবীজী সা.-এর হাতে বাইআত হন এবং মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনার বাস করতে শুরু করেন। নবী করীম সা. -এর সঙ্গে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁকে একজন ফিকাহ বিশেষজ্ঞ সাহাবী মনে করা হতো। বিশেষ করে উত্তরাধিকার (মিরাস) শাস্ত্রে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। চমৎকার হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে কুরআনুল কারীম তেলওয়াত করতেন। তিনি

নিজ হাতে কুরআনুল কারীমের একটি অনুলিপিও তৈরী করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখেন, তাঁর সেই অনুলিপি এখনো মিসরে সংরক্ষিত রয়েছে। তবে সেটির মাঝে সূরার বিন্যাস উসমানী মাসহাফের বিন্যাসের মতো নয়। সেই অনুলিপির শেষে লেখা আছে।

كتبه عقبه ابن عامر بيده

[উকবা ইবনে আমের রা. নিজ হাতে এই অনুলিপি লিখেছেন।]

নবী করীম সা.-এর পরও তিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ করন। দামেস্কের বিজয়াভিযানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হযরত ওমর রা. তাঁর কাছ থেকেই দামেস্কে বিজয়ের সুসংবাদ শুনেন। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতের অমিলের সময় তিনি হযরত মু'আবিয়া রা.-এর পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। সিফফীন যুদ্ধে তিনি তাঁর পক্ষেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অবশেষে হযরত মু'আবিয়া রা. তাঁকে মিসরের গভর্নরের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কিতাবাদির মাঝে তাঁর খুব বেশি জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তবে তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তাঁর মাজার "জাবালুল মুকাওয়াম"-এর একটি অংশ। বিভিন্ন কিতবে অন্তত এতটুকু পাওয়া যায় যে, এ কবরস্থানে অনেক সাহাবায়ে কেরাম শুয়ে আছেন।

আল্লামা আবদুল হক ইশবিলী রহ.

আল্লামা আবদুল হক ইশবিলী রহ. ৫১০ হিজরিতে স্পেনের বিখ্যাত নগরী ইশবিলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক জীবন তিনি স্পেনেই অতিবাহিত করেন। কিন্তু যেখানকার রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে হিজরত করে বাজায়া নগরীতে এসে বসবাস শুরু করেন। এই এলাকাটিতে তিনি নিজের দেশ হিসেবে বরণ করেন নেন। এ কারণে কোথাও কোথাও তাঁকে 'আবদুল হক বাজায়ী"ও বলা হয়। হাফেজ যাহাবী রহ. -এর মতো ব্যক্তিত্ব পরখকারী বুযুর্গও তাঁর সম্পর্কে ইবনে আববার রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন–

كان فقيهًا حافظًا عالمًا بالحديث وعلله عارفًا بالرجال، موصوفًا

بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنه والفقلل من الدنيا .. الخ.

"তিনি একাধারে ফেকাহবিদ ও হাফিজুল হাদীস ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ শাখা "ইলাল" শাস্ত্রে তিনি জ্ঞান রাখতেন। দুনিয়া বিমুখতা ও আল্লাহ ভীতি, কল্যাণ ও সততা, সুন্নাতের পুঙ্খনাপুঙ্খ অনুসরণ ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি' এগুলো ছিলো তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।" [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২১/১৯৯]

বাজায়া নগরীতে অবস্থানকালে তিনি স্থানীয় জামে মসজিদের খতিব ছিলেন, শিক্ষাগুরু ছিলেন। বেশ কিছুদিন বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল জীবনের অধিকারী ছিলেন। আল্লামা ইবনে উমায়রা যোব্বী রহ. লেখেন, 'তিনি জামে মসজিদে ফজর নামায পড়ার পর সেখানে বসে চাশতের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্রদের পড়াতেন। এরপর ঘরে গিয়ে যোহর পর্যন্ত লেখালেখি ও সংকলনের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। জোহরের নামাযের পর আদালতি কাজকর্ম সেরে ফেলতেন। কখনো কখনো তিনি এ সময় পড়াতেন। আসরের পর লোকদের নানা প্রয়োজন পূরণ ও মানব সেবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন।" [বুগিয়াতুল মুলতামিস লিয যুবতী : ৩৭০]

এটি তো হলো তাঁর দিনে কার্য বিবরণী। রাত কীভাবে কাটাতেন ? এ সম্পর্কে আল্লামা আবুল আব্বাস রহ. লেখেন, তিনি তাঁর রাত দিন ভাগ করতেন। এক তৃতীয়াংশে অধ্যয়ন করতেন। অপর অংশে ইবাদত করতেন এবং বাকি অংশে নিদ্রমগ্ন থাকতেন। [উনওয়ানুদ দিরায়া লিল গবারনী : ৪২]

ঘরে সদস্যবর্গের তিনি খুবই সহানুভূতিশীল ও দয়াদ্র ছিলেন। চেতনার মাঝে প্রফুল্লতা ছিলো। প্রায় সময় তিনি বিভিন্ন ফেকাহবিদের সঙ্গে কোনো বৈঠকে বসতেন। ইত্যবসরে ভেতর থেকে কোনো দাসী এসে কোনো কাজের জন্য টাকা চাইতেন। তখন তিনি ছোট কোনো বিষয়ের জন্যও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি টাকা দিয়ে দিতেন। একবার উপস্থিত জনৈক লোক তাঁকে বললো, আপনি তাকে যে টাকা দিয়েছেন, তা তো আর প্রার্থিত পরিমাণ থেকে অনেক বেশি। উত্তরে তিনি বলেন–

لا اجمع على اهل المنزل ثلاث شينات : شيخ واشبيلى وشحيح

"আমার ঘরের লোকদের জন্য তিন শিন (ش) একত্র করি না। একটি হলো, "খাইখে"র শিন। অপরটি হলো৷, "ইশবিলি"র শিন। এই দুই শিন তো আমার মাঝে বর্তমান। এখন আমি আমার شميع (কৃপণ)-এর শিন নিয়ে আসতে চাই না। [উনওয়ানুদ দিরায়া : ৪২]

আমি যখন তাঁর মাজার যিয়ারত করতে যাই, তখন সেখানে এক বয়োবৃদ্ধ প্রতিবেশীর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমরা আমাদের বাপ-দাদার কাছ থেকে এই প্রশিদ্ধ ঘটনা শুনে এসেছি যে, আল্লামা আবদুল হক ইশবিলী রহ.-এর বাজায়ার শাসকের সঙ্গে কোনো একটি বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড দ্বিমত ছিলো। এর পরিপেক্ষিতে সে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। অতঃপর তাঁকে 'বাবুল বুনুদ' নামে বাজায়া নগরীর সিংহফটকে শুলে চড়ানো হয়। এই ফটকের বাইরের অংশে তাঁর লাশ তিনদিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়।

সেই যুগে 'বাবুল বুনুদ' ছিলো শহরের শেষ প্রান্তসীমা। সূর্যাস্তের পর এই ফটক বন্ধ করে দেয়া হতো। ফটক বন্ধ করার পূর্বে দায়িত্বশীল চৌকিদার জোরে হাঁক দিয়ে বলতো, যদি কোনো ব্যক্তি শহরের বাইরে থেকে থাকো, তাহলে ভেতরে এসে যাও। ফটক বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।"

সেই বয়োবৃদ্ধ প্রতিবেশী বললো, যেদিন হযরত আল্লামা আবদুল হক ইশবিলী রহ.-কে শূলে চড়ানো হয়, সেদিন সন্ধ্যার প্রক্কালে চৌকিদার তার অভ্যাস মাফিক যখন সেই হাঁক দেয়, তখন বাইরের জঙ্গলের দিক থেকে এই আওয়াজ আসে, "থামো! এখনো আবদুল হক রহ. শহরের বাইরে।"

চৌকিদার এটিকে শ্রুতিবিভ্রাট মনে করে যখন দ্বিতীয় বার সেই হাক দেয়, তখন তার উত্তরে ঠিক সেই আওয়াজ শুনা যায়। এভাবে ঘটনাটি তিনবার ঘটেছে। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

যেই প্রতিবেশী লোকটি আমাকে আরো জানান যে, আল্লামা আবদুল হক রহ. -এর মৃত্যুর পর বাজায়ার ছোটো ছোটো শিশুদের মুখে এই বাক্য ছিলো–

الشيخ عبد الحق ÷ قتل بغير حق

"যে শায়খ সত্যের বান্দা ছিলেন, তিনি বিনা সত্যে (অন্যায় ভাবে) নিহত হলেন।"

এতদাঞ্চলে এক সময় এই কথাটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে যায়।

মুকাত্তিম পাহাড়ের মূল্য

যে পাহাড়ে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ.-এর দুর্গ অবস্থিত ছিলো, তা ছিলো একটি পাহাড়ের টুকরো। তাকে মুকাত্তিম পাহাড় বলা হয়। কেননা কোনো বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তা হলো মুকাদ্দাস পাহাড়। হযরত মুসা আ. এ পাহাড়ের নীচেই ইবাদত করতেন। তা ছাড়া কতেক ঐতিহাসিক বর্ণনায় হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত আমর ইবনে আস রা. এ এলাকা জয় করেন, তখন মিশরের সাবেক বাদশা মুকাওকিস এই পাহাড়টি সত্তর হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করার প্রস্তাব পেশ করেন। কারণ হিসেবে সে উল্লেখ করে, আমাদের কিতাবাদিতে এই পাহাড়ের অনেক মর্যাদা বর্ণিত আছে এবং এ কথা লিখিত আছে যে, এই পাহাড়ের উপর জান্নাতের গাছ জন্মাবে। হযরত আমর ইবনে আস রা. চিঠি মারফতে হযরত ওমর রা.-এর সাথে পরমার্শ করেন। হযরত ওমর রা. বলেন, "মুসলমানগণ জান্নাতী গাছের অধিক হকদার। তাই এতে মুসলমানদের কবরস্থান বানাও।"

তাই এই পাহাড়টিকে কবরস্থানে পরিণত করা হয়। [-আল খুতাতুল মাকারিযা : ২/২২০ ও হুসনুল মুহাদারাত : ১/৬৭]

তবে সনদের বিচারে বর্ণনাটি শক্তিশালী নয়।

ডা. আবদুল হাই রহ.-এর সুন্নাতের অনুসরণ

হযরত ডা. আবদুল হাই রহ. বলতেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরে নগ্ন পায় হাঁটাহাঁটি করি। কারণ, কোনো রেওয়ায়েতে পড়েছিলাম যে, হুযূর সা. কোনো এক স্থানে নগ্ন পায়ে হেঁটেছিলেন। ঘরে আমি এ জন্য নগ্ন পায়ে চলি, যাতে হুযুর সা.-এর এই সুন্নাতের উপর আমল হয়ে যায়। তিনি আরো বলতেন, এভাবে হাঁটার সময় আমি নিজে নিজেকে সম্বোধন করে বলি, দেখ, তোর প্রকৃত অবস্থা তো এই যে, পায়ে জুতা থাকবে না, মাথায় টুপি থাকবে না, আর না থাকবে শরীরে কাপড়। শেষ মেষ তুমি মাটিতে মিশে যাবে।"

আমি জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা দিচ্ছি

عن سهل بن سعد رضـــ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يضمن ل ما بين لحيته وما بين رجليه أضمن له الجنة.

"হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুটি বস্তুর নিশ্চয়তা দেবে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। দু'টি জিনিসের একটি হলো, দুই চোয়ালের মাঝখানের বস্তু তথা যবান। একে সে মন্দ কাজে ব্যবহার না করার নিশ্চয়তা দিবে। এ যবানের মাধ্যমে সে মিথ্যা বলবে না। গীবত করবে না। কারো মনে কষ্ট দিবে না ইত্যাদি। আর অপরটি হলো দুই রানের মধ্যখানে অবস্থিত বস্তু তথা লজ্জাস্থান। যে একে অপব্যবহার না করার গ্যারান্টি দিবে, হারাম কাজ থেকে বিরত রাখবে, আমি তাঁকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। [সহীহ বুখারী, কিতাবুল রিফাক, বাবু হিফজিল লিসান]

বুঝা গেল, যবানের হেফাজত দীন হেফাজতের অর্ধাংশ। দীনের অর্ধাংশ যবানের সাথে সংশ্লিষ্ট। মানবজীবনের অর্ধেক গুনাহ যবানের কারণে হয়ে থাকে। তাই একে সংযত রাখতে হবে।

নাজাতের জন্য তিনটি কাজ

عن عقبد بن عامر ضـــ. قال : قلتُ يا رسول الله! ما النجاه؟ قال امسك عليك لسانك وليكفك بيتك وابك على خطيئتك.

"হযরত উকবা ইবনে আমের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসূল সা. কে জিজ্ঞেসা করলাম। হে আল্লাহর রাসূল! নাজাতের উপায় কী? অর্থাৎ আখেরাতে জাহান্নাম থেকে শক্তির, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাতে যাওয়ার উপায় কী? এর উত্তরে রাসূল সা. তিনটি কথা বলেছেন।

এক. নিজের যবানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবে। তোমার জিহ্বা যেন কখনো তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়।

দুই. তোমার ঘর যেনো তোমার জন্য যথেষ্ট হয় অর্থাৎ অধিকাংশ সময় ঘর-বাড়িতে কাটাবে। বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাবে না। তাহলে বাইরে যে সব ফেৎনা আছে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

তিন. যদি কোনো ভুল ত্রুটি করে ফেলো, যদি তোমার থেকে কোনো অন্যায় অপরাধ প্রকাশ পায়, তাহলে তা স্মরণ করে কাঁদো। [তিরমিযি, কিতাবুয যুহ্দ, বাবু মাজাআ ফি কিহ্জিল লিসান : হাদীস : ২৪০৮]

কাঁদার অর্থ হলো তাওবা করা। অনুতপ্ত হয়ে ইস্তেগফার করা। কাঁদার অর্থ হাউমাউ করে অনর্থক কাঁদা নয়। যেমন, কিছুক্ষণ আগে আমাকে একজন বললো, হুযুর আমার কান্না আসে না তাই আমি খুবই চিন্তিত। আসলে চোখের পানি আসতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কান্নার অর্থ হলো, গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং বলা, হে আল্লাহ! আমি অন্যায় করেছি। আমি ভুল করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও।

হুযূর সা.-এর তিন দিন অপেক্ষা

হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, ঘটনাটি নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সা. জনৈক লোকের সাথে লেনদেন করেছিলেন। উভয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, আগামী দিন আমরা অমুক জায়গায় পরস্পরে মিলিত হবো। সময় স্থান সবই নির্ধারণ হলো। সময় মতো রাসূলুল্লাহ্ সা. সেখানে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু লোকটি এলো না। অপেক্ষা করতে করতে কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেলো। কিন্তু লোকটি এলো না। রাসূল সা. দাঁড়িয়ে রইলেন। হাদীসে এসেছে, এভাবে লাগাতার তিন দিন রাসূল সা. তার অপেক্ষায় রইলেন। প্রয়োজন পড়লে ঘরে গিয়ে আবার ফিরে অপেক্ষা করতেন। তিনদিন পর যখন লোকটির সাথে দেখা হলো শুধু এতটুকু বলেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী না এসে আপনি আমাকে কষ্ট দিলেন।

শুধু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাসূল সা. তিনদিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থেকেছেন যে, চলে গেলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়ে যায় কি না? !!!

শিশুদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গের ক্ষতি

একবারের ঘটনা। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে এক সাহাবী একটি শিশুকে কোলে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু শিশুটি কিছুতেই তাঁর কাছে আসছিলো না। তাই সাহাবী শিশুটি কোলে নেওয়ার জন্য বললেন, বেটা! এদিকে আসো। আমি তোমাকে একটি জিনিস দেবো। রাসূলুল্লাহ সা. এ কথা শুনে ঐ সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই তোমার কি কোনো জিনিস দেয়ার ইচ্ছা আছে? সাহাবী উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে একটি খেজুর আছে। সে এলে আমি তাকে খেজুরটি দিতাম। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, যদি খেজুর দেয়ার নিয়ত না থাকতো, যদি শুধু ভুলিয়ে তাকে কাছে আনার উদ্দেশ্যে এ কথা বলতে, তাহলে তুমি ওয়াদা খেলাফ করতে। এর জন্য তোমাকে আল্লাহর কাছ জবাব দিহি করতে হতো।

শিশুদের সাথেও ওয়াদা রক্ষা করা উচিত। কেননা, শিশুদের অন্তর হলো সাদা পাথরের মতো। সেখানে আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড চিত্রিত হয়। সুতরাং শিশুবেলায় তার সাথে ওয়াদা খেলাফ করার অর্থ হলো, তার অন্তরে ওয়াদা খেলাফির বীজ বোপন করা। এরপর এই শিশুটি যখন বড় হবে এবং অন্যদের সাথে ওয়াদা লেখাফ করবে, তখন এর গুনাহের একটি অংশ আপনার কাঁধেও এসে পড়বে।

ইমাম গাযালী রহ.-এর একটি ঘটনা

ইমাম গাযালী রহ.-কে আমরা সকলেই জানি। তিনি অনেক বড় আলেম ও সূফী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করছিলেন সুমহান মর্যাদা। তার এক ভাই ছিলেন সূফী প্রকৃতির। ইমাম গাযালী রহ. যখন ইমামতি করতেন, তখন তাঁর ওই ভাই তার পেছনে নামায পড়তেন। একবার তিনি ইমাম গাযালীর পেছনে নামায পড়া ছেড়ে দিলেন। বিষয়টি তাদের আম্মার কানে গেলো। তাই তিনি তাঁর এই সূফী ছেলেকে ডেকে বললেন, কী ব্যাপার তুমি গাযালীর পেছনে নামায পড়ছো না কেন? তিনি মাকে উত্তর দিলেন, তাঁর আবার নামায! আমি তাঁর পেছনে নামায পড়বো কীভাবে? তিনি যখন নামাজে দাঁড়ান তখন হায়েয নেফাসের নানা মাসআলা তাঁর

মাথায় গিজগিজ করে। আম্মাজান! আপনি বলুন, এ অপবিত্র জিনিস যার মাথায় ভর করে থাকে, তার পেছনে কি নামায পড়া যায়?

মা তো কোনো সাধারণ মা ছিলেন না। তিনি তো ছিলেন ইমাম গাযালীর মা। তিনি উত্তর দিলেন, তোমার ভাই তো নামাযে ফেকহের মাসআলা নিয়ে চিন্তা করে। আর ফেকহী মাসআলা নিয়ে নামাযের মাঝে চিন্তা করা নাজায়েয নয়। আর তুমি নামাজে তোমার ভাইয়ের দোষ ধরার পেছনে লেগে থাকো। নামায পড়াকালীন অপরের দোষ খোঁজ করা তো হারাম। সুতরাং তুমিই বলো, সে উত্তম না তুমি উত্তম?

সারকথা, ইমাম গাযালী রহ.-এর আম্মা তাঁর ছেলেকে এটাই বুঝিয়ে ছিলেন যে, নামাযের মাঝে ফেকহী মাসআলা নিয়ে চিন্তা করা গুনাহ নয়। সুতরাং এটা নামাযের একাগ্রতার পরিপন্থী নয়।

পছন্দনীয় ব্যক্তি কে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে জিজ্ঞাসা করলো। আচ্ছা, বলুন তো, এক ব্যক্তি আমল খুব কমই করে। তথা নফল ইবাদত বন্দেগী তেমন একটা করে না। ফরজ ওয়াজিব ঠিক মতই আদায় করে। এরপর নফল নামায, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তেলাওয়াত খুব একটা করে না। এমন ব্যক্তিকে আপনি পছন্দ করেন → ঐ ব্যক্তিকে অধিক পছন্দ করেন, যার নফল নামায তাহাজ্জুদ, ইশরাক, আওয়াবীন সবই নিয়মিত আদায় করে। যিকর, তাসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদিও তার নিয়মিত আমল। সেই সঙ্গে গুনাহ ছাড়ে না। এই দুইজনের মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে উত্তম কে? উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমার দৃষ্টিতে গুনাহ বর্জনের চেয়ে উত্তম কিছু নেই। অর্থাৎ গুনাহ বর্জনই সবচেয়ে বড় নেয়ামত । এর তুলনা অন্য কোনো আমল দ্বারা হয় না। যদি কোনো ব্যক্তি গুনাহ বর্জনের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, তাহলে এটা অসংখ্য নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

আমি আপনার মতোই আকার ধারণ করবো

মরহুম আমীর শাহ খান সাহেব বর্ণনা করেন, যখন মিরাঠে মুন্সী মুমতাজ আলীর প্রকাশনী ছিল, সে সময় সেখানে হযরত কাসেম নানুতবী রহ.

চাকরী করতেন। ঐ প্রকাশনীতে একজন হাফেজ্জীও চাকরী করতেন। লোকটি ছিল বাউণ্ডুলে প্রকৃতির ও বিলাসী মানসিকতার। কাঁচের কাজ করা পাড় বিশিষ্ট পাজামা পরিধান করতো। দাড়ি ভাঁজ করে উপরের দিকে উঠিয়ে রাখতো, এবং নামাযের ধার-কাছেও ঘেষতো না। কিন্তু হযরত কাসেম নানুতবী রহ.-এর সাথে লোকটির গভীর হৃদ্যতা ছিল। হযরত তাকে গোসল করিয়ে দিতেন, পিঠ পরিস্কার করে দিতেন। সেও হযরতকে গোসল করিয়ে দিত এবং কোমর ধুয়ে দিত। হযরত তার চুলে সিঁথি করে দিতেন, সেও হযরতের চুলে সিঁথি করে দিত। যদি হযরতের কাছে কোনো মিষ্টান্ন আসতো, তাহলে হযরত সেখান থেকে তার জন্য একাংশ রেখে দিতেন। মোটকথা লোকটির সাথে হযরতের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। হযরতের কিছু বন্ধু-বান্ধব এমন বাউণ্ডুলে প্রকৃতির মানুষের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গতা পছন্দ করতো না। কিন্তু হযরত সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না।

এক শুক্রবার। হযরত নানুতুবী রহ. অভ্যাস মাফিক হাফেজ্জীকে গোসল করিয়ে দিলেন। সে মাওলানাকে গোসলে সহায়তা করল। গোসল শেষ হওয়ার পর হযরত তাকে বললেন, হাফেজ্জী, তোমার আমার মাঝে গভীর বন্ধুত্ব। কিন্তু তোমার রঙ এক রকম হবে, আর আমার রঙ অন্য রকম হবে, এটা ভালো মনে হয় না। এজন্য আমিও তোমার গঠন প্রকৃতি গ্রহণ করে নিচ্ছি। কাজেই তুমি তোমার কাপড় আমাকে দাও, আমিও তোমার মত কাপড় পরিধান করবো। আর আমার মুখে এই দাাড়ি আছে। তুমি এই দাড়ি তোমার মুখে স্বাভাবিকভাবে ঝুলিয়ে দাও। আর আমারা আজ পরস্পরের কাছে অঙ্গিকার করবো যে, এই কাপড়ও খুলবো না এবং এই দাড়িও ওঠাবো না।

এ কথা শুনে লোকটি দু'চোখের অশ্রু ফেলে দিয়ে বললো, এটি কি করে সম্ভব? আপনি বরং আপনার কাপড় আমাকে দিন, আমি আপনার মতই কাপড় পরবো এবং আপনার মত আমি দাড়ি নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখবো। তখন মাওলানা তাকে নিজের কাপড় পরিয়ে দিলেন এবং তার দাঁড়ি নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। সেদিন থেকে লোকটি পাক্কা নামাযী ও শুদ্ধ লেবাসী হয়ে গেল।

আমি তো তাঁকে দাড় করিয়ে দিয়েছি, বাকি অন্তর এখন তোমার হাতে

ওলামায়ে দেওবন্দকে আল্লাহ তাআলা দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের চেতনার পাশাপাশি প্রজ্ঞা ও উত্তমরূপে সুপরামর্শ দানের পদ্ধতি সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত মাওলানা মুজাফফর হুসাইন কান্ধলভী রহ.-এর ঘটনা। একবার তিনি সফরকালে জালালাবাদ বা শামেলী অতিক্রম করছিলেন। সেখানে তিনি একটি অনাবাদি মসজিদ দেখতে পেলেন। তখন তিনি নেমে পানি এনে অজু করলেন এবং মসজিদ ঝাড়ু দিলেন। সেখানকার এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলে, এ এলাকায় কোনো নামাযী নেই? লোকটি বললো, সামনেই খাঁন সাহেবের বাসা। লোকটি মদ্যপ ও পতিতাভোগী। যদি সে নামায পড়তো তাহলে তার সাথে সাথে আরো দু-চার জন লোক নামাযী হয়ে যেত।

এ কথা শুনে হযরত কান্ধলবী রহ. সেই খাঁন সাহেবের বাসায় গেলেন। খাঁন সাহেব তখন নেশার ঘোরে ঢুলছিল, তার পাশেই এক পতিতা বসেছিল। মাওলানা তাকে বললেন, "ভাই খাঁন সাহেব! যদি তুমি নামায পড়তে, তাহলে তোমার সাথে সাথে আরো দু'চার ব্যক্তি নামাযী হয়ে যেত এবং এই মসজিদ হয় যেত।"

খান সাহেব বললো, আমি ওজু করতে পারি না। আবার এই দুই খারাপ অভ্যাসও ছাড়তে পারবো না। হযরত বললেন, ওজু ছাড়াই নামায পড়, আর যদি মদ ছাড়তে না পারো, তাহলে তা পান করো। তখন খাঁন সাহেব অঙ্গীকার করল, এখন থেকে চলে এলেন এবং কিছু দূর গিয়ে নামায আদায় করলেন ও সেজদার ভেতর খুব কান্নাকাটি করলেন।

হযরতের জনৈক সাথী প্রশ্ন করলেন– হযরত! আজ আপনার থেকে এমন দুটি কাজ ঘটেছে, যা ইতেপূর্বে কখনো ঘটেনি। প্রথমতঃ আপনি মদপান ও ব্যাভিচারের অনুমতি প্রদান করেছেন। দ্বিতীয়ত: আপনি সেজদার মধ্যে কান্নাকাটি করেছেন?

হযরত বললেন, সেজদায় আমি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করেছি যে,

اے رب العزت! کھڑا تو میں نے کر دیا، اب دل تیرے ہاتھ میں ہے

"হে মহা সম্মানের অধিপতি! আমি তো দাঁড় করিয় দিয়েছি। বাকি তার অন্তর এখন তোমার হাতে।"

এরপর খাঁন সাহেবের অবস্থা এমন হলো, পতিতা চলে যাওয়ার পর জোহরের ওয়াক্ত হল। খাঁন সাহেবেরও অঙ্গীকারের কথা মনে পড়লো। তখন সে ভাবলো, আজ তো প্রথম দিন, তাই গোসল করে নেওয়া যাক। আগামী কাল থেকে অজু ছাড়াই নামায পড়বো। সে মতে সে গোসল করে পাক হয়ে নামায আদায় করলো। নামাযের পর বাগানে চলে গেল। ঐ পবিত্রতা নিয়েই সে বাগানে আসর ও মাগরিবের নামায আদায় করলো। মাগরিবের পর ঘরে চলে এলো। পূর্ব থেকেই সেখানে এক নর্তকী উপস্থিত ছিলো। ঘরে এসে সে অন্দরমহলে চলে গেল। সেখানে তাঁর নিজ স্ত্রীর উপর চোখ পড়তেই হৃদয়ের মাঝে তার ভালবাসা উথলে উঠলো। সাথে সাথে বাইরে চলে এসে পতিতাকে বলল, বেরিয়ে যাও। আগামীতে যেন আমার বাড়ির চতুসীমানায় তোকে না দেখি। -আরওয়াহে সালাসা : ১৫০-১৫১

বুযুর্গানে দীনের সান্নিধ্যের সুফল

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী রহ. কে আল্লাহ তা'আলা এই শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কার ও সংশোধনের বিশেষ তাওফীক, গভীর মেধা ও প্রজ্ঞার সাথে কার্যক্রম পরিচালনার অনন্য প্রতিভা ও যোগ্যতা দান করেছিলেন। উর্দূ সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক মরহুম জনাব জিগার মুরাদাবাদীর ঘটনা। হযরতের কোনো এক মজলিসে খাজা আযীযুল হাসান সাহেব মাজযূব রহ. হযরত থানবী রহ. কে জানালেন, একবার জিগার মুরাদাবাদীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। তখন সে আমাকে জানালো, থানাভবনে গিয়ে হযরতের সাক্ষাত করতে মন খুব চায়। কিন্তু এই বিপদের মাঝে ফেসে আছি। তা হলো, মদ ত্যাগ করতে পারি না। কাজেই আমি অপরাগ যে, কোন মুখ নিয়ে আমি সেখানে যাবো। তখন হযরত থানবী রহ. খাজা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তার উত্তরে কী বললন? খাজা সাহেব নিবেদন করলেন, আমি তাকে বলেছি, হ্যাঁ, ঠিক

কথা। এ অবস্থায় বুযুর্গদের মুখোমুখি হওয়া কিকরে সঙ্গত হয়। হযরত থানবী রহ. বললেন, "হায় খাজা সাহেব! আমি তো মনে করেছিলাম, আপনি এখন কাজ করার পদ্ধতি শিখে গেছেন। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল! খাজা সাহেবের বিস্ময়ের ভেতর দিয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. তাকে বললেন, আপনি তাকে বলে দিন–

جس حال میں ہوں اسی میں چلے جاؤ، ممکن ہے کہ یہ ملاقات ہی اس بلا سے نجات کا ذریعہ بن جائے

"যে অবস্থায় হোক, সে অবস্থাতেই হযরতের দরবারে চলে যাও। হতে পারে এ সাক্ষাতই সেই বিপদ থেকে মুক্তির মাধ্যম হবে।"

হযরত খাজা সাহেব সে নির্দেশনা পেয়ে ঐ মজলিস থেকে উঠে ফিরে গেলেন। ঘটনাক্রমে একদিন জনাব জিগার সাহেবের সাথে খাজা সাহেবের সাক্ষাত হলো। তখন তিনি তাকে সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। জিগার সাহেব হযরত থানবী রহ.-এর এই কথা শুনে তিনি প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং অঙ্গীকার করলেন, "আমি মরে গেলেও এই মন্দ জিনিস আর ছুঁয়ে দেখবো না।"

এভাবে হঠাৎ মদপান ছেড়ে দেয়ার কারণে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সে সময় সবাই পরামর্শ দিল, এরকম যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু মদপান করার তো শরয়ী অনুমোদন আছে। কিন্তু জিগার সাহেবের জিগার (কলিজা) এমনই ছিল যে, এত কিছুর পরও তিনি এই أم الخبائث (সকল মন্দের উৎস) মদ ছুঁয়ে দেখলেন না। আল্লাহ তাআলা সর্বদা সাহসী ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধকে সহায়তা করে থাকেন। তখন জনাব জিগার সাহেবও আল্লাহ তাআলার সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর তিনি থানাভবনে আসেন। হযরত থানবী রহ. তখন তাঁকে বেশ সম্মানের সাথে আতিথেয়তা করেন।

বিজ্ঞতাপূর্ণ সম্বোধন

দারুল উলূম দেওবন্দের দ্বিতীয় মুহতামিম হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন সাহেব রহ. –যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে– একবার খেয়াল

করলেন, কয়েকজন শিক্ষক দারুল উলূমের নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরি করে আসছেন। তখন তিনি তার ক্ষমতাবলে ধর-পাকড়াওয়ের পরিবর্তে একটি অভ্যাস বানিয়ে নিলেন যে, প্রতিদিন দারুল উলূমের সবকের সময় শুরু হলে গেটের কাছে একটি চকি নিয়ে তার উপর বসে যেতেন। কোনো উস্তাদ আসলে তার সাথে সেখানে সালাম, মুসাফাহা কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। কিন্তু মুখ ফুটে এ কথা বলতেন না, আপনি কেন দেরি করে এসেছেন? এই প্রজ্ঞাসূলভ সূক্ষ্ম ভর্ৎসনার মাধ্যমে সকল মুদাররিসীনকে সময়ানুবর্তিতার অনুসারী বানিয়ে ফেললেন। কিন্তু তারপরও একজন শিক্ষক দেরি করে আসতেন। একদিন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট সময় থেকে বেশ দেরি করে প্রবেশ করার সময় হযরত মুহতামিম সাহেব তাঁর সাথে সালাম, মুসাহাফা ও কুশল জিজ্ঞাসা করার পর তাঁকে পাশে বসিয়ে বললেন, "মাওলানা! আমি জানি আপনি খুবই ব্যস্ত মানুষ। যার জন্যে দারুল উলূমে আসতে আপনার দেরি হয়ে যায়। মাশাআল্লাহ! আপনার সময় অনেক মূল্যবান। আর এদিকে আমি একজন বেকার মানুষ। কর্মহীন পড়ে থাকি। আপনি এক কাজ করুন, আপনি আপনার কিছু গৃহস্থলীর কাজ আমাকে বলে দিন, আমি নিজে গিয়ে তা কর দিব। তাহলে তা'লীম তাদরীসের জন্য আপনি যথেষ্ট সময় বের করে নিতে পারবেন।"

এই বিজ্ঞতাপূর্ণ সম্বোধনের ফল যেমন প্রতিক্রিয়া হওয়ার দরকার ছিল, তেমনি হলো। সেই মুদাররিসও আগামীর জন্য সর্বদা সময়ের প্রতি মনোযোগী হয়ে গেলেন।

কারূনের উপদেশমূলক ঘটনা

দুনিয়া কীভাবে দীন হয়? এর দিকনির্দশনা পবিত্র কুরআনে রয়েছে। এটি সূরা কাসাসের একটি আয়াত। সেখানে কারূনের আলোচনা করা হয়েছে। কারূন হযরত মূসা আ.-এর যমানার ধনকুবের। যে কালে কোষাগারে সম্পদ রাখার জন্য বিশাল বিশাল তালা চাবির সাহায্য নেয়া হতো। কারুনের কোষাগারের চাবি বহনের জন্য প্রয়োজন হতো নিয়মতান্ত্রিক একটি দলের। কেবল দু'একজন তার চাবি বহন করতে পারতো না। এত বড় ধনবান ছিলো। পবিত্র কুরআনের যে আয়াতটিতে কারূনকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে আল্লাহ তাআলা এ কথা বলেন নি যে, 'কারূন'!

তুমি সব জ্বালিয়ে ধন সম্পদ থেকে হাত ধুয়ে ফেলো। সমস্ত সম্পদ আগুনে জ্বালিয়ে দাও। এ জাতীয় উপদেশ তাকে দেয়া হয় নি বরং তাকে উপদেশ দেয়া হয়েছে–

وابتغ فيما أتاك الله الدار الأخرة

"আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, যে টাকা পায়সা, সম্মান-প্রসিদ্ধি, বাড়ি-বাহন ও চাকর-নওকর দান করেছেন তা দিয়ে আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনা কর। আখেরাতের জীবন সাজাও।"

সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাকে এ ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ ও চতুরও হোক না কেন, তার সকল সম্পদ মূলত আল্লাহ তাআলারই দান। কিন্তু কারূন তা মানতে পারেনি। সে বরং দাবি করে বসল–

انما أوتيته على علم عندى .– سورة القصص : ٧٨

"আমার বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি এ সম্পদ পেয়েছি।" -সূরা কাসাস : ৭৮

তার এ অযৌক্তিক দাবির উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, এসবই আল্লাহর দান।" অন্যথায় এ পৃথিবীতে কত বুদ্ধিমান পড়ে আছে, বাজারে জুতা ক্ষয় করে চলছে, অথচ তাদেরকে একটি কথা জিজ্ঞেস করার কেউ নেই।

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এ কথা মনে রেখো যে, তোমার অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘোড়া তোমার বুদ্ধির জোরে আসেনি; বরং এ সব কিছু তোমাকে আল্লাহ তাআলাই দান করেছেন।

দস্তরখান ঝাড়ার সঠিক পদ্ধতি

দারুল উলূম দেওবন্দে আব্বাজানের একজন উস্তাদ ছিলেন। নাম মাওলানা সাইয়েদ আসগর হুসাইন রহ. যিনি "মিয়াঁ সাহেব" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের ঐ সকল উস্তাদদের একজন ছিলেন, যারা যশ-খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি থেকে সর্বদা শত ক্রোশ দূরে অবস্থান করতেন।

খুব উঁচু মাকামের বুযুর্গ ছিলেন। যার জীবনাচার দেখলে সাহাবায়ে কেরামের কথা মনে পড়ে যেত। একবার আব্বাজান তাঁর সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে যান। খাওয়ার সময় হলে বৈঠকখানায় দস্তরখান বিছিয়ে তারা আহার করেন। আহার শেষে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান দাস্তরখানাটি বাইরে কোথাও ঝেড়ে আনার জন্য ভাঁজ করতে আরম্ভ করেন। তখন মিঁয়া সাহেব তঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি এ কি করছেন? আব্বাজান নিবেদন করলেন, হযরত! দস্তরখান উঠাচ্ছি। বাইরে কোথাও ঝেড়ে নিয়ে আসি। মিঁয়া সাহেব বললেন, আপনি দস্তরখান উঠাতে জানেন? আব্বাজান বললেন, দস্তরখান উঠানো কি কোনো বিদ্যা, যা শিখতে হবে? মিঁয়া সাহেব উত্তর দিলেন, জি হ্যাঁ! এটিও একটি বিদ্যা। এজন্যই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি?

আব্বাজান দরখাস্ত করলেন, তাহলে এ বিদ্যা আমাকেও শিখিয়ে দিন। মিয়াঁ সাহেব বললেন, আসুন শিখাচ্ছি।

এ কথা বলে তিনি দস্তরখানে বেঁচে যাওয়া খাদ্যের টুকরোগুলো পৃথক করলেন। হাড্ডিগুলো আলাদা করে রাখলেন। রুটির বড় টুকরোগুলো পৃথক করলেন। তারপর দস্তরখানে পড়ে থাকা রুটির গুড়োগুলো খুঁটে খুঁটে আলাদা করে জমা করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি এ সবের প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক জায়গাও ঠিক করে রেখেছি। ঐ টুকরোগুলো আমি অমুক জায়গায় রেখে দিই। প্রতিদিন একটি বিড়াল এসে ওখান থেকে খেয়ে যায়। হাড্ডির জন্য পৃথক জায়গা আছে। কুকুর তা চিনে। এসে খেয়ে চলে যায়। রুটির এ বড় টুকরোগুরো অমুক জায়গায় রেখে আসি। সেখান পাখি আসে। ওগুলো পাখির কাজে আসে। আর রুটির গুঁড়োগুলো পিপড়ার গর্তের মুখে রেখে দিই। তারা খেয়ে নেয়।

তারপর তিনি বললেন, এসবই আল্লাহর দান। যথাসম্ভব এর কোনো অংশই যেন নষ্ট না হয়। খেয়াল রাখা উচিত।

উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর আব্বাজান বললেন, সেদিন আমার প্রথম জানা হলো, দস্তরখানা উঠানোও একটি শিখার বিষয়।

অথচ আমাদের অবস্থা হলো, দস্তরখান সরাসরি ডাস্টবিনে নিয়ে ঝেড়ে আসি। আল্লাহ তা'লার রিজিকের কোনো মূল্য দিই না। মানুষের মতো অন্যান্য প্রাণীরাও তো আল্লাহ তাআলার মাখলুক। তারাও আল্লাহ প্রদত্ত

রিজিকের হকদার। অন্তত উচ্ছিষ্ট খাবার তাদেরকে দেয়া দরকার। যদি তোমরা খেতে না পারো, তবে মাখলুকের জন্য রেখে দাও।

গীবতের কারণে ভয়ংকর স্বপ্ন

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত বরয়ী রহ. নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক মজলিসে গিয়ে দেখতে পেলাম, লোকজন খোশ গল্প করছে। আমিও তাদের সাথে বসে পড়লাম। গল্প জমে উঠার সাথে সাথে গীবতও শুরু হয়ে গেল। বিষয়টি আমার নিকট ভালো লাগলো না। তাই আমি উঠে গেলাম। কারণ, ইসলামের বিধান হলো, মজলিসে গীবত চললে, পারলে বাঁধা দিবে। না পারলে মজলিস থেকে উঠে চলে যাবে। তাই আমি উঠে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর ভাবলাম, এতক্ষণে হয়তো গীবত শেষ হয়ে গেছে। কারো দোষচর্চা হয়ত আর চলছে না। সুতরাং আলোচনায় পুনরায় শরিক হওয়া যায়। এই ভেবে আমি পুনরায় মজলিসে গিয়ে বসলাম। অল্প সময় এটা সেটা আলোচনা চললো। তারপরই শুরু হয়ে গেলো গীবত। আমিও মজা পেয়ে গেলাম। আগ্রহের সাথে তাদের গীবত শুনতে লাগলাম। এক পর্যায়ে নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। দু'চারটি গীবত নিজেও করে ফেললাম।

অতঃপর যখন মজলিস শেষে বাড়ি ফিরে এলাম, রাতে ঘুমের মাঝে এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলাম। এক বীভৎস কালো লোক আমার জন্যে পাত্রে করে গোশত নিয়ে এসেছে। লক্ষ্য করে দেখলাম, শুকরের গোশত। লোকটি বলল, এটি শুকরের গোশত। খাও। আমি বললাম, কীভাবে খাবে? আমি তো মুসলমান! লোকটি বলল, না, ওসব আমি শুনি না। তোমাকে খেতেই হবে। এ বলে লোকটি জোর করে আমার মুখে গোশত পুরে দিতে শুরু করলো। আমি তার কবল থেকে নিজেকে বাঁচানোর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। বমি করতে চাইলাম। তবুও রক্ষা পেলাম না। সে আমার উপর এই নির্মম অত্যাচার করেই যাচ্ছিল। সে কী কষ্ট! এরই মধ্যে আমার চোখ খুলে গেলো। তারপর থেক আমি যখনই আহার করতে বসতাম, ঘটনাটি মনে পড়ে যেত। কেমন যেন স্বপ্নের সেই শুকরের গোশতের দুর্গন্ধ আমার নাকে লাগত। এই অবস্থা ত্রিশ দিন পর্যন্ত ছিল। খাবার গ্রহণে আমার খুব কষ্ট হতো।

এ ঘটনা দ্বারা আল্লাহ আমাকে সতর্ক করলেন। কেবল একটি মজলিসের দু'চারটি গীবত এত ভয়ংকর। দীর্ঘ ত্রিশ দিন পর্যন্ত আমি এর ভয়াবহ গন্ধ পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে গীবত করা ও শোনা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

ফিরে যাও, তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করো

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক আল্লাহর রাসূল সা.-এর খেদমতে এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার নিকট দু'টি বিষয়ের উপর বাই'আত গ্রহণ করতে এসেছি। একটি হলো হিজরত। অপরটি হলো জিহাদ। অর্থাৎ আমি নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিজরতের উদ্দেশ্যে মদিনায় এসেছি। মদিনায় বসবাস করার ইচ্ছা আমার। আর উদ্দেশ্য হলো আপনার সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার। এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশা করি সওয়াব লাভের।

রাসূল সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা কেউ কি জীবিত আছেন? লোকটি জানালো, তাঁরা উভয়ই জীবিত আছেন। রাসূল সা. বললেন, আসলেই কি তুমি সওয়াব চাও? লোকটি বললো, হ্যাঁ! আসলেই আমি সওয়াব চাই। রাসূল সা. বললেন, তাহলে তুমি মাতা-পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের খেদমত করো। -মুসনাদে আহমদ

পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বাজার

আমি গত সপ্তাহে আমেরিকা গিয়েছিলাম।"লস এঞ্জেলস" নামে সেখানে একটি শহর আছে। সেখানকার এক বন্ধু আমাকে একটি বাজারে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই বাজারটি পৃথিবীর সবচেয়ে দামী বাজার এবং এখানে সব কিছু অনেক দামে কেনা বেচা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কত বেশি দামে বিক্রি হয়? তিনি আমাকে জানালেন, এক জোড়া মোজার দাম হলো, দুই হাজার ডলার। অর্থাৎ পাকিস্তানী পঁচাশি হাজার রুপি। একটা টাই-এর দাম তিন হাজার ডলার। একটা প্যান্টের দাম দশ, পনেরো বা বিশ হাজার ডলার। এখানে ১ লাখ টাকার প্যান্টও পাওয়া যায়।

এক দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের মেজবান বলেন, এই দোকানের একাংশে তো ক্রেতারা প্রবেশ করতে পারে, অন্য অংশে যেতে হলে সিড়ি বেয়ে যেতে হয়। ঐ অংশে কারো প্রবেশাধিকার নেই । যদি দোকানের মালিক নিজে সাথে করে তাকে নিয়ে না যায়। সেখানে মালিক তাকে বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন ডিজাইনের নানান প্যান্ট দেখিয়ে ক্রেতাকে পরামর্শ দেন যে, কোন ডিজাইনের প্যান্ট আপনার জন্য মানানসই হবে। এই পরামর্শ দানের বিনিময়ে মালিক ক্রেতার কাছ থেকে দশ হাজার ডলার নিয়ে নেয়। আর প্যান্টের মূল্য পৃথক প্রদান করতে হয়। শাহাজাদা চার্লস তার কাছে পরামর্শের জন্য সময় চেয়েছিল। সে তাকে ছয় মাস পর সাক্ষাতের সময় জানিয়ে দেন যে, ছয় মাস পর অমুক দিন অমুক সময় আসুন। তখন আমি আপনাকে বলবো, কোন রঙের ও কোন ডিজাইনের প্যান্ট আপনার জন্য মানানসই হবে।

الحمد لله تمت بالخير

19.08.'21
12:46 pm.